ড. আয়িশা আবদুর রহমান

নবী প্রেয়সী

অনুবাদ

ইসমাঈল যাবিহুল্লাহ

লেখিকা-পরিচিতি

গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে মিশরের সাহিত্য, জ্ঞান-গবেষণা ও পত্র-পত্রিকাগুলো যে নারীর প্রখর মেধা ও পাণ্ডিত্যের ঋণ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে তিনি ড. আয়িশা আলী আবদুর রহমান। ১৯১৩ সালে মিশরের নীল নদ-তীরবর্তী দিময়াত (দামেত্তা) শহরে তাঁর জন্ম। লেখালেখির জন্য পারিবারিক নিষেধাজ্ঞাকে শ্রদ্ধা করে নিজের আসল নামের পরিবর্তে ছদ্মনাম হিসেবে গ্রহণ করেন 'বিনতুশ শাতী-ই' বা 'নদীতীরের কন্যা'কে। তাই আসল নামের মতোই তিনি সমধিক পরিচিত হয়ে ওঠেন তাঁর এই ছদ্মনামে। তাঁর বাবা শাইখ আলী আবদুর রহমান আল-আযহারী ছিলেন মিশরের সুপ্রাচীন ও সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ও অধ্যাপক। নানা ছিলেন শাইখুল আযহার (আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব)।

তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর মাস্টার্স সম্পন্ন করেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাগরেব অঞ্চলের সুপ্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় জামিয়াতুল কারাভীনে তাফসীর বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন, আল- আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী-প্রভাষক হিসেবেও তিনি সবিশেষ স্মরণীয়। তাফসীর, হাদীস, উলুমুল হাদীস ও ভাষা-সাহিত্যের ওপর রয়েছে তাঁর বিশেষ কাজ। তাফসীর বিষয়ে তিনি রচনা করেন 'আত তাফসীরুল বায়ানিয়্যু লিল কুরআন'। উলূমুল হাদীসের প্রাচীন দুই উৎস-কিতাব 'মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ' ও 'মাহাসিনুল ইসতিলাহ'-কে সমন্বয় করে দীর্ঘ নয়শো পৃষ্ঠাব্যাপী টীকা ও সংযোজনের কাজ করেন। এ ছাড়া নবীজীবন ও নবীপরিবারের রমণীদের জীবনীর ওপর তিনি স্বতন্ত্র ও অভিনব কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তবে তাঁর কিছু স্বতন্ত্র ও একান্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যা তাঁর রচনাবলি অধ্যয়নের সময় বিশেষ সতর্কতার দাবি করে। ১৯৯৮ সালে জ্ঞানতাপসী এই মহীয়সী নারী ইন্তিকাল করেন। রাহমাতুল্লাহি আলাইহা।

বাঙালি পাঠকমহলের সীরাত চর্চায়, বিশেষত আযওয়াজে মুতাহহারাত তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রতমা স্ত্রীদের জীবনী পাঠে এ গ্রন্থ নতুন ও অভিনব একটি সংযোজন। ইতিহাস পাঠের গতানুগতিক অভিজ্ঞতার বাইরে পাঠক এখানে পাবেন সুপাঠ্য গল্পের স্বাদ। মানবিক বৈশিষ্ট্য ও দুর্বলতা সমেত প্রেম-প্রণয় ও সংসারযাপনে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও কীভাবে ইনসাফপূর্ণ সহাবস্থান রক্ষা করা যায়—গল্পে গল্পে অভাবনীয় এ সবকও হাসিল করা যাবে বইটি থেকে।

মিশরের খ্যাতিমান সাহিত্যিক ড. আয়িশা আবদুর রাহমান একই সঙ্গে হাদীস তাফসীর ও সীরাত বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য রাখতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রতমা প্রেয়সীদের জীবন ও জীবনিকাকে তিনি ইতিহাসের আকরগ্রন্থসমূহ থেকে তুলে এনেছেন অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে, স্বতন্ত্র ও সুপাঠ্য বর্ণনায়। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি খুবই চমৎকার এবং হৃদয়গ্রাহী। অনুবাদক ইসমাঈল যাবিহুল্লাহ অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে মূল লেখিকার ভাব ভাষা ও বর্ণনাশৈলির যথার্থ অনুবাদ করার ফলে বক্ষ্যমাণ অনূদিত রূপটিও হয়ে উঠেছে মূল বইটির মতো সুপাঠ্য সাবলীল। আমাদের সকলের ঘর-সংসার আযওয়াজে মুতাহহারাতের পবিত্রতা ও বারাকায় মণ্ডিত হোক, এই দুআ আল্লাহ তাআলার দরবারে।

নবী প্রেয়সী

মূল : ড. আয়িশা আবদুর রহমান

ইসমাঈল যাবিহুল্লাহ
অনূদিত

যাঁদের করকমলে—

উম্মুল মুমিনীনগণ—উম্মাহর প্রতিটি নারী-পুরুষের হৃদয়াসনে যাঁরা মাতৃত্বের অপার শ্রদ্ধায় বরিত...

উম্মে ইসমাঈল—শত কলঙ্ক ও অবাধ্যতা নিয়েও যেই মমতাময়ী মায়ের চরণতলে নিজের সৌভাগ্য খুঁজি...

এবং

'আমার প্রেয়সী'—আমার জীবনে যিনি 'খোশখবর' হয়ে এসেছেন; আমরণ তিনি 'নবী-প্রেয়সী'দের সুবাস মেখে, আমার ঘরে থাকুন 'খোশনসীব' ও 'আলোর মালকীন' হয়ে...

—ইসমাঈল যাবিহুল্লাহ

সূচিপত্র

সম্পাদনা-জ্ঞাতব্য

মিশরের খ্যাতিমান সাহিত্যিক ড. আয়িশা আবদুর রহমান একই সঙ্গে হাদীস তাফসীর ও ইসলামী ইতিহাস বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য রাখতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রতমা প্রেয়সীদের জীবন ও জীবনিকাকে তিনি ইতিহাসের আকরগ্রন্থসমূহ থেকে তুলে এনেছেন অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে, স্বতন্ত্র ও সুপাঠ্য বর্ণনায়। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি খুবই চমৎকার এবং হৃদয়গ্রাহী, ইতিহাস পাঠের গতানুগতিক অভিজ্ঞতার বাইরে পাঠক এখানে পাবেন সুপাঠ্য গল্পের স্বাদ। গ্রন্থটির মূল বৈশিষ্ট্য মূলত এটিই। অনুবাদক ইসমাঈল যাবিহুল্লাহ অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে মূল লেখিকার ভাব ভাষা ও বর্ণনাশৈলির যথার্থ অনুবাদ করার ফলে বক্ষ্যমাণ অনূদিত রূপটিও হয়ে উঠেছে মূল বইটির মতোই সুপাঠ্য সাবলীল।

তথ্য ও ভাষামানের বিচারে গ্রন্থটি আলাদাভাবে সম্পাদনার দরকার ছিল না। কিন্তু মূল লেখিকা আয়িশা আবদুর রহমান এই উম্মাহর সবচেয়ে সম্মানিতা ও পবিত্রতমা রমণীদের জীবনপরিক্রমা তুলে আনতে গিয়ে একান্তই নিজস্ব চিন্তা ও বিবেচনার আলোকে কিছু কিছু জায়গায় তাঁদেরকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা তাঁদের সম্মান ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মাকতাবাতুল আসলাফের সম্পাদনা বিভাগ থেকে আমরা এই জায়গাগুলোর ভাষ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছি। ১৪শ' বছর ধরে তাঁদের জীবনী যেভাবে যে দ্যোতনায় চর্চিত হয়ে আসছে, কিছু কিছু জায়গায় সে দ্যোতনার অনুপস্থিতি ছিল, আমরা তা যোগ করে দিয়েছি। লেখিকার ভাষ্য ঠিক রেখে দ্বিমতপূর্ণ জায়গায় টীকা যোগ করা যেত, কিন্তু গ্রন্থটি যেহেতু সর্বসাধারণ্যে পৌঁছুবে তাই আমরা কেবল টীকা যোগ করেই দায় সেরে নেওয়াকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেছি। তবে লেখিকা যেসব উৎস ও বর্ণনাসূত্র অবলম্বন করেছেন, দু-এক জায়গায় অধিক গ্রহণযোগ্য সূত্র যোগ করা ছাড়া প্রায় সবগুলোই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তারপরও ভাষ্যের পরিবর্তনের কারণে বেশ কিছু জায়গায় মূল গ্রন্থের সঙ্গে বক্ষ্যমাণ অনুবাদগ্রন্থের খানিকটা তফাত পরিলক্ষিত হবে। এই তফাত গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে

বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আশা করি—বাঙালি পাঠকমহলের সীরাত চর্চায়, বিশেষত আযওয়াজে মুতাহহারাত তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রতমা স্ত্রীদের জীবনী পাঠে এ গ্রন্থ নতুন পালক যুক্ত করবে, ইনশাআল্লাহ। আমাদের সকলের ঘর-সংসার আযওয়াজে মুতাহহারাতের পবিত্রতা ও বারাকায় মণ্ডিত হোক, এই দুআ আল্লাহ তাআলার দরবারে। সকলের পাঠোদ্দীপনা আমাদের শ্রমকে স্বার্থক করবে। আল্লাহ হাফিয।

—হামমাদ রাগিব

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। মহান রবের দরবারে অগুনতি সিজদায়ে শুকর, গুনাহগার বান্দার প্রতিও তাঁর করুণাধারার বর্ষণে কমতি হয় না; নাফরমানকেও কোঁচড়ভরে দিতে তিনি দ্বিধা করেন না। প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক নগণ্য উম্মতি হয়েও, উম্মুল মুমিনীনদের এক কলুষিত সন্তান হয়েও তাঁদের পার্থিব জীবনের কিছু জান্নাতী চিত্র কাগজের বুকে তুলে আনতে পেরেছি—এ আমার সামান্য জীবনে পাওয়া অসামান্য এক নিয়ামাত।

মূলত, নিষ্পাপ শৈশব থেকেই তো বুকের মধ্যে এক নরম-কোমল মায়ার পিদিম হয়ে জ্বলছে রাসূল ও তাঁর আহলে বাইতের প্রেম। সময়ে-সময়ে পঠন ও শ্রবণের তেল-হাওয়ায় সেই পিদিমের রোশনি আরও বেড়েছে; তাই তো কলুষমাখা মনমুকুর ও দেহসত্তায় ক্ষণে ক্ষণে দেখা যায় তার ঝলক। কিছুদিন আগে ড. আয়িশা আবদুর রহমান বিনতুশ শাতি'র '*তারাজিমু সায়্যিদাতি বাইতিন নুবুওয়াহ*' কিতাবটির (যা মূলত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মা-মেয়ে-বিবিদের নিয়ে ড. আয়িশার রচিত সিরিজ-সমগ্র) পিডিএফ সংস্করণ হাতে পাই। পড়তে শুরু করে দেখি—লেখিকা তো রীতিমতো সেই পবিত্র প্রেমের আলোক-নগর সাজিয়ে বসে আছেন! বইটির এককেটি ছত্র যেন নিশি-আঁধারে জ্বলতে থাকা প্রেমিক মুমিনের মায়াভরা তাসবীহ। আমি সেই তাসবীহ হাতে তন্ময় হয়ে মিশে যাই প্রিয়তম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর প্রেয়সীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না) সীরাতের অলিগলিতে।

প্রিয় পাঠক, এই বইটি নবী-প্রেয়সী, তথা, উম্মুল মুমিনীনদের কোনো গতানুগতিক জীবনী নয়; বরং রাসূলের ঘরে-আসা উম্মাহর এই শ্রেষ্ঠ মহীয়সীদের যেই অনিন্দ্যসুন্দর, বর্ণিল-বৈচিত্র্যময় জীবন, তারই কিছু হৃদয়কাড়া আলোকচিত্র এখানে পেশ করা হয়েছে।

অনুবাদে আমরা লেখিকার ভাব-আবেগে মোড়ানো সেই আলোকচিত্রগুলো

বাংলাভাষী পাঠকের কাছে একান্ত নিজের করে তুলে ধরার পূর্ণ কোশেশ করেছি। তবে, নবীন ও নবিশ হিসেবে নানারকম ভুল-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক; সচেতন-সুহৃদ পাঠক-পাঠিকা সেগুলোতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, অশেষ কৃতজ্ঞ হব।

পরিশেষে, বইয়ের প্রকাশক মাকতাবাতুল আসলাফসহ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মানুষের ইহ-পরকালীন কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করছি। সীরাতের এক মোহনগন্ধি মাহফিলে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। ওয়াসসালাম।

—ইসমাঈল যাবিহুল্লাহ

রহমতগঞ্জ মাদরাসা, মুদাফরগঞ্জ, বরুড়া, কুমিল্লা

৬ অক্টোবর, ২০২১

যাঁর ভালোবাসায় মুগ্ধ রাসূল

খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ

'কসম আল্লাহর, খাদীজার বিদায়ের পর তার চেয়ে উত্তম কাউকে আর পাইনি আমি; সব মানুষ আমাকে যখন রাসূল মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তখন সে আমার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে; সবাই যখন আমাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছে, তখন সে আমাকে সত্যায়ন করেছে; আমি যখন সর্বদিক থেকে বঞ্চিত, সে তখন আমাকে তার সম্পদ দিয়ে সর্বাত্মক সহায়তা করেছে; এবং একমাত্র তাঁর গর্ভেই আল্লাহ আমাকে কয়েকটি সন্তান দান করেছেন।'

-মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ।

[*আল-ইসতীআব*—ইবনু আবদিল বার]

এক বেদনাদায়ক স্মৃতি

শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যও পূর্ণতা পাচ্ছে, সমবয়সী যুবকেরা কত আনন্দ-উচ্ছলতায় দিন পার করে, কিন্তু তাঁর জীবনের সব আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে যেন মুহূর্তেই পদপিষ্ট করে মলিন করে দেয় এক তিক্ত বেদনার স্মৃতি। ইদানীং সেই দুঃসহ স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণেই তাঁর মনের গহীনে হানা দিচ্ছে; আর, তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে ১৮ বছর আগের একটি নির্মম চিত্রের সামনে। তাঁর চোখের তারায় কেবলই ভেসে উঠছে সেই ছবি—মক্কা ও ইয়াসরিবের মধ্যবর্তী এক মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি; সামনে, দুঃখিনী মা-আমীনা জীবনের শেষ কটি পলকের

অবসান-প্রতীক্ষায় আছেন; ধীরে ধীরে জীবনের আলোক-শিখাগুলো নিভে যাচ্ছে তাঁর; এবং একপর্যায়ে সত্যিই নিথর-নিঃসাড় হয়ে গেলেন তিনি। বাকহারা, শোকে স্তব্ধ কুরাইশী শিশু মুহাম্মাদ—ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন মায়ের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে!

১৮ বছর ধরে দুঃস্বপ্নের মতো এই স্মৃতি তাড়িয়ে ফিরছে তাঁকে, সবাইকে ছেড়ে একটু একলা হলেই ওই দুঃস্বপ্নের অতলান্তে তিনি হারিয়ে যান। দেখেন—'আবওয়া' এলাকার ওই নিষ্ঠুর কবরের ওপর সর্বস্বহারা ডানা-ভাঙা পাখির মতো পড়ে আছেন তিনি; নিজের কচি ও দুর্বল প্রাণের সবটুকু শক্তি ব্যয় করেও মাকে বাঁচাতে পারেননি; লোকেরা যখন তাঁর দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান মানুষটিকে কবরে বালুচাপা দিয়ে ফেলল, তখনকার অসহায়ত্বের দৃশ্য তাঁকে এখনও হতবিহ্বল করে বুকটা ভেঙে দেয়।

নানারকম ব্যস্ততায় কখনো কখনো তিনি ভুলে যান সেই শোক; তাঁর মস্তিষ্ক থেকে ক্ষণিকের জন্য মুছে যায় সেই মৃত্যুর দৃশ্য, চোখের সামনে থেকে যা তাঁর কলিজার টুকরো মাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল; কিন্তু বিষাদের সেই কালো ছায়া থেকে খুব বেশি সময় মুক্তি মেলে না তাঁর। খানিক বাদেই আবার তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তিনি। প্রাণটা তখন পাঁজরের পিঞ্জিরায় ধড়ফড় করতে থাকে এক দূর জগতের হাতছানিতে, যেখানে জগতভরা মমতা নিয়ে মরুর বুকে নীরব-নিশ্চুপ শুয়ে আছেন তাঁর মা!

প্রায়ই তিনি ওই বাড়িটির সামনে গিয়ে দাঁড়ান, যেই বাড়ি একসময় তাঁদের মা-ছেলের জীবনকে এক শান্ত কলকাকলিপূর্ণ ঝরনার বহতা দিয়েছিল, মায়ের বিদায়ে যেই বাড়ি এখন পরিত্যক্ত এক বিরানভূমি।

কখনো তিনি হাঁটতে হাঁটতে শহরের বাইরের চারণভূমিতে চলে যান। সন্ধ্যায় ফেরার পথে শহরের প্রবেশপথে এসে থমকে দাঁড়ান। স্মৃতির ঝড়ো-বাতাস আবারও তাঁকে প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দেয়। হাওয়ায় দুলে ওঠা স্মৃতির পর্দায় তিনি দেখতে থাকেন তাঁর প্রথম ইয়াসরিব-সফর থেকে ফেরার মুহূর্তগুলো। একা—নিঃসঙ্গ, সর্বস্বহারা এতীম এক শিশু খুব মন্থর ও দুর্বল পায়ে হেঁটে চলেছেন দাদা বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিবের ঘর-অভিমুখে। তাঁর পেছনে পেছনে আসছেন মায়ের রেখে যাওয়া এক সেবিকা।

এরপর, বয়োবৃদ্ধ দাদা নিজের দুর্বল ও কাঁপা কাঁপা ছায়া দিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন এই এতীমটিকে আগলে রাখতে। জীবনসন্ধ্যায় উপনীত হয়েও তিনি ওঁর ভাবনার আকাশ মেঘমুক্ত রাখতে চেয়েছেন; চেয়েছেন—ওঁর শিশু-হৃদয় যেন ওই দুঃস্বপ্নের মতো স্মৃতি থেকে নিরাপদ রয়। পূর্ণ দুটি বছর তিনি তাঁর কোমল হাতে নাতির হৃদয়ের রক্তক্ষরণ বন্ধ করার কোশেশ করে গেছেন। কিন্তু যেই ঝড়ের কবলে মা-বাবা হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন শিশু মুহাম্মাদ, কদিন না-যেতেই সেই ঝড় আবার বনু হাশিমের দিকে ধেয়ে আসতে লাগল। সবাই বুঝতে পারল—বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিব হয়তো এই ঝড় সামলাতে পারবেন না। ধুলির ধরা ছেড়ে চিরদিনের সফরে রওনা হবেন এমন এক দেশে, যেখানে কদিন আগেই চলে গেছে তাঁর এতীম নাতিটির মা; এবং তারও আগে যেখানে পাড়ি জমিয়েছে তাঁর ছোটপুত্র ও এতীম শিশুটির বাবা আবদুল্লাহ।

শিশু মুহাম্মাদ খুবই বিস্মিত ও বেদনার্ত মনে দাদার শিয়রে বসে রইলেন। তিনি দেখলেন—তাঁর এই দাদাভাইটি—যাঁকে পেয়ে তাঁর মনে হয়েছিল, যে, জন্মদাতা বাবাকে কখনো না-দেখলেও এই বৃদ্ধ মানুষটির মধ্যে, তাঁর সুকোমল মমতা-স্নেহের মধ্যেই মিশে আছেন বাবা—খুব দ্রুতই নীরব-নিথর হয়ে পড়ছেন। দ্বিতীয়বারের মতো তিনি চোখের সামনে মৃত্যুর শীতল ছায়া দেখতে পেলেন। বৃদ্ধ তাঁর ছেলে আবু তালিবকে কাছে ডেকে মুহাম্মাদের ব্যাপারে কিছু ওসীয়ত করলেন, এরপরেই তিনি পাড়ি জমালেন অদৃশ্য জগতের উদ্দেশে।

আবার পরিবর্তন হয় শিশু মুহাম্মাদের ঠিকানা। চাচার কাছে এসে তিনি পান তৃতীয় আরেক বাবা; কিন্তু এখানে থাকে না মা; মায়ের সোহাগ পেতে মন কেমন হয়ে থাকে মুহাম্মাদের। পরবর্তী কয়েক বছর ক্ষণে ক্ষণেই তাঁর মন 'আবওয়া'র[১] ওই গোরস্তানে ছুটে যেত। বনু হাশিমের শিশুদের হৈহুল্লোড় আর খেলাধুলাও তাঁর মন থেকে সেই বিভীষিকাময় মৃত্যুচিত্র মুছে দিতে পারেনি, মরুর জনহীন প্রান্তরে যা তাঁর হৃদয়জগতকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। জগতশ্রেষ্ঠ শহর মক্কায় সুপ্রাচীন কাবা ঘরকে ঘিরে জীবনের যেই আড়ম্বরপূর্ণ ও জৌলুসময় আসর, তার চকমকেও ঢাকা পড়ে যায়নি মুহাম্মাদের সেই দুঃসহ স্মৃতি।

সান্ধ্য-নীরবতায় ছেয়ে যাওয়া মক্কার প্রবেশমুখে একবার তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

---

[১] বিস্তারিত জানতে পড়ুন লেখিক'র বই '*রাসূলের মা*' (*উম্মুন নবী*)।

উদাসী মন, নিঃশব্দ পরিবেশ। ধীরে ধীরে রাতের আঁধার যেন তাঁকে ধূসর চাদরে ঢেকে ফেলছে। চারপাশের গুমোট নিস্তব্ধতা যেন আরও আরও বেদনার ভারে দুর্বল-অক্ষম করে দিচ্ছে তাঁকে। মনে শক্তি জোগালেন তিনি, হাঁটতে শুরু করলেন চাচার ঘরের দিকে। আর, মনের মধ্যে জেগে উঠল অত্যাসন্ন এক বিদায়বেদনার চিনচিনে ব্যথা।

দাদার মৃত্যুর পর থেকে নিরবচ্ছিন্ন ১৭টি বছর ধরে যেই ঘরটি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে, যেই ঘরের মালিক দায়িত্বসীমার বহু ঊর্ধ্বে উঠে এতগুলো বছর ধরে ভাইপো'র ভার বহন করেছেন, খুব শিগগির সেই ঘরটি তাঁকে ছাড়তে হবে, যেতে হবে সুদূর শামদেশে।

তাঁর স্মরণ হতে লাগল সেদিন ভোরেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা চাচার কথাগুলো; চাচা বলেছিলেন—'ভাতিজা, আমি একজন গরীব মানুষ; ইদানীং আমাদের বড় খারাপ সময় যাচ্ছে। হাতে কোনো টাকা-পয়সা নেই, ব্যবসাপাতিও করতে পারছি না। এদিকে, আমাদের এখানকারই একটি ব্যবসায়ী কাফেলা শামের উদ্দেশে রওয়ানা করবে, সময়ও ঘনিয়ে এসেছে তাদের। আবার, খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদও কিছু লোককে তার পণ্যসামগ্রী নিয়ে ব্যবসা করতে পাঠাবে। তো, যদিও আমি তোমার শামে যাওয়াটা পছন্দ করি না, এবং তোমার ব্যাপারে সেখানকার ইহুদীদেরকে আমার ভয় হয়, তবু মন চাচ্ছে, যে, তোমার তরফ থেকে খাদীজার কাছে তার ব্যবসার প্রতিনিধি হওয়ার দাবি পেশ করতে পারলে আমাদের অনেক উপকার হবে। কারণ, তোমার সচ্চরিত্র ও আমানতদারী সম্পর্কে জানাশোনার ফলে অন্যদের চেয়ে তোমাকেই বেশি প্রাধান্য দেবে খাদীজা। আমি শুনেছি, খাদীজা একজনকে দুটি উটের বাচ্চার বিনিময়ে ভাড়া করেছে। অবশ্য, তোমার বেলায় এইটুকু বিনিময়ে আমি রাজি না। এখন, আমি কি তোমার ব্যাপারে তার সঙ্গে আলাপ করব?'[১]

তিনি তখন বলেছিলেন—'চাচা, আপনি আমার জন্য যা ভালো মনে করেন, তা-ই করুন।'

---

[১] *উয়ূনুল আসার*—ইবনু সায়্যিদিন নাস : ০১/৫৭; তবে, *সীরাতু ইবনি হিশাম* (০১/১৯৯), মুহিব্ব তাবারীর *আস-সিমতুস সামীন* (১৩) ও *তারীখু তাবারীতে* (০২/১৯৬) আছে—খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সরাসরি নিজেই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন এই বাণিজ্যসফরের।

ভাবনার খাতা বন্ধ করে ঘরে ফেরেন মুহাম্মাদ। অল্প সময়ের মধ্যেই আবু তালিব খাদীজার সঙ্গে আলাপ করেন এবং একদিন আগামীর মোড়কে লুকানো ভাগ্যচিত্র উন্মোচিত করতে যুবক মুহাম্মাদ বেরিয়ে পড়েন খাদীজার ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে।

প্রথম মুলাকাত

শামের গ্রীষ্মকালীন সফর শেষে মক্কার পথে রওনা হলো কাফেলা। উটগুলোকে চালকেরা গানে গানে ভুলিয়ে দিল দীর্ঘ পথ হাঁটা ও বোঝা বহনের কষ্ট। ওরা আরাম করে, ছায়া নিয়ে নিয়ে এবং পিপাসা মিটিয়ে মিটিয়ে চলতে লাগল আপন ঠিকানাপানে। কাফেলার সবার মনে খুশির সমীরণ—কত দিন পর দেখা হবে পরিবার ও দোস্ত-আহবাবের সঙ্গে। মক্কার কাছাকাছি 'মাররুয যাহ্রান' এলাকা পেরোনোর পর হতেই কাফেলার মধ্যে কেমন এক আনন্দরব ছড়িয়ে পড়ল। দূর থেকে মক্কার যেসব নিশানা দৃশ্যমান হচ্ছে, সেগুলো আরও ভালোভাবে দেখার জন্য তারা ঘাড় উঁচু করে বারবার দেখতে লাগল। তাদের মনে হতে লাগল—ওসব নিশানা বুঝি তাদেরকে স্বাগত-মালা নিয়ে ডাকছে; আর, আহ্বান করছে এক মহা-উচ্ছ্বাসী সুখবৃষ্টি উদযাপনে।

কিন্তু এই পুরো কাফেলার মধ্যে মুহাম্মাদ যেন থেকেও নেই। কাফেলা 'আবওয়া'র নিকটবর্তী এলাকা অতিক্রমের পর হতেই তাঁর মনের মধ্যে আবার অশান্তির ঝড় তুলেছে সেই নির্দয় স্মৃতি। সাথী লোকটি তাঁকে নানাভাবে ভোলাতে চাইছে। একবার সে তাঁকে মক্কা-ভূমি নিকটবর্তী হওয়ার কথা বলছে, আরেকবার তাঁর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিতে চাইছে প্রতীক্ষিত পুরস্কার নিয়ে—যেই পুরস্কার খাদীজা তাঁর (মুহাম্মাদের) জন্য ঘোষণা করেছেন শামে যাওয়ার বিনিময় স্বরূপ। খাদীজা তাঁকে বলেছিলেন, 'আমার সম্পদ নিয়ে শামে ব্যবসা করতে গেলে ইতিপূর্বে অন্যদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তারচেয়ে তোমাকে দ্বিগুণ বিনিময় দেওয়া হবে।'

এই সাথীটি ছিল খাদীজার ব্যক্তিগত সেবক মাইসারা। সে বলল, 'আমি খুব দ্রুত মালিকার নিকট গিয়ে তাঁর প্রতি আল্লাহর এই মহানিয়ামাতের কথা বলব। এবং এই নিয়ামাত যে আপনার হাত ধরে এসেছে, তা-ও বলব। আপনার ব্যাপারে তিনিও এমন বিশ্বাসই রাখেন।'

মুহাম্মাদ কোনো জবাব দেন না মাইসারাকে, তিনি তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যান। ভাবতে থাকেন—শাম-ফেরত মুসাফিরের কাঙ্ক্ষিত বস্তু কি শুধু এ-ই? পুরো কাফেলায় সুখের সৌরভ ছড়ানো উটচালকেরা কি শুধু এটুকু বিনিময়ই পাবে?' তাঁর দৃষ্টি কেবলই ফেলে আসা পথে ছুটে যেতে থাকে। মনে হতে থাকে—মা বুঝি মরুর বুকে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ডাকছেন! আবারো তাঁর মস্তিষ্কের কোষে হাজির হয় ছ' বছর বয়সে মা হারিয়ে ইয়াসরিব থেকে ফেরার কথা!

মুহাম্মাদের ভাবনায় ছেদ ঘটায় কাফেলা ও স্বাগত জানাতে আসা লোকদের উচ্ছ্বাস-ধ্বনি। মক্কার আপন ভূমিতে নিরাপদে পা রাখতে পারায় উটগুলোর যেই আনন্দ-চিৎকার, তাতে কেটে যায় মুহাম্মাদের দুঃখ-চিন্তার রেশটুকুও। তিনি প্রথমেই কাবা ঘর তওয়াফ করে উটের পিঠে বসে রওয়ানা হন খাদীজার বাড়ির উদ্দেশে। খাদীজা তখন বাড়ির চিলেকোঠায় তাঁর পথ চেয়ে বসে আছেন। খাদীজার বুক ধুকপুক করছে। পাশে বসে সদ্য আগত গোলাম মাইসারা তাঁকে শোনাচ্ছে মুহাম্মাদের সঙ্গে সফরের রোমাঞ্চকর, হতবাককরা কাহিনী।[১]

হঠাৎ খাদীজা দেখলেন—তাঁর ঘরের দিকে এগিয়ে আসছেন মুহাম্মাদ। ওঁর চেহারায় এক ঐশী দীপ্তি ও আভিজাত্য ফুটে আছে। খাদীজা ছুটে গেলেন দরজায় তাঁকে স্বাগত জানাতে। বড় কোমল, মিষ্টি স্বরে তিনি তাঁকে নিরাপদে ফিরে আসার জন্য অভিনন্দন জানালেন। মুহাম্মাদ তখন কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে খাদীজার দিকে তাকালেন; আর, অমনিই মিলন হয়ে গেল চার চোখের; আবার তিনি নত করে ফেললেন দৃষ্টি। এরপর খাদীজার কাছে বাণিজ্য-ভ্রমণের পুরো বর্ণনা দিলেন। ব্যবসার লাভ ও শাম থেকে নিয়ে আসা উৎকৃষ্ট সব পণ্যের ফিরিস্তিও শোনালেন। খাদীজা শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে গেলেন তাঁর মুখনিঃসৃত মধুবাক্যসমূহ; যেন তাঁকে মোহগ্রস্ত করে ফেলেছেন মুহাম্মাদ। এরপর, যখন মুহাম্মাদ চলে গেলেন, ওভাবেই বসে রইলেন তিনি। মুহাম্মাদের অপসৃয়মান অবয়বের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকলেন খাদীজা—যতক্ষণ-না মুহাম্মাদ হারিয়ে যান তাঁর চলার পথের আঁধার কোনো বাঁকে।

এখান থেকে বেরিয়ে চাচার ঘরমুখী হন মুহাম্মাদ। চাচাও বেশ উৎফুল্ল ছিলেন,

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/২০০; *আল-মুহাব্বার—ইবনু হাবীব* : ৭৭; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১৯৬; *আল-ইসাবাহ* : ০৪/৬০; *আস-সিমতুস সামীন* : ১৩; *উয়ূনুল আসার* : ০১/৪৮।

কারণ, সফর থেকে ইহুদীদের কোনো কূটকর্মের শিকার না-হয়ে, নিরাপদ ও লাভবান হয়ে ফিরেছিলেন তাঁর ভাতিজা।

যে বিয়ে কল্যাণ ও মহাসৌভাগ্যের মোহনা

মক্কার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আগের মতোই চলতে লাগল। পুঁজিপতিরা তাদের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে লাভ-ক্ষতির হিসাব কষতে লাগল। আর, পরিবারের কাছে ফিরে আসা ব্যবসায়ীরা স্বস্তির নিঃশাস ফেলল দীর্ঘ, কঠিন ও শঙ্কাপূর্ণ সফর শেষ করতে পেরে।

এদিকে, কাফেলার সবার হিসাব মিটমাট হয়ে গেছে। ব্যবসায়ী ও ভাড়াকৃত তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যকার দেনা-পাওনা শোধ হয়ে গেছে। শুধু রয়ে গেছে চিরসত্যবাদী ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক মুহাম্মাদের সঙ্গে খাদীজার হিসাব-কিতাব।

খাদীজার কাছে তো দুনিয়ার হিসাব-কিতাব অনেক পুরাতন হয়ে গেছে। জগতের পুরুষদেরও চেনা হয়ে গেছে তাঁর। দুই বারে দুই শ্রেষ্ঠ আরবনেতার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে। একজন হলো—আতীক ইবনু আয়িয ইবনি আবদিল্লাহ আল-মাখযুমী; অপরজন হলো—আবু হালা হিন্দ ইবনু যুরারা আত-তামীমী।[১] কাজের সুবাদে জোয়ান-বৃদ্ধ—সব ধরনের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা-ওঠাবসা হয়েছে তাঁর; কিন্তু মুহাম্মাদের মতো অতুলনীয় ও অপূর্ব গঠন-আকৃতি পরিচিত কারো মধ্যে তিনি দেখেননি।

ভাবনার সবুজ অরণ্যে হারিয়ে যান খাদীজা। দেখেন—মুহাম্মাদ বসে আছেন তাঁর মুখোমুখি। তাঁর মুখমণ্ডল ও বসার ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে পৌরুষ ও আভিজাত্য। এখনও তিনি বয়ান করে চলেছেন শামের জীবন্ত সফরনামা। প্রতিটি শব্দে-বাক্যে খাদীজা যেন কুরবান হয়ে যাচ্ছেন এই অচেনা জাদুময়ী কণ্ঠের প্রতি!

হঠাৎ খাদীজার চোখের তারায় ভেসে ওঠে ঘরের সেই জায়গাটির ছবি, যেখানে হাশিমী যুবক মুহাম্মাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল; আর, তখনই আকস্মিক প্রবল এক ঝাঁকুনি খায় তাঁর মনোজগত। কেঁপে ওঠে হৃদয়। কিন্তু যুবকটি

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/১৯৩; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১৭৫; *আল-মুহাব্বার* ৭৯; *আস-সিমতুস সামীন* : ১৩; *উয়ূনুল আসার* : ০১/৫১। অপরদিকে, *আল-ইসতীআবে* (০৪/১৮১৭) আছে—খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে প্রথমে হয়েছে আবু হালার সঙ্গে; এরপর আতীক ইবনু আয়িযের সঙ্গে। আরও ভালোভাবে জানতে ইবনু হাযমের '*জামহারাতু আনসাবিল আরব*' (১৩৩, ১৯৯) দেখা যেতে পারে।

কোথায়?

বিস্মিত, হতভম্ব খাদীজা নিজের মনকেই প্রশ্ন করেন—তবে কি হৃদয়-গহনে ভালোবাসার যেই গোলাপ ঘুমিয়ে পড়েছিল, তা আবার জেগে উঠেছে? প্রেমসাগরের যেই জলরাশি নীরব হয়ে গিয়েছিল, তাতে আবার জোয়ার এসেছে? জবাব পেতেও যেন দেরি হয় না। মুহূর্তেই এক অব্যাখ্যাত ভয়ে কম্পন শুরু হয়ে যায় তাঁর—কী করে এই ভয়ানক অনুভূতির কথা মানুষকে জানান দেবেন তিনি! অথচ একে একে দুজন স্বামী হারানোর পর তিনি তো পুরুষের প্রেম-প্রণয়ের অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

মনের মধ্যে জেগে ওঠা এই অনুভূতি নিয়ে কীভাবে তিনি নিজের সম্প্রদায়কে মুখ দেখাবেন! তিনি তো এরই মধ্যে কুরাইশের নেতৃস্থানীয় এবং মক্কার রঈস পর্যায়ের ব্যক্তিদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন অনাগ্রহভরে! [১]

কিন্তু হায়, সম্প্রদায়ের কথা ভেবে কী হবে! প্রিয়তম মুহাম্মাদ-ই-বা কী জবাব দেবেন তাঁকে—এ-ও তো ভাবেননি খাদীজা! মক্কার সুন্দরী কুমারীদের এবং বনু হাশিমের শ্রেষ্ঠ ষোড়শী ললনাদের যিনি এতদিন ধরে এড়িয়ে গেছেন, তিনি কি ৪০ ছুঁয়ে ফেলা এক নারীর ভালোবাসার ডাকে সাড়া দেবেন?

এক লজ্জা-লাজুক বিব্রতিতে জড়িয়ে গেলেন খাদীজা—বয়স বিবেচনায় তো তিনি এখন মুহাম্মাদের মা বা খালার পর্যায়ে! মুহাম্মাদের মা আমিনা বিনতু ওয়াহাব বেঁচে থাকলে এই সময়ে তাঁর বয়স চল্লিশের আশপাশেই থাকত। খাদীজা নিজেও তো এখনও মাতৃত্বের কোমল অনুভবের সঙ্গে অপরিচিত হয়ে যাননি—কারণ, স্বামী আতীকের ঘরে জন্ম নেওয়া তাঁর মেয়েটি সবে বিবাহযোগ্যা হয়েছে মাত্র; আবার, আবু হালার ঘরের ছেলেটিও খুব বেশি বড় হয়ে যায়নি। [২] তাহলে, একজন বয়স্ক ও সন্তানধারণে প্রায় অক্ষম নারীর এমন অনুভূতি কেন? এর পরিণামই-বা কী?

এই অস্বাভাবিক পেরেশানি ও মানসিক যন্ত্রণার সময়েই বান্ধবী নাফিসা বিনতু মুনইয়া এলেন খাদীজার সাক্ষাতে এবং খানিক বাদেই তিনি অনুভব করলেন—

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/২০১; *আস-সিমতুস সামীন* : ১৩।

[২] উম্মু মুহাম্মাদ বিনতু আতীক'র জীবনী অধ্যায়, *জামহারাতুল আনসাব* : ১৩৩। হিন্দ ইবনু আবি হালার জীবনী অধ্যায়, *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৫৪৫; *আল-জামহারাহ* : ১৯৯।

খাদীজার মনে কোনো ঝড় বয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়। আলাপ শুরু হলো দুই বান্ধবীর। খাদীজা যেন দিকহারা আঁধার মরুতে এক চিলতে আলোর দেখা পেলেন। মনের সব কথা অকপটে বয়ান করলেন নাফিসার কাছে। নাফিসা খুব সহজ সমাধান দিলেন। বললেন, 'আরে, কুরাইশী নারীদের মধ্যে তোমার চেয়ে বংশগৌরবে ঊর্ধ্বে আছে কে? এ ছাড়াও তোমার রূপ যেমন এখনও হৃদয়কাড়া, ধন-সম্পদেও তুমি সবার সেরা! তাহলে কে তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে না? বরং শোনো, সম্প্রদায়ের প্রতিটি পুরুষের কাছে এখনো তুমি পরম কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত—এদের প্রত্যেকেই তোমাকে বিয়ে করতে চায়; শুধু সক্ষমতা নাই বলে পারে না!' [১]

এই বলে চলে যান নাফিসা। তাঁর প্রস্থানের পরেও কথাগুলো কানে বাজতে থাকে খাদীজার। তাঁর মনে হতে থাকে—সত্যিই এখন স্থির একটি সিদ্ধান্তের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে তিনি।

এদিকে, নাফিসা হাজির হন[২] মুহাম্মাদের কাছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'মুহাম্মাদ, কোন জিনিসটি আপনাকে দুনিয়াবিমুখ বানিয়ে রেখেছে? কীসের ফলে আপনি নিজের যৌবনকে এইভাবে বঞ্চিত করছেন? আপনি কি কোনো প্রেমময়ী স্ত্রীর সংস্পর্শে যাবেন না? আপনি কি এমন কোনো নারীকে নিজের আপন করে নেবেন না, যে আপনার উষ্ণ বুকে ভালোবাসার ঠান্ডা হাওয়া দেবে? মায়া আর প্রীতি দিয়ে যে মুছে দেবে আপনার সব দুঃখ-শোক ও মনখারাপের উপকরণ?'

যুবক মুহাম্মাদ অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করলেন। আবার তাঁর মনে পড়ে গেল বহু বহু বঞ্চনার স্মৃতি—ছ' বছর বয়সে মাকে হারানোর পর থেকে যেগুলোর তীক্ষ্ম তীরে বিদ্ধ হয়েছেন তিনি প্রতিনিয়ত। মুখে কৃত্রিম হাসির ভাব ফুটিয়ে তিনি বললেন, 'বিয়ে করার কোনো উপায়-উপকরণই তো আমার হাতে নেই!'

---

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/২০১।

[২] *শরহুল মাওয়াহিব* ও *আল-ইসাবাহ* গ্রন্থে খাদীজা ও নাফিসার জীবনী অধ্যায়ে এই কথা এসেছে। ইবনু হিশাম উল্লেখ করেছেন—খাদীজা নিজেই তাঁর কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন; কোনো মাধ্যম ছাড়াই। মুহিব্ব তাবরীর *আস-সিমতে* এসেছে—খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন প্রস্তাব দিয়ে; তবে, প্রেরিত লোকটির নাম উল্লেখ করা হয়নি। এ ছাড়াও এই আলোচনা আছে *তারীখু তাবারী* (০২/১৯৭) ও *উয়ূনুল আসারে* (০১/৪৯)।

'যদি আপনি এমন কারো প্রস্তাব পান, যে একাধারে সৌন্দর্য, সম্পদ, সম্মান ও বংশীয় আভিজাত্যের অধিকারিণী, তাহলেও কি চুপ করে থাকবেন?'

নাফিসার এই কথা শোনামাত্রই মুহাম্মাদ বুঝে ফেললেন—এই নারী খাদীজা ব্যতীত আর কেউ হতে পারে না! রবের কসম! সৌন্দর্য, সম্মান ও বংশগৌরবে খাদীজার সমকক্ষ আর কে আছে! তিনি ভাবতে লাগলেন—খাদীজা প্রস্তাব করলে তো আমি সাড়া দেবই; কিন্তু খাদীজা কি সত্যিই আমার মতো নিঃস্ব যুবককে প্রস্তাব করতে পারে?

মুহাম্মাদকে চিন্তামগ্ন রেখে নাফিসা চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে একসময় মুহাম্মাদের মনে হলো—এ অসম্ভব। নাফিসা হয়তো অন্য কারও কথা বলেছে। কেননা, খাদীজা যেখানে কুরাইশের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও ধনী ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, সেখানে আমার মতো সর্বস্বহারা যুবককে সে গ্রাহ্য করবে তা তো অতিকল্পনা ছাড়া কিছু নয়। নিজেকে বাস্তবতা বোঝাতে সচেষ্ট হলেন তিনি। মন শান্ত করতে রওনা করলেন কাবার দিকে।

পথে এক গণক নারী তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'মুহাম্মাদ, তুমি কি কাউকে প্রস্তাব দিতে যাচ্ছ?'

তিনি সাচ্চা মনে জবাব দিলেন, 'না তো!'

নারীটি খানিক সময় তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কেন নয়? কসম! খাদীজা ব্যতীত কুরাইশের কোনো নারীই তোমার সমপর্যায়ের হতে পারে না!' [১]

এরপর খুব দ্রুতই মুহাম্মাদের কাছে খাদীজার প্রস্তাব আসে এবং চাচা আবু তালিব ও হামযার পরামর্শে প্রস্তাব গ্রহণ করেন মুহাম্মাদ। অল্প সময়ের মধ্যেই বিয়ের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। বাড়িতে জমা হয় বংশের লোকজন। তাদের সামনে বিয়ের খুতবা পাঠ করেন আবু তালিব—'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। প্রিয় সুধীবৃন্দ, আমাদের সবার কাছে এটি স্বীকৃত, যে, কুরাইশ বংশে মেধা, প্রতিভা ও

---

[১] পুরো বর্ণনাটি আছে সুহাইলীর *আর-রওজের* প্রথম খণ্ডে : ২১৪; *উয়ূনুল আসার* : ০১/৫০। নাফিসা বিনতু মুনইয়া হলেন উমাইয়া ইবনু আবী উবাইদা আত-তামীমীর মেয়ে। তাঁর মা মুনইয়া বিনতু জাবিরের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে তাঁকে নাফিসা বিনতু মুনইয়া বলা হয়। তাঁর জীবনী আছে *আল-ইসাবাহ* (০৮/২০০) ও *আল-ইসতীআব* (০৪/১৯১৯)-এ।

মর্যাদায় মুহাম্মাদের সমতুল্য কোনো যুবক নেই। অবশ্য, সম্পদ তার খুবই অল্প, কিন্তু সম্পদ তো এক অপসৃয়মান ছায়া ও পাওনাযোগ্য ঋণমাত্র। তো, খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদকে বিয়ের প্রতি সে আগ্রহ প্রকাশ করেছে; খাদীজাও তাকে বিয়ে করতে চায়...।'

এরপর খাদীজার চাচা আমর ইবনু আসাদ ইবনু আবদিল উযযা মুহাম্মাদের প্রশংসা করেন এবং ২০টি বাচ্চা উটের সমপরিমাণ মহর নির্ধারণ করে বিয়ে পড়িয়ে দেন।[১] আকদ সম্পন্ন হতেই পশু যবাই করা হয়। দফ বাজানো হয় এবং উভয় পক্ষের পরিবার ও নিকটজনদের জন্য খাদীজার ঘরে ভোজের আয়োজন করা হয়। মেহমানদের মধ্যে হঠাৎ দেখা যায়—বনু সাদ গোত্রের হালীমাও আছেন। দুধ-সন্তানের বিয়ে দেখতে সুদূর তায়েফ থেকে তিনি এসে পৌঁছেছেন মক্কায়। পরদিন সকালে যখন বিয়েবাড়ি থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন হালীমা, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল ৪০টি বকরি; প্রিয়তম স্বামীর দুধমাতার প্রতি এগুলো ছিল নববধূর বিশেষ উপহার। খাদীজার এই ভালোবাসা দেখে মুহাম্মাদের বুকে মা হারানোর হাহাকার জেগে ওঠে। চোখদুটো অশ্রুসিক্ত হয় তাঁর। হঠাৎ তিনি অনুভব করেন—একটি কোমল হাত বড় মায়া নিয়ে তাঁর দুঃখের চিহ্নগুলো মুছে দিচ্ছে। তাঁর মনে হতে থাকে—দীর্ঘ বঞ্চনার পরে স্রষ্টা বুঝি তাঁকে উপহার দিয়েছেন হৃদয় শান্ত-করা এক মায়ার বাঁধন।

মক্কার লোকেরা এই দুই অসাধারণ মানুষের বিয়েকে অন্য সাধারণ বিয়েগুলোর মতোই তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি। তাদের কাছে এই বিয়ে কেবল 'আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ' ও 'খুওয়াইলিদের কন্যা খাদীজা'র[২] প্রণয় ব্যতীত আর কোনো বিশেষত্ব রাখেনি; কিন্তু যুগযুগান্তর ধরে মানুষের চিন্তায়, চেতনায় ও নৈমিত্তিক আচরণে সেই বিয়ের অনস্বীকার্য প্রভাবের ফলে, আজকের ইতিহাস তার প্রতিটি বিষয় স্মরণ করে রাখতে চায়।

স্বামী-স্ত্রীরূপে এই দুই মানব-মানবী শ্রেষ্ঠ দাম্পত্যজীবন উপভোগ করেছেন।

---

[১] ইবনু ইসহাক ও যুহরীর বর্ণনায় এসেছে, যে, খাদীজার বাবা মূলত তাঁকে বিয়ে দিয়েছেন। উয়ূনুল আসার (০১/৫০) ও *সীরাতু ইবনি হিশামে* (০১/২০১) বিস্তারিত বর্ণনা আছে। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে—নবীজি ﷺ খাদীজাকে ১২ উকিয়া মহর দিয়েছেন। দেখুন—*আস-সিমত* (১৫) ও *আল-মুহাব্বার* (৭৯)।

[২] খাদীজার মা ছিলেন ফাতিমা বিনতু যায়িদা ইবনিল আসাম। দেখুন—*আল-ইসতীআব* : ০৪/১৯১৭; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১৭৫; *আল-মুহাব্বার* : ১২, ১৮।

খুব স্বাচ্ছন্দ্যে, শান্ত-সমাহিতভাবে তাঁরা ভালোবাসার স্বচ্ছ পেয়ালা থেকে পান করেছেন সুখ। পুরো মক্কা তাঁদের এই অপূর্ব ভালোবাসার সাক্ষী হয়েছে; এবং একসময় তাঁদের সেসব কর্মকীর্তি সোনার হরফে লিপিবদ্ধ হয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

১৫টি বছর বড় সুখের জীবন উপভোগ করেছেন তাঁরা। প্রীতি-ভালোবাসার বর্ণিল উদ্যানে উড়ে বেড়িয়েছেন খোশনসীব প্রজাপতি হয়ে। রিযিকের প্রাচুর্যময় নহরে আল্লাহ যেন রীতিমতো অবগাহন করিয়েছেন তাঁদের। এই সময়ে তাঁদেরকে দুটি পুত্র ও চারটি কন্যাসন্তান দান করেছেন তিনি—কাসিম, আবদুল্লাহ, যাইনাব, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা।[১] জীবন যেন তাঁদেরকে সেই ক'টি বছর নির্ঝঞ্ঝাটে উপভোগের সুযোগ দিয়েছিল। ফলে, মুহাম্মাদ তখন ভালোবাসার সুমিষ্ট ঝরনা থেকে তৃপ্তিভরে পান করেছেন সুখের সুধা। এ-যেন তাঁর প্রতি রবের তরফ থেকে ছিল অতীত দুঃখ-কষ্টের প্রতিদান; এবং ভবিষ্যতের সংগ্রামী ও কর্মমুখর জীবনের জন্য বড় পাথেয়।

ওই সময়ে তাঁদেরকে দুই পুত্র হারানোর হৃদয়বিদারী বেদনাও সইতে হয়েছে। দুজন মিলে তাঁরা সেই অসহনীয় কষ্ট-সাগর পাড়ি দিয়েছেন। নিজেদেরকে তাঁরা সান্ত্বনা দিয়েছেন অনস্বীকার্য বাস্তবতা দিয়ে—সন্তান হলো রবের তরফ থেকে আমানত; আর, আমানত তো একদিন ফেরত দিতেই হয়। সুতরাং হাহুতাশ না-করে সবর ও সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করাই সর্বোত্তম।[২]

লাইলাতুল কদর কাটল রাসূলের সান্নিধ্যে

এই ঘটনা কিন্তু শুধু ওই মহিমান্বিত পরিবারটির জীবনেই আসেনি, এবং শুধু কুরাইশ ও আরবদের জন্যও তা বিশেষায়িত ছিল না, বরং এই ঘটনা ঘটেছিল সমগ্র মানবতার জীবনমঞ্চে। লাইলাতুল কদরে (কদরের রাতে) রাসূল হিসেবে প্রথম ওহী পান মুহাম্মাদ ﷺ। আল্লাহ তাঁকে সর্বশেষ নবী হিসেবে এবং মানুষের

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/২০২; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১৭৫; *আল-মুহাব্বার* ৭৯; *আল-ইসতীআব* ০৪/১৮১৭।

[২] রাসূলের পিতৃত্ব ও খাদীজার মাতৃত্ব নিয়ে এখানে আর বেশি আলোচনা করছি না। এ-নিয়ে লেখিকার বই 'নবী-তনয়া'য় বিস্তারিত আলোচনা আছে। তাবারী লিখেছেন—'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে খাদীজার বিয়ের পর তাঁর সঙ্গেই থাকতেন ছেলে হিন্দ ইবনু আবী হালাহ।' *তাবাকাতু সাহাবা*, *তাবাকাতু হুফফায* ও বংশবিদ্যার গ্রন্থসমূহে আছে যে, হিন্দ ছিলেন রাসূলের রবীব তথা পালকপুত্র।

প্রতি প্রেরিত সর্বশেষ সুসংবাদবাহী ও ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে নির্বাচন করেন।

রিসালাতের ঘোষণা ছিল এক কঠিন ও সংগ্রামী জীবনের পদধ্বনি। এটি ছিল এমন এক যুগের সূচনা, যে-যুগের দিনলিপিগুলো পূর্ণ হয়ে আছে নির্যাতন, নিপীড়ন, শাস্তি, জিহাদ ও সবশেষে আল্লাহর সাহায্যের চিত্র দিয়ে।

তবে, সত্য কথা হলো, মুহাম্মাদের ﷺ রাসূল হওয়ার এই বিরাট ঘটনাটি আরবদের জন্য সহসা ঘটে যাওয়া কোনো ব্যাপার ছিল না। কারণ, এক নয়া নবীর আগমন ঘনিয়ে আসার বিভিন্ন নিদর্শন ইতিমধ্যেই তাদের সামনে প্রকাশ পেয়েছিল। যেই লোকেরা রাতভর আড্ডা দিত, যেই গণক-জ্যোতিষেরা মানুষকে ভবিষ্যত বলত এবং ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে নানা আলাপ-আলোচনা করত যেসব লোক, এই প্রতীক্ষিত আসমানী রিসালাত নিয়ে নিজেদের মধ্যে তারা কানাঘুষা কম করত না।

বিশেষত, মক্কা ছিল সেই পুণ্যভূমি যেখানে ওইসব নিদর্শন ও খোশখবর একের পর এক দৃশ্যমান হতো। সুপ্রাচীন যুগ থেকে হজ ও অন্যান্য ইবাদাতের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় সেখানে নানারকম অলৌকিক নিদর্শনের দেখা পাওয়া যেত।

কিন্তু কেউই জানত না, যে, কখন ও কীভাবে সেই প্রতীক্ষিত নবীর আগমন ঘটবে? এ-কারণেই মুহাম্মাদের ওপর ওহী অবতরণের অকল্পনীয় কথা শুনে তারা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে।

প্রিয়তমা স্ত্রীর ভালোবাসার পরশে যখন থেকে মুহাম্মাদের জীবন-তরী খুব সাবলীল গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল, তাঁর নিত্যকার জীবন-সংগ্রামের সব দুঃখ-বিষাদ যখন মুছে যাচ্ছিল স্ত্রীর মায়াভরা মুখখানি দেখে, তখন থেকেই নিজের একান্ত ইচ্ছা ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে মগ্ন হওয়ার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। চিন্তা-ভাবনা ও গভীর ধ্যানমগ্নতার যে আশৈশব অভ্যস্ততা তাঁর, মেষ চরানোর কালে যার জন্য অফুরান সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি এবং পরবর্তী সময়ে জগত ও জীবিকার শত জটিলতা যা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে রেখেছিল দীর্ঘ একটা সময়, প্রাণের আকুতি-মেশা সেই অভ্যস্ততায় নতুন করে ফিরতে পেরে তিনি যেন নিজেকেই ফিরে পেয়েছিলেন!

মুহাম্মাদের ভাবনার জগতে হাজির হয় নানা বস্তু, ব্যক্তি, স্থান ও জায়গা। গভীর

ধ্যানে তিনি এদের মধ্যে পরিভ্রমণ করেন। বিশেষত, প্রায়ই তাঁর মন কাবা ঘর নিয়ে মগ্ন হয়—'এ তো সেই ঘর, যার উসীলায় রচিত হয়েছে মক্কার গৌরব ও মর্যাদাপূর্ণ ইতিহাস। বিশেষত, আমার পরিবারের সোনালি অতীত তো এই ঘরকে ঘিরেই।[১] এই ঘরই তো যুগ-যুগান্তরের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আমার বাবা আবদুল্লাহ ও সমস্ত আরবের পূর্বপুরুষ ইসমাঈলের মধ্যে এক মজবুত বন্ধন তৈরি করে দিয়েছে...এবং এই ঘরটিই বাবা আবদুল্লাহর জবাই হওয়ার পরিবর্তে রক্তপণ দেওয়ার ঘটনার মাধ্যমে দূর অতীতের রঙিন স্মৃতিগুলোকে সজীব করে তুলেছে—যেই অতীতের ক্যানভাসে জ্বলজ্বল করছে সর্বপ্রথম আল্লাহর জন্য কুরবান হতে যাওয়া ইবরাহীমপুত্র ইসমাঈলের ছবি।'

মুহাম্মাদ ছিলেন সত্যের আলোয় স্নাত। ফলে, খুব স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর ঘরে জড়ো করে রাখা অন্ধ, বধির ও নিজের উপকার-অপকারের ব্যাপারে অক্ষম মূর্তিগুলোকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এগুলো তাঁর সম্প্রদায়ের স্বপ্ন-আশা পূরণ করবে—এমন অসাড় আকাঙ্ক্ষা তিনি বর্জন করেছেন, যেই আকাঙ্ক্ষার চোরাবালিতে তলিয়ে নিতান্তই তুচ্ছ এই পাথরগুলোর ইবাদাত করছে তাঁর সম্প্রদায়। ফলে, তারা নিজেদেরই হাতে গড়া এই মূর্তিগুলোর সামনে বিভিন্ন বস্তু উৎসর্গ করে; এরপর এগুলোকে নিজেদের ইলাহ ও রব হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।

চিন্তা ও ভাবনার চর্চা যেন দিন দিন তাঁর অনুভবকে আরও তেজদীপ্ত ও প্রখর করে দিয়েছে; তাই, এখন জগতের সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়গুলো সহজেই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাতের গম্ভীরতা, মরুর বিশালাকার অস্তিত্ব, আলোকোজ্জ্বল সূর্য ও স্বচ্ছ আকাশ দেখলেই তাঁর মনে হয়—এসবের আড়ালে নিশ্চয় কোনো বিরাট ক্ষমতাধর কেউ লুকিয়ে আছেন, যিনি এসবকে পরিচালিত করেন এক সূক্ষ্ম ও সুশৃঙ্খল নিয়মে; যেখানে প্রত্যেকে তার জন্য নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলে। সূর্য পারে না চাঁদের চেয়ে আগ্রগামী হয়ে যেতে, চাঁদও পারে না নিয়ম ভেঙে দিনকে পেছনে ফেলতে। বরং প্রত্যেকেই স্ব স্ব কক্ষপথে কেটে চলে নিয়তির সাঁতার।

---

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/১৬৩। 'মক্কা' নিয়ে পূর্ণ একটি বিশেষায়িত অধ্যায় পড়তে দেখুন লেখিকার গ্রন্থ 'রাসূলের মা' যা শীঘ্রই মাকতাবাতুল আসলাফ থেকে প্রকাশিত হবে ইন শা আল্লাহ।

চল্লিশে পৌঁছুতেই দেখা গেল, হেরা পাহাড়ের একটি গুহায় একাকী সময় যাপন তাঁর কাছে বড় প্রিয় হয়ে উঠেছে। আত্মিক ধ্যান-সাধনাই তাঁর নিকট সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, এই ধ্যান-সাধনাতেই তাঁর মনে হয় যে, তিনি সবচেয়ে বড় সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রহস্য উদ্ঘাটনের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হয়েছেন।

এ-সময়ে খাদীজা কিন্তু নিজের বয়স ও সামাজিক অবস্থানের দিকে তাকিয়ে গাম্ভীর্য ও বড়ত্বের ভাব নিয়ে বসে থাকেননি; ফলে, ধ্যানাচ্ছন্ন গুহামুখী মুহাম্মাদের পথরোধ করে তিনি দাঁড়াননি; একাকী সময় যাপনের জন্য যে মুহাম্মাদ কখনো কখনো তাঁর থেকে কিছুটা দূরত্ব অবলম্বন করতেন, তখনও তিনি তাঁকে তাঁর মতো করে থাকতে দিতেন। কখনো ক্ষোভ কিবা মেয়েলি চটুলতা দিয়ে তাঁর চিন্তার গতিময়তায় ব্যাঘাত ঘটাননি। বরং তাঁর ঘরে থাকার সময়টায় একেবারে শান্ত-সমাহিত থেকে, নিবিড় যত্ন-পরিচর্যা দিয়ে তাঁর পাশে থেকেছেন; আর, যখন তিনি চলে যেতেন গুহার উদ্দেশে, তখন দূর দূর পর্যন্ত তাঁর ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকা ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকতেন খাদীজা। কখনো কখনো তাঁর নিরাপত্তা ও প্রয়োজনাদির জন্য পেছনে পেছনে কাউকে পাঠিয়ে দিতেন; [১] তবু, তাঁর নির্জনবাস ও একাকিত্বে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কিছু করতেন না।

এভাবে বাহ্যত সবকিছুই প্রতীক্ষিত রিসালাতের ইস্তিকবাল ও স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত মনে হতে লাগল; কিন্তু এত প্রস্তুতি সত্ত্বেও মহামহিম রবের তরফ থেকে যখন জগতশ্রেষ্ঠ মানুষটির কাঁধে রিসালাতের দায়িত্ব অর্পিত হলো, তখন রিসালাতের জন্য প্রতীক্ষারত ভূমিতেই তা এক আকস্মিক ভূকম্পনের রূপ লাভ করল। এবং সদ্য নবুওয়াতে ভূষিত মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহর সমগ্র সত্তায়ও যেন এক ভয়াবহ ঝড় বয়ে গেল; যিনি কখনো কাবায় রাখা মূর্তিগুলোকে মেনে নিতে পারেননি এবং কখনো যাঁর চিন্তায়ও আসেনি, যে, তাঁর সম্প্রদায়ের জীবন এভাবেই মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার জলরাশিতে ডুবতে থাকবে না চিরকাল...

তো, সেই কদরের রাতে হেরাগুহায় তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হলো। ভীত, কম্পিত মুহাম্মাদ ফ্যাকাশে চেহারায় বাড়ির পথ ধরলেন। চারদিকে রাতের আঁধার তখন হালকা হতে শুরু করেছে। ঘরে পৌঁছে স্ত্রীর কামরায় হাজির হতেই

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/২৫৩; *আস-সিমতুস সামীন* : ১৯; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/২০০।

তাঁর মনে হলো, এতক্ষণে বুঝি তিনি নিরাপদ জায়গায় পৌঁছুতে পেরেছেন! কাঁপা কাঁপা গলায় প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন। তাঁর কথা শুনে খাদীজার মনে হয়নি, যে, তিনি স্বপ্নের ঘোরে উদ্ভট কোনো কথা বলছেন, কিবা, তাঁকে পেয়ে বসেছে কোনো পাগলামি; বরং তিনি তাঁকে সঙ্গে সঙ্গেই বুকে জড়িয়ে নিয়েছেন। তাঁর অবস্থা দেখে কেমন মমতায় আপ্লুত হয়ে গেছে খাদীজার মন। অত্যন্ত মজবুতভাবে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তিনি বললেন, 'কাসিমের বাবা, আল্লাহ্ আমাদেরকে হেফাজত করবেন। আপনি তো আমার ভাইও—আপনাকে আমি সুসংবাদ দিচ্ছি, আপনি শান্ত হোন! যেই মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আপনিই হবেন এই জাতির নবী। আল্লাহর কসম! তিনি কিছুতেই আপনাকে অপমানিত করতে পারেন না। আপনি তো আত্মীয়তা বজায় রাখেন, সর্বদা সত্য বলেন, দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ান, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন, এবং সত্যপথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।'[১]

খাদীজার কথা শুনে তাঁর ভয়াচ্ছন্ন হৃদয়ে আশ্বাসের হাওয়া বয়ে গেল—তিনি কোনো জ্যোতিষ নন; তাঁর কোনো পাগলামিও নেই। খাদীজার মায়াবী মিষ্টি স্বর যেন ভোরের স্নিগ্ধ আলোর সঙ্গে তাঁর হৃদয়-ভূমি মুখরিত করল—আস্থা, নিরাপত্তা ও শান্তির আযানে!

তিনি নিশ্চিন্ত-নির্ভার হয়ে গেলেন। খাদীজা খুব কোমলভাবে, মাতৃসম মমতায় তাঁকে শুইয়ে দিলেন বিছানায়—মায়েরা যেমন শিশুকে শুইয়ে দেয়, মধুমাখা স্বরে ঘুম পাড়ায় এবং শিশুর ঘুমের অরণ্যে ছড়িয়ে দেয় ঝলমলে স্বপ্নের রেণু। কিছু সময়ের জন্য তাঁর দুচোখ আরাম করল। নিজেকে তিনি সঁপে দিলেন এক শব্দহীন নরম ঘুমের কোলে। তাঁর পাশে বসে রইলেন ভালোবাসা ও সাচ্চা ঈমানের দীপিত প্রতীক খাদীজা। খানিক বাদে তাঁর গভীর ঘুম অনুভব করে খাদীজা উঠে দাঁড়ালেন। সন্তর্পণে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। পথে নেমেই ছুটলেন চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনু নাওফালের বাড়ির দিকে। তখনও মক্কাবাসী ভোরের মিষ্টি ঘুম থেকে জেগে ওঠেনি, প্রকৃতিতে তখন চলছে এক নতুন আলো

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/২৫৩; *তারীখু তাবারী* : ০২/২০৫-২০৭; *আস-সিমতুস সামীন* : ১০; *উয়ূনুল আসার* : ০১/৮৩; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/২০০।

ও নতুন জীবন দিয়ে মক্কাকে সুসজ্জিত করার প্রস্তুতি।

খাদীজাকে দেখে ওয়ারাকা দাঁড়াতে চাইলেও পারলেন না, বার্ধক্য তার দাঁড়ানোর শক্তি অনেকাংশেই খর্ব করে দিয়েছে, কিন্তু খাদীজার বলা কয়েকটি বাক্য কানে যেতেই উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর সমগ্র সত্তায় যেন খেলে গেল প্রাণসঞ্জীবনী বিদ্যুৎ। প্রবল মানসিক আন্দোলনের মধ্যে তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—'সুবহানাল্লাহ...সুবহানাল্লাহ...আমার প্রাণ যাঁর হাতে, সেই সত্তার শপথ! খাদীজা, তুমি আমাকে সত্য বলে থাকলে শোনো—অবশ্যই তাঁর কাছে সেই মহান বার্তাবাহক এসেছেন, যিনি আসতেন হযরত মূসা ও ঈসার কাছে। নিশ্চয় তিনি এই উম্মাহর নবী, তুমি তাঁকে তাঁর কর্মে অটল-অবিচল থাকতে বোলো।'[১]

খাদীজা আর এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। তখন আর একটি শব্দও শোনার মতো ধৈর্যই তো ছিল না তাঁর, বরং তিনি তো পারছিলেন না, যে, হাওয়ায় চড়ে গিয়েই স্বামীকে এই খোশখবর দিয়ে দেন! যেন একরকম উড়ে গিয়েই স্বামীর কাছে হাজির হলেন তিনি। দেখলেন—যেমন রেখে গিয়েছিলেন, তেমনই তিনি ঘুমিয়ে আছেন এখনও।

আনন্দ-উত্তেজনায় কাঁপছিলেন খাদীজা। স্বামীকে জাগানোটাও ভালো মনে হলো না তাঁর কাছে। তিনি বরং তাঁর খুব কাছ ঘেঁষে বসে পড়লেন। তাঁর প্রতি মায়া-ভালোবাসায় যেন খাদীজার হৃদয়টা গলে গলে মিশে যাচ্ছিল। হঠাৎ কিছুটা নড়ে উঠলেন তিনি। তাঁর শ্বাস ভারী হয়ে গেছে—মনে হলো। বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়তে লাগল কপাল থেকে...কিছুক্ষণ পরে আবার তাঁর শান্তভাব ফিরে এল। শ্বাস স্বাভাবিক হলো। কিন্তু মনে হলো—তিনি যেন কোনো অদৃশ্য কথকের প্রতি নিবিষ্ট হয়ে আছেন। এরপরেই তিনি অতি ধীর গতিতে পাঠপুনরাবৃত্তির মতো করে তিলাওয়াত করতে লাগলেন—

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/২৫৪; *তারীখু তাবারী* : ০২/২০৬; ঘটনাটি *বুখারী* (০৩) ও *মুসলিম* (২৯৩)-এ থাকলেও, ওই দুই গ্রন্থের সঙ্গে এখানকার বর্ণনার পার্থক্য আছে। সেখানে সরাসরি খাদীজা নবীজিকেই ওয়ারাকার কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু এখানে বলা হয়েছে—খাদীজা গিয়েছেন, নবীজি নন।—অনুবাদক।

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

> 'হে চাদরাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন! আপনার পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, নিজের পোশাক পবিত্র করুন, অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন, অধিক বিনিময়ের আশায় দান করবেন না এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সবর করুন।'[১]

খাদীজা তো বসে ছিলেন সামনেই, তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা দেখামাত্রই তিনি ওয়ারাকার কথাগুলো তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। শুনে, খাদীজার দিকে তিনি পূর্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর সেই চাউনিতে ছিল খুশি, আবেগ ও শোকরের ঝিলিমিলি। তামাম জগত যিনি প্রেম, নিরাপত্তা ও শান্তির গানে মুখরিত করেছেন, তাঁকে দেখার একরকম তৃপ্তি যখন অনুভূত হলো, তখন বিছানার দিকে ফিরলেন। আবেগভেজা কণ্ঠে বললেন, 'খাদীজা, আরাম ও নিদ্রার সময় শেষ হয়ে গেছে। জিবরীল আমাকে বলেছেন, মানুষকে পরকালের ভীতি প্রদর্শন করতে এবং তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর ইবাদাতের প্রতি আহ্বান করতে। বলো তো—আমি কাকে ডাকব? কে সাড়া দেবে আমার কথায়?'

তাঁর প্রেমে ব্যাকুল খাদীজা এক মুহূর্ত দেরি করলেন না। স্বামীর আনীত মহাসত্যের আহ্বানে সাড়া দিলেন। নবী মুহাম্মাদ শান্তি পেলেন, স্বস্তিতে ভরে গেল তাঁর হৃদয়। এরপর সাক্ষাত হলো ওয়ারাকার সঙ্গে, ওয়ারাকা তো চিৎকার করে বলে উঠলেন—'আমার প্রাণ যাঁর হাতে, তাঁর শপথ! আপনি অবশ্যই এই উম্মাহর নবী। অবশ্যই আপনাকে মিথ্যা আখ্যা দেওয়া হবে, কষ্ট দেওয়া হবে, দেশান্তর করা হবে, আপনার সঙ্গে লড়াই করা হবে। কসম! সেসময়ে আমি বেঁচে থাকলে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষে আপনার সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব।' এই বলে, কাছে গিয়ে তাঁর কপালে চুমু খেলেন ওয়ারাকা।

মুহাম্মাদ বললেন, 'ওরা কি আমাকে দেশান্তর করবে?'

ওয়ারাকা বললেন, 'হ্যাঁ, অতীতে আপনার মতো যে-ই সত্যের বাণী নিয়ে এসেছে, তার সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। হায়, সেসময়ে আমি যদি আপনার

---

[১] সূরা মুদ্দাসসির : ০১-০৭।

পক্ষে একটি ঢাল হয়েও দাঁড়াতে পারতাম!

আমি যদি সেসময়ে জীবিত থাকতাম!'[১]

ওয়ারাকার কথা শুনে মুহাম্মাদের মন খুশি হয়ে গেল। প্রফুল্ল ও নির্ভার মনে তিনি ঘরে ফিরে গেলেন এবং এরপরেই তিনি নতুন উদ্যমে নামলেন দাওয়াতের পথে, যে-পথে তাঁকে এমন কষ্ট, মুসীবত ও নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হলো, ইতিহাসে যার নজির নেই। কারণ, কুরাইশরা কখনোই এটা মানতে প্রস্তুত ছিল না যে, তাদের ধর্মকে দোষযুক্ত বলা হবে, তাদের সংস্কার ও আকীদা-বিশ্বাসকে বোকামিপূর্ণ বলা হবে এবং তাদের বাপ-দাদার পূজিত প্রতিমাদেরকে ছোট করা হবে।

এই কণ্টকাকীর্ণ পথে বিশ্বাস ও প্রেমের ছায়া নিয়ে মুহাম্মাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গ দিয়েছেন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী। তিনি তাঁকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছেন, কথা দিয়ে সাহস জুগিয়েছেন, বিপদ-আপদ ও শত ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর কাঁধে তিনি রেখেছেন সান্ত্বনার নরম কোমল হাত। ক'বছর এভাবেই গেছে। কিন্তু যখন পুরো শহরে বনু হাশিম ও বনু আবদিল মুত্তালিবের বিরুদ্ধে কঠোর অসহযোগ ঘোষণা করা হলো, এই ঘোষণা কাগজে লিখে কাবার গায়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো[২] এবং পুরো মক্কা থেকে বয়কট করে তাঁদেরকে আবু তালিবের উপত্যকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হলো, তখনও খাদীজা তাঁর স্বামীর সঙ্গে সেই কঠিন উপত্যকাবাসে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের শত শত স্মৃতি ছেড়ে, নিজের সব প্রিয় বস্তুগুলো রেখে এবং বহু স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার মাটি ছেড়ে একেবারে সাধারণভাবে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন স্বামীর সঙ্গে। তিনি হেঁটে চলেছেন তাঁর স্বামীর পেছনে, তাঁর নবীর পেছনে। তিনি হেঁটে চলেছেন—অথচ বয়স, বার্ধক্য, সন্তান হারানো, আর, সঙ্কট-সংগ্রামে ক্লান্ত-শ্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে তাঁর কোমল-দুর্বল নারীসত্তা।

আবু তালিবের উপত্যকায় রাসূল ও তাঁর সঙ্গী-পরিজনদের সাথে তিন তিনটি বছর কাটিয়ে দেন খাদীজা। তাঁর জীবনকে যেন শেষবারের মতো দুমড়ে-মুচড়ে দেয় পাষণ্ড পৌত্তলিকদের অন্ধ-আক্রোশী এই ধ্বংসাত্মক অবরোধ...

---

[১] *বুখারী* : ০৩; *মুসলিম* : ১৬০; *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/২৫৪; *তারীখু তাবারী* : ০২/২০৬, ২০৭।
[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/৩৭৫; *তারীখু তাবারী* : ০২/২২৮।

এক দুঃখমোড়া বছর

এভাবে একদিন ঠিকই সত্য, নির্ভীক ও অবিচল ঈমানের সামনে ভেঙে পড়ল বাতিল ও পাষাণ অবরোধের মিথ্যা দেয়াল। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে ফেরার সময় হলো। হারামের পাশে নিজের ঘরে ফিরে এলেন তিনি স্ত্রীকে নিয়ে। সেই স্ত্রী, এই কঠিন অবরোধের সময়েও স্বামীকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য নিজের শেষটুকু যিনি নিংড়ে দিয়েছেন; অথচ জীবনের বেলা গড়িয়ে তখন তিনি হয়ে গেছেন ৬৫ বছরের এক সান্ধ্য-বধূ।

অবরোধমুক্তির ছ'মাস পেরিয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন আকাশ যেন আঁধারে ছেয়ে গেল। চারদিকে নৈঃশব্দের করুণ কান্না শুরু হলো এবং খুব নীরবে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর থেকে এক বন্ধুসম পিতা ও অটল-অবিচল তত্ত্বাবধায়কের ছায়া উঠিয়ে নিয়ে শান্ত মাটির নিচে চলে গেলেন তাঁর চাচা আবু তালিব; সর্ববিষয়ে যিনি ছিলেন তাঁর উত্তম পরামর্শদাতা এবং তাঁর সমস্ত শত্রুর সামনে যিনি একাই ছিলেন প্রতিরোধের পাহাড়।

আবু তালিবের শেষকৃত্যে হাজির হতে পারেননি খাদীজা। কারণ, তিনি নিজেও তখন শয্যাশায়ী। জীবনের নিভু নিভু প্রদীপটুকু তখনও বাকি ছিল স্বামীর ভালোবাসার ছায়ায়। তাঁর শয্যাপাশেই বসে ছিলেন স্বামী; তাঁর শেষ মুহূর্তের একাকিত্ব যিনি দূর করতে চেষ্টা করছিলেন; যিনি তাকে শোনাচ্ছিলেন তাঁর জন্য মহান রবের নিকট প্রতীক্ষমান অগুনতি পুরস্কারের খোশখবর; আর, যিনি নিজেও তাঁর কাছ থেকে বিরহী আগামীর পাথেয় গ্রহণ করছিলেন—ধুলির ধরায় আবার কোনো মুলাকাতে যে বিরহের অন্ত হবে না আর!

এর তিন দিন পর খাদীজা—তাঁর প্রতি ঝরুক রবের সন্তোষ ও করুণা-শিশির—সেই স্বামীর সামনেই ধরাধম ত্যাগ করেন, প্রথম মুলাকাতের পর থেকে যেই স্বামীর ভালোবাসায় জীবনের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত বিলীন করেছেন। সেই নবীর দিকে তাকিয়ে থেকেই তিনি চিরতরে চোখের পাতা মেলান, যাঁর রিসালাতের প্রতি সেই কদরের রাতের ভোরেই তিনি নির্দ্বিধ বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন, যাঁর সমস্ত সঙ্কট ও সংগ্রামে সর্বান্তকরণে পাশে থেকেছেন, যাঁর কাছে তিনি ছিলেন প্রেম প্রশান্তি ও মায়াময় আশ্রয় এবং ঠিক এমন অবস্থানে থেকেই তাঁর শান্ত, সন্তুষ্ট ও আনন্দিত প্রাণ ফিরে গেছে রবের কাছে, তাঁর সন্তোষভাজন হয়ে।

এরপর স্বামী ও নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁকে মায়া ও ভালোবাসার অশ্রুতে সিক্ত করে রেখে এসেছেন সেইখানে, যেইখানে রেখে এলে চরম পেরেশানি, বা, ভয়ের সময়ে প্রিয়তমা স্ত্রী আর কখনো বলবেন না—'না, আল্লাহ আপনাকে কক্ষণও অপমানিত করতে পারেন না...।'

সঠিক মতানুসারে,[১] হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকাল হয়েছে হিজরতের তিন বছর পূর্বে। তাঁর মৃত্যুর পর নবী মুহাম্মাদ ﷺ যখন নিজের চারপাশে নজর দিলেন, তাঁর মনে হলো—খাদীজা-বিহীন ঘর কেমন শূন্য আর অচেনা লাগছে। তাঁর চলে যাওয়ার পরে পুরো মক্কা নবীর জন্য বৈরী হয়ে উঠেছে, যেন নিজভূমিতেই তাঁর আশ্রয়ের জন্য নেই এক টুকরো মাটিও।

ইবনু ইসহাক বলেন, 'খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর একের পর এক বিপদ-আপদ আসতে থাকে। খাদীজা তো রাসূলের জন্য ইসলামের পক্ষে ছিলেন এক বড় ওযীর।'[২]

খাদীজাকে হারানোর বছরেই নবীর দুঃখ-কষ্টের চূড়ান্ত হয়; তাই, সে-বছরটিকে 'দুঃখের বছর' নাম দেওয়া হয়। নবীর শত্রু মুশরিকরা ভেবেছিল—সমস্যা-সঙ্কট ও জীবনের ঝড়-তুফান বুঝি চারদিক অন্ধকার করে ঢেকে ফেলেছে তাঁকে, তাঁর ভাগ্যাকাশে বুঝি আর দেখা দেবে না আলোকোজ্জ্বল কোনো দিবাকর। কিন্তু তাদের এসব জল্পনা-কল্পনা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। তারা ভেবেছিল—তাঁকে কাবু করে চূড়ান্ত প্রতিশোধের সময় বুঝি অত্যাসন্ন; অথচ তারা ভুলে গিয়েছিল, যে, সুবহে সাদিকের আগমুহূর্তেই অন্ধকারের ষোলকলা পূর্ণ হয়...

মানে, খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিদায়ের পরপরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তত্ত্বধানে নিয়োজিত হন স্বয়ং জিবরীল; সকাল-সন্ধ্যায় তিনি তাঁর দুঃখ, হতাশা ও সর্বরকম ক্লান্তি মোচন করতেন। প্রথম সারির মুমিনরা জান বাজি রেখে তাঁদের নবীকে আগলে রাখতেন। দ্বিধাহীন চিত্তে, নিঃশঙ্ক মনে তাঁর জন্য নিজেদের হৃদয় ও প্রাণ বিসর্জন দিতেও তাঁরা প্রস্তুত থাকতেন সর্বদা। তাঁর দাওয়াতের পথে শহীদ হতে পারাকে নিজেদের জন্য গৌরব ও মহামর্যাদাজনক

[১] ইউনুস ইবনু বুকাইরের সূত্রে ইবনু ইসহাক (*উয়ূনুল আসার* : ০১/১৩০); *আল-ইসাবাহ* : ০৮/৬২; *আল-মুহাব্বার* : ১১।
[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/৫৭; *তারীখু তাবারী* : ০২/২২৯; *উয়ূনুল আসার* : ০১/১৩০।

বলে বিশ্বাস করতেন তাঁরা।

খাদীজার ইন্তিকালের পরেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুদ্ধ ও পবিত্র দাওয়াত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু মক্কার ভূমিতে নয়, বরং হিজাযের সর্বপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে মুহাম্মাদী দাওয়াতের খুশবু; এরপর হিজায ছেড়ে আশপাশের অন্যান্য আরব-যমীনকেও মোহিত-সুরভিত করে সেই বেহেশতী সৌরভ। নবীর একদল সঙ্গী এই সুরভি-বিলানোর কাজে সর্বপ্রথম নিজেদেরকে সঁপে দেন; নিজেদের ঈমানকে সম্বল করে বহু মরু, সাগর পাড়ি দিয়ে তাঁরা পৌঁছে যান হাবশা-দেশে। নিজের পরিবার-পরিজন ও দেশ-মাটি ছেড়ে চলে গিয়ে জগতের সামনে তাঁরা পেশ করেন এক অপূর্ব চমৎকার দৃষ্টান্ত। ধৈর্য ও ত্যাগে শানিত ঈমানের ঝলক দেখান তাঁরা। তাঁদের হৃদয়ের তারে তখনও বাজতে থাকে রাসূলের যবানে-শোনা জিহাদের মর্যাদা-বিষয়ক হাদীসগুলো। সত্য দ্বীনের জন্য নিজেকে কুরবান করে দেওয়া এবং বীরত্বের সঙ্গে শহীদ হয়ে যাওয়ার মর্যাদা ও পুরস্কারের হাদীসগুলো যেন তখনও তাঁদের ভেতর মোহ বিলাতে থাকে...

খাদীজার ইন্তিকাল-পরবর্তী হজ-মৌসুমে ইয়াসরিব থেকে কিছু লোক মক্কায় এল। তারা দ্রুতই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত হয়ে ফিরে গেল; এবং সেখানকার অনেককেই নবীর সহযোগিতা করতে রাজি করিয়ে ফেলল। তাদের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল—তাদের মাধ্যমেই যেন সংঘটিত হয় সত্যপ্রতিষ্ঠার লড়াই। যেন তারা দুই মহাদৌলতের যেকোনো একটি লাভ করে—হয়তো আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়, নইলে তাঁর রাহে শাহাদাত।

যে জন পুণ্য করল জীবন

কিন্তু খাদীজা ﵂ কি আসলেই হারিয়ে গিয়েছিলেন? কক্ষণও নয়। বরং তিনি তো তাঁর স্বামী রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে সর্বদাই হাজির ছিলেন। রাসূল যেখানেই যেতেন, তাঁর পিছু পিছু যেত খাদীজার ছায়া। যে-পথেই সফর করতেন, সে-পথেরই ওপর যেন বিরাজ করত খাদীজার তরফ থেকে কোনো আলোকোজ্জ্বল সূর্য, তাঁর চারপাশ থেকে যা দূর করে দিত গাঢ়

কালো সব অন্ধকার।

খাদীজার পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে একাধিক নারী যুক্ত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর হৃদয়-জগত ও পার্থিব সবকিছুতে খাদীজার যে-অবস্থান ছিল, তা সর্বদা তাঁর জন্যই নির্ধারিত থেকেছে; সেখানে পৌঁছুতে পারেননি অন্য কেউ। খাদীজা তো ছিলেন নবীর সেই একমাত্র স্ত্রী, যিনি সিকি শতাব্দী ধরে নবীর ঘর করেছেন একাই—কেউ তাঁর শরীক ছিল না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নবীর মনের আকাশে তিনি ছাড়া আর কারও চাঁদমুখ উদিত হয়নি।

কত স্ত্রী নবীর জীবনে এসেছেন; যাঁদের মধ্যে ছিলেন তারুণ্যদীপ্তা, সুন্দরী, বংশ ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ রমণীরা; কিন্তু এঁদের একজনও সেখানে খাদীজার যেই অবস্থান ছিল, তা দূর করতে পারেননি। রাসূলের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে থাকা এবং জীবনসায়াহ্ন পর্যন্ত তাঁর শ্রদ্ধার আসন এককভাবে দখল করে রাখা খাদীজার ছায়াটিকেও কেউ ক্ষীণ, বা, দুর্বল করতে পারেননি।

রাসূলের হৃদয় ও মননে সর্বদাই যে খাদীজা বিরাজ করতেন, এর এক অপূর্ব প্রমাণ দেখে মদীনাবাসী। বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের জয়ের পর বন্দী কুরাইশদের কাছ থেকে মুক্তিপণ দাবি করা হয়। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন নবী-জামাতা (যাঁর সঙ্গে তখন সাময়িক বিচ্ছেদ চলছিল নবী-তনয়া যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার।) আবুল আস ইবনুর রবী'ও। তো, মায়ের রেখে যাওয়া একটি হার তখন স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে পাঠিয়ে দেন যাইনাব। হারটি দেখামাত্রই রাসূলের মনে স্মৃতির পাখিরা করুণ কান্না শুরু করে। তিনি যেন দেখতে পান—খাদীজা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর দিকে তাকিয়ে। তাঁর চোখে-মুখে হাসিকান্নার মিশ্র আভা। নবী-মন হুহু করে ওঠে। চোখের পাতা ভিজে যায় তাঁর। তিনি বিজয়ী সাথীদের ডেকে আবদার করেন—যেন হারটি যাইনাবের কাছে ফেরত পাঠানো হয় এবং 'যাইনাবের বন্দীটি'কে যেন মুক্তি দেওয়া হয়![১]

কিছু দিন পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে কিন্তু আয়িশা বিনতু আবী বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার আগমন ঘটে। আয়িশা হলেন নবীর সেই স্ত্রী, যিনি যৌবনদীপ্তি, প্রাণোচ্ছলতা ও সৌন্দর্যে ছিলেন অতুলনীয়া। তাঁর প্রতি

---

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/২০৭। এই হারটি নিয়ে '*নবী-তনয়া*' বইয়ে পূর্ণ একটি অধ্যায় আছে, যা শীঘ্রই মাকতাবাতুল আসলাফ থেকে প্রকাশিত হবে ইন শা আল্লাহ।

রাসূলের ভালোবাসাও ছিল জীবিত অন্যসব স্ত্রীর চেয়ে আলাদা উচ্চতায়। কিন্তু আয়িশা ঈর্ষাবোধ করতেন রাসূলের ওই স্ত্রীটির প্রতি, যিনি আয়িশার আগেই রাসূল-হৃদয়ে নিজ-ভালোবাসার চাদর বিছিয়েছিলেন; এবং জীবনের শেষ দিন অবধি রাসূলকে একান্ত নিজের করে পেয়েছেন অন্য কারও শরীকানার অধিকারবিহীন।

আর, তাঁর ইন্তিকাল-পরবর্তী সময়ে রাসূল-হৃদয়ে তিনি কতটা জাগরূক থাকতেন, একটি ঘটনা বললেই তা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

একদিন মদীনায় খাদীজার বোন হালাহ্ এলেন। রাসূল ﷺ ছিলেন ঘরে। তিনি হঠাৎ বাড়ির আঙিনার দিক থেকে হালাহ্‌র কণ্ঠ শুনতে পেলেন। তাঁর কণ্ঠ যেন হুবহু প্রিয়তমা খাদীজার প্রেমমাখা কণ্ঠটি। রাসূল আবেগ ও বিস্মিত গলায় বলে উঠলেন, 'আরে, হালাহ্!'

শুধু কণ্ঠটুকু খাদীজার মতো বলে রাসূল এতটা আবেগ ও আনন্দ দেখাবেন, তা যেন আয়িশার মনে কাঁটার মতো বিঁধল। কারণ, তিনিও তো রাসূলকে প্রাণান্ত ভালোবাসেন। তিনিও তো তাঁকে পেতে চান অমন একলা-একান্ত করে। তাই, অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে আয়িশা বলে ফেললেন—'চোয়াল ঝুলে-পড়া, যুগের ঝড়-ঝাপটায় সব খুইয়ে-ফেলা এক কুরাইশ বুড়িকে স্মরণ না-করে থাকতে পারেন না আপনি! আল্লাহ কি আপনাকে তারচেয়ে উত্তম কোনো স্ত্রী দেননি?'[১]

তাঁর কথা শুনে রাসূলের পবিত্র চেহারার রঙ পাল্টে গেল; তিনি রাগমেশানো স্বরে আয়িশাকে বললেন, 'কসম আল্লাহ্‌র! তিনি খাদীজার চেয়ে উত্তম কোনো স্ত্রী দেননি আমাকে! আরে, সব মানুষ যখন আমাকে রাসূল মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তখন সে আমার প্রতি দ্বিধাহীন ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সবাই যখন আমাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছে, তখন সে আমাকে সত্যায়ন করেছে। সবাই যখন আমাকে বঞ্চিত করেছে, তখন সে তার সম্পদ দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছে; এবং কেবল তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেছেন।'

এরপর আয়িশা চুপ হয়ে যান। হয়তো মনে মনে তখন তিনি বলছিলেন—'কসম! আর কক্ষণও আমি তাঁর নাম নেব না...।'

[১] *মুসলিম* : ২৪৩৭।

এর আগেও বিভিন্ন সময়ে খাদীজাকে নিয়ে কথা না-বলে পারতেন না আয়িশা। একদিন আয়িশা দেখলেন, নবীজি ﷺ খাদীজার আলোচনা করেই যাচ্ছেন, থামছেন না। তিনি যেন এতেই খুব স্বাদ পেয়ে গেছেন। তখন আয়িশা বললেন, 'এমনভাবে বলছেন, যেন দুনিয়ায় নারী কেবল খাদীজাই ছিলেন। অন্য আর কোনো নারী যেন ছিল না, বা, নেই!' নবীজি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, সে ছিল; সে-ই ছিল! আরে, তাঁর গর্ভেই তো আমার সন্তান এসেছে...।'

আরেকবার আয়িশা দেখলেন, নবীজি বকরি জবাই করে বলছেন, 'খাদীজার বান্ধবীদের কাছে পঠিয়ে দাও।' এ-নিয়ে আয়িশা একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'খাদীজার প্রতি ভালোবাসার তীব্রতায় তাঁর নিকটজনদের প্রতিও আমি ভালোবাসা অনুভব করি।'[১]

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে—নবীজি ﷺ বলেছেন, 'খাদীজার ভালোবাসা ছিল আমার প্রতি রবের দেওয়া এক মহান রিযিক।'[২]

হযরত আয়িশা নিজেই অনেক সময় বলতেন—'খাদীজার মতো আর কোনো নারীর প্রতি অত ঈর্ষাবোধ হয়নি আমার; তাঁর মৃত্যুর আগে তো রাসূল আমাকে ঘরে আনেননি!'[৩] কখনো আবার বলতেন—'খাদীজার প্রতি আমি যতটা ঈর্ষান্বিত ছিলাম, রাসূলের আর কোনো স্ত্রীর প্রতি অতটা ঈর্ষা ছিল না আমার। কারণ, আমি রাসূলের মুখে তাঁর অনেক স্মৃতিকথা শুনেছি। আর, আমাকে তিনি বিয়েও করেছেন তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পরে।' আরেক বর্ণনায় আছে—'আমি তাঁকে ঈর্ষা করতাম নবীজি তাঁকে বেশি বেশি স্মরণ করার কারণে। অথচ আমি তো তাঁকে কখনো দেখিও নি!'[৪]

এমনকি, মক্কা বিজয়ের দিনেও—যখন পূর্ণ ১০টি বছর পেরিয়ে গেছে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকালের—দেখা গেল, মক্কায় প্রবেশের আগে নবী ﷺ নিজের অবস্থানের জন্য যে-জায়গাটি বেছে নিলেন, সেটি অন্য কোনো জায়গা নয়; বরং তাঁর প্রথম স্ত্রী, প্রথম উম্মুল মুমিনীন খাদীজার কবরঘেষা

---

[১] *আস-সিমতুস সামীন* : ২৬; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৮২৪।

[২] *মুসলিম* : ২৪৩৫; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/৬২।

[৩] *মুসলিম* : ২৪৩৫; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/৬২।

[৪] *মুসলিম* : ২৪৩৫; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৮২৩।

জায়গাই। এবং সেখানেই তাঁর জন্য একটি গম্বুজ-জাতীয় উঁচু কাঠামো[১] তৈরি করা হলো, যেন ওটায় চড়ে তিনি মক্কার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। তিনি যেন খাদীজার আত্মিক মুলাকাত ও হার্দিক পরশ কামনা করছিলেন। যেন চাইছিলেন—বিজয়ের পরে কাবার তাওয়াফে ও মূর্তিধ্বংসে খাদীজা তাঁকে সঙ্গ দেন। আসলে, নবীজি তো খাদীজার মায়া ও ভালোবাসার কোঁচড় থেকে নিজের দীর্ঘ সংগ্রামী সময়ের পাথেয় তুলে নিয়েছিলেন।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার পরে অসংখ্য নারী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু এঁদের সবার থেকে খাদীজা অনন্য হয়েই থাকবেন—সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে মহান রাসূলের রাসূল-জীবনে অসাধারণ ভূমিকা রাখার কারণে। মুসলিম, অমুসলিম—নির্বিশেষে সব ঐতিহাসিক তাঁর সেই অসাধারণ ভূমিকার কথা স্মরণ করেছেন সর্বদা। ঐতিহাসিক বোড লি বলেন, 'খাদীজা যেই পুরুষটিকে (মুহাম্মাদ ﷺ) বিয়ে করেছিলেন, (ভালোবাসার কারণেই তিনি তাঁকে বিয়ে করেছিলেন) সেই পুরুষটির প্রতি তাঁর আস্থা যেন ইসলামের প্রাথমিক সময়ে বিরাট এক আস্থাশীল পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছিল; বর্তমান পৃথিবীর প্রতি সাতজন মানুষের একজন যেই ধর্মবিশ্বাসকে নিজের ঠিকানারূপে গ্রহণ করেছে।'[২]

ঐতিহাসিক মার্গলিউথ রাসূল-মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী লিখেছেন, সেখানে খাদীজার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'সম্মানার্থে খাদীজা তাঁর প্রতি নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন।' এই ঐতিহাসিক তাঁর লেখায় রাসূলের ইয়াসরিব অভিমুখে হিজরতের কথাও লিখেছেন; সেদিন থেকে নিয়ে, যেদিন মক্কা হয়ে গিয়েছিল খাদীজা-শূন্য; আর, খাদীজা শায়িত হয়েছিলেন শান্ত মাটির নিচে।

ঐতিহাসিক ড্রমিঙ্গেম আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন[৩] খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রসিদ্ধ সেই ভূমিকা নিয়ে, যখন স্বামী মুহাম্মাদ ﷺ হেরা-গুহা থেকে তাঁর কাছে ফিরে এসেছেন ভীত, সন্ত্রস্ত, বাকরুদ্ধ হয়ে; তাঁর চুল-দাড়ি ছিল উশকু-খুশকু; এক আশ্চর্যরকম দর্শনে তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন খাদীজা। তখন

[১] *তারীখু তাবারী* : ৩য় খণ্ড, 'অষ্টম হিজরী সনের ঘটনাবলি'।

[২] বোড লি কৃত *আর-রাসূল*-এর আরবী অনুবাদ (মুহাম্মাদ ফারজ ও আবদুল হামীদ কৃত)।

[৩] ড্রমিঙ্গেম কৃত *হায়াতু মুহাম্মাদ*-এর আরবী অনুবাদ (৫৮) (উসতায আদিল কৃত)।

খাদীজা তাঁকে দিয়েছিলেন শান্তি ও নিরাপত্তার চাদর। তাঁকে আবৃত করেছিলেন প্রেয়সীর প্রেম, স্ত্রীর মায়া ও মায়ের স্নেহ দিয়ে। তাঁকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন বুকে—যেখানে তিনি অনুভব করেছিলেন অপরিসীম নিরাপত্তা; জগতের কোনো অনিরাপদজনক হাত যেখানে পৌঁছুতে পারে না।

এই ঐতিহাসিক খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছেন, 'খাদীজার মৃত্যুতে মুহাম্মাদ ﷺ সেই নিকটজনকে হারিয়েছিলেন, মুহাম্মাদের নবুওয়াতের কথা যিনি সর্বপ্রথম জানতে পেরেছিলেন; এবং দ্বিধাহীন চিত্তে কালবিলম্ব না-করে তাঁকে সত্যায়নও করেছিলেন। এই নারীই সর্বদা মুহাম্মাদের হার্দিক শান্তির ব্যবস্থা করতে তৎপর ছিলেন; তিনিই জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তাঁকে আগলে রেখেছিলেন স্ত্রীর ভালোবাসায় এবং মায়ের মমতায়।'

ড্রমিঞ্জেম এখানে সেই বিষয়টি ধরতে পেরেছেন, তাঁর মতো বহু প্রাচ্যবাদী ঐতিহাসিক যা ধরতে পারেননি, যে, এক এতীম যুবকের জন্য মাতৃমমতা কতটা প্রয়োজন; তাই, এক ধনী বিধবাকে তাঁর বিয়ে করা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তাঁরা নানা অপপ্রচার চালিয়েছেন; বিভিন্ন অহেতুক অপবাদ দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক মার্গলিউথ এই বিয়ের প্রধান অনুঘটক সাব্যস্ত করেছেন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সম্পদকে। তাঁর বক্তব্য—'বিয়েটা হয়েছে এক দরিদ্র যুবক ও চল্লিশোর্ধ্ব এমন এক বিধবার মধ্যে, একে একে যাঁর দুজন স্বামী গত হয়েছে; এবং তারা তাঁর জন্য রেখে গেছে অঢেল সম্পদ।' ঐতিহাসিক সাহেব সামনে বেড়ে এমন সব শব্দ-বাক্যও লিখেছেন, যেগুলো থেকে কাঁচা অপবাদ ও বিদ্বেষের উৎকট গন্ধ বেরুচ্ছে। তিনি লিখেছেন, 'মুহাম্মাদের নিকট খাদীজার বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল এমন মুহূর্তে, যখন চাচা আবু তালিবের কিছু তিক্ত কথা হজমের ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন তিনি। ঘটনা হলো, মুহাম্মাদ চাচার কাছে তাঁর মেয়ে উম্মু হানি'র ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর দারিদ্র্যের কারণে তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে ধনী এক ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। সেসময়ে মুহাম্মাদ তাঁর দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা অনুভব করতে পেরেছিলেন; ফলে, তাঁর সঙ্গে বিয়েতে খাদীজার আগ্রহের কথা শোনামাত্রই সম্পদের লোভে বিয়েতে তিনি মত দিয়ে ফেলেন; কারণ, তাঁর সম্মান ও মর্যাদায় যে-আঘাত করেছিল দারিদ্র্য, তিনি চাইছিলেন—সম্পদের মাধ্যমে সেই আঘাতের ক্ষত দূর

করতে।’ [১]

এখানে ঐতিহাসিক সাহেব নির্জলা মিথ্যাচার করেছেন। কারণ, সম্পদের লোভ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের প্রতি আগ্রহী করেনি; এবং এর ফলে তিনি নিজের ও খাদীজার বয়সের ব্যবধান এড়িয়ে যাননি; বরং তিনি খাদীজার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন এক অতুলনীয় কোমলতা ও বিশাল মমত্ববোধ—ছ’ বছর বয়স থেকে বহু কাল যাবত যেই মমতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন তিনি। এ-কথার পক্ষে ঐতিহাসিক ব্লেচারও তাঁর Le probleme de Mohamed গ্রন্থে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

মার্গলিউথের এই বক্তব্যের চেয়ে আরও উদ্ভট ও বিস্ময়কর কথা বলেছেন ঐতিহাসিক ময়েড। [২] খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রদ্ধাবোধের ‘পেছনের উদ্দেশ্য’ বয়ান করার নামে তিনি বলেন, ‘খাদীজার আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানের প্রতি ভয় এবং মতের অমিল হলেই খাদীজা মুহাম্মাদের কাছে তালাক চেয়ে বসতে পারেন—এই শঙ্কাই ছিল খাদীজার প্রতি মুহাম্মাদের সৎ ও বিশ্বস্ত থাকার কারণ!’ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ...

এই ঐতিহাসিক সাহেবের উচিত ছিল আমাদের জন্য এইটুকুও কষ্ট করে ব্যাখ্যা করে দেওয়া, যে, তাহলে খাদীজার মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্বস্ততার কী বিষয় ছিল? তাঁর মৃত্যুর বেশ ক’বছর পরে, তাঁকে নিয়ে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে তর্কের সময়ে রাসূল কি ভয় করছিলেন, যে, খাদীজা তাঁর কাছে তালাক চেয়ে বসবেন? না তিনি অতীত নিয়ে আয়িশার কথা বলাটাই পছন্দ করছিলেন না?

আসলে, বিয়ের পর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবশিষ্ট জীবনের পুরোটা জুড়েই খাদীজা ﷺ বিরাজ করেছিলেন জীবিত থেকে, কিবা, মৃত হয়ে; এবং আয়িশা ﷺ যখন রাসূলকে খেদ করে বলেছিলেন, ‘কেমন যেন খাদীজা ব্যতীত আর কোনো নারীই ছিল না জগতে!’, তখন তিনি কিন্তু বাস্তব বিচারে সামান্যও ভুল বলেননি। কারণ, খাদীজা অমন করেই রাসূলের জীবনকে

[১] এই বিষয়ে সঠিক ঘটনাটি জানতে দেখুন *তাবাকাতু ইবনি সাদ; আস-সিমতুস সামীন* : ১৩৪।
[২] *The life of Mohamed and the history of islam*

নিজের করে নিয়েছিলেন...

খাদীজা ব্যতীত আর কোন নারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই দুঃখের আঁধার থেকে উদ্ধার করতে পারতেন, যেই দুঃখের আঁধারে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন চোখের সামনে মায়ের মৃত্যু দেখে! খাদীজা-ভিন্ন অন্য কোনো নারী কি রাসূলের চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যানমগ্নতার নির্বিঘ্ন পরিবেশ তৈরি করে দিতে পারতেন? পারতেন কি নিজের সর্বস্ব দিয়ে তাঁকে আসমানী রিসালাতের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে?

আর কোনো স্ত্রী কি হেরা থেকে আগত রাসূলের সেই ঐতিহাসিক ডাকে অমন করে সাড়া দিতে পারতেন, যেমন উষ্ণ মায়া, বিগলিত স্নেহ ও দ্বিধাহীন দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সাড়া দিয়েছিলেন খাদীজা? অন্য কেউ কি তাঁকে অমন করে আশ্বস্ত করতে পারতেন, যে, আল্লাহ কক্ষণও তাঁকে অপমানিত করবেন না? পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে আর কেউ কি পারতেন যে, খাদীজার মতো ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েও নিজের সব স্বপ্ন, আশা, আরাম ও বিলাসিতা ছেড়ে রাসূলের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তে তাঁকে সঙ্গ দিতে? পারতেন কি, খাদীজার মতো দুনিয়াবী শ্রেষ্ঠত্বের জায়গায় থেকেও শত দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের মুখে নিজের বিশ্বাসের সততার পক্ষে রাসূলের পাশে দাঁড়াতে?

না, আর কারো পক্ষেই এসব সম্ভব ছিল না; বরং খাদীজাই একমাত্র নারী, আল্লাহর মহাঅনুগ্রহে যিনি এক ভবিষ্যত-নবীর জীবনে মায়া-ভালোবাসার ফুল ছিটিয়েছেন, নবুওয়াতের পর সর্বপ্রথম ঈমান এনে তাঁর প্রতি আস্থার বাঁধনের আরও দৃঢ়তা জানান দিয়েছেন এবং আল্লাহর ইশারায় তিনিই নবীকে শান্তি, স্থিতি ও সহায়তার ঠিকানারূপে নিশ্চিন্ত করেছেন সব পেরেশানি থেকে...

ইবনু ইসহাক[১] বলেন, 'রাসূল ﷺ যখনই মানুষের কাছ থেকে অপ্রীতিকর কিছুর সম্মুখীন হতেন, যখনই তাঁকে কেউ প্রত্যাখ্যান করত, মিথ্যুক আখ্যা দিত এবং তিনি কষ্ট পেতেন, তখনই আল্লাহ খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মাধ্যমে তাঁর সব দুঃখ দূর করার ব্যবস্থা করে দিতেন। খাদীজা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে দৃঢ় রাখতেন, তাঁকে পূর্ণ আস্থা নিয়ে সত্যায়ন করতেন, তাঁর সব দুঃখ-বোঝা হালকা করে দিতেন। এবং এমন করতে করতেই দুনিয়া ছেড়ে পরপারে পাড়ি

[১] *আস-সীরাহ* : ০১/২৫৭; *আস-সিমতুস সামীন* : ২৩।

জমিয়েছেন খাদীজা।'[১]

খাদীজা ﷺ বাহ্যত চলে গেলেও রেখে গিয়েছিলেন তাঁর চার চারটি মেয়েকে; বাবার জীবনের বাকি সময়গুলোকে যাঁরা আগলে রেখেছিলেন মায়ের মতো করেই...

খাদীজার প্রতি আল্লাহর বড় ইহসান, যে, তাঁর মেয়ে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মাধ্যমেই নবী-বংশের প্রদীপ তিনি জ্বালিয়ে রেখেছেন; এবং প্রিয় নবীর মায়াময় আলো ও মোহন খোশবু ছড়িয়ে দিয়েছেন জগতের বুকে...

ফলে, খাদীজা হয়েছেন পরবর্তী নবী-বংশের আলোক-উৎস; উম্মু আহলিল বাইত...রাদিয়াল্লাহু আনহা।

---

[১] হযরত খাদীজা ﷺ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে *বুখারীর* মানাকিব অধ্যায় ও *মুসলিমের* ফাযায়িল অধ্যায় দেখুন।

মুহাজির স্বামীর মুহাজিরা স্ত্রী

সাওদা বিনতু যামআ

> ‘আল্লাহর কসম! স্বামীর হকপ্রাপ্তির কোনো আগ্রহ আমার নেই। আমি শুধু কিয়ামাতের দিন আপনার স্ত্রী হয়ে উঠতে চাই।’
>
> –সাওদা বিনতু যামআ ﷺ
>
> [*আল-ইসাবাহ*]

নিঃসঙ্গ সময়

দিনগুলো কেমন ভারি, বিষাদাচ্ছন্ন; দুঃখ-কষ্টে ক্লান্ত, অবসন্ন। রাতগুলো আবার রঙহীন ফ্যাকাশে; অতীতের স্মৃতিচারণে নির্ঘুম প্রতিটি ক্ষণ। নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে কোনো কষ্ট-ব্যথার সম্মুখীন হলেই আরও একলা হয়ে পড়েন। তিনি তখন খুব করে চান সেই মানুষটির ছায়ার সঙ্গে হলেও একটু কথা বলতে—সহস্র আলোর কণা, শত সাহসের শিরোনাম হয়ে যিনি বিরাজিত ছিলেন তাঁর রাসূল-জীবনের প্রতিটি লমহায়। যিনি ছিলেন রাসূল-পরিবারের মা, তাঁর ঘরের মালিকা, দ্বীন প্রচার ও দ্বীনের জন্য সংগ্রামে তাঁর সর্বপ্রধান সহযোগী ও সহচর।

সাহাবীরাও নবীর দুঃখ-ব্যথা অনুভব করতে পারতেন। তাঁরাও ভাবতেন—নবীজি বিয়ে করে ফেললেই হয়তো তাঁর সেই দুঃখী নিঃসঙ্গতা কেটে যাবে, একসময় যা দূর করেছিলেন বিগত হয়ে যাওয়া উম্মুল মুমিনীন খাদীজা ﷺ। কিন্তু বিষয়টি অনুভব করতে পারলেও, তাঁদের কেউই তাঁকে এ-কথা বলতে

সাহস করছিলেন না। শেষমেশ খাওলা বিনতু হাকীম আস-সুলামিয়্যাহ[১] ﷺ এক সন্ধ্যায় রাসূলের ঘরে গিয়ে হাজির হলেন। দরদী ও কোমল স্বরে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, খাদীজাকে হারিয়ে আপনি কেমন যেন বিষণ্ণ, দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে গেছেন!'

নবীজি ﷺ বললেন, 'সত্যিই! সে তো আমার ঘর ও পরিবারের প্রধান ছিল!'

তাঁর জবাব শুনে খাওলা নিজেও যেন বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। তিনি উদাস চোখে তাকিয়ে রইলেন অজানা-অস্পষ্ট দূর অতীতের দিকে...

খানিক বাদে রাসূলের দিকে মুখ ফিরিয়েই তাঁকে বিয়ের পরামর্শ দিয়ে বসলেন খাওলা! নবীজি ﷺ তাঁর কথা শুনে মাথা নিচু করে চুপ রইলেন একটু; যেন হৃদয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিলেন তিনি; যেই হৃদয় হারানো-প্রিয়তমার স্মৃতিতে কাতর হয়ে আছে; যেই হৃদয়ের আরশিতে এখন ভেসে উঠেছে ২০ বছরেরও অধিক সময় আগের একটি ছবি—নাফিসা বিনতু মুনইয়া তাঁর কাছে এসেছেন; এবং তিনি তাঁকে প্রস্তাব করছেন খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদকে বিয়ে করার!

এরপর মাথা তুলে নবীজি কিছুটা বিষণ্ণ সুরে বললেন, 'খাদীজার পরে আর কাকে বিয়ে করব!'

খাওলা যেন এই প্রশ্নের অপেক্ষায়ই বসে ছিলেন। রাসূলের জবাবে তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন, 'আয়িশা আছে। সে (পুরুষদের মধ্যে) আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষের কন্যা।'[২]

প্রিয় মানুষটির কথা স্মরণ হতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন যেন কিছুটা খুশি হয়ে গেল। কারণ, সে-ই তো তাঁকে সত্যায়নকারী ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রথম পুরুষ। সে-ই তো ঈমানের প্রথম প্রহর থেকে আজ অবধি একজন ভাই, বন্ধু ও সঙ্গী হিসেবে জান ও মাল দিয়ে সর্বোচ্চ সহায়তা করেছে তাঁকে। সেই প্রিয়তম আবু বকরের সঙ্গে তাঁর মেয়ে আয়িশার কথাও স্মরণ করলেন তিনি—ওই যে মিষ্টি, কোমল মেয়েটি। বাচ্চাসুলভ আনন্দ, আর, কমনীয়তা দিয়ে যে প্রায়ই তাঁকে (রাসূলকে) মুগ্ধ করে। তাঁর মধ্যে জাগিয়ে

[১] *তারীখু তাবারী* : ০৩/১৭৫; *আস-সিমতুস সামীন* : ১০৩; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/১১৭।
[২] *তারীখু তাবারী* : ০৩/১৭৫।

তোলে পিতৃত্বসুলুভ সুখানুভূতি...

এতসব চিন্তা আর স্মৃতি রাসূলকে 'না' বলার সুযোগ দিল না। তিনি যেন 'না' বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেলেন। তাঁর যবান এই কথা উচ্চারণ করতে পারল না। তিনি কি আবু বকরের মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করবেন? আবু বকরের সুদীর্ঘ কালের সাথিত্ব এবং তাঁর নিজের কাছেই আবু বকরের যেই অবস্থান—সেসব স্মরণ করে তিনি 'না' বলতে তো পারলেনই না, বরং ওই অল্প বয়সী মেয়েটির প্রতি তাঁর মনে কেমন মায়া জেগে উঠল। মেধা আর লাবণ্যমাখা কমনীয়তায় যে এখনই জানান দিচ্ছে নিজের আলোঝলমলে আগামীর কথা...

তাই, রাসূল ﷺ বললেন, 'কিন্তু খাওলা, ও তো এখনও ছোট...'

খাওলা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আপনি এখন ওর বাবার কাছে প্রস্তাব দিয়ে রাখুন। এরপর ওর বয়স হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

নবীজি বললেন, 'ওর বয়স হওয়া পর্যন্ত? তাহলে, ঘর ও মেয়েদের দেখাশোনা কে করবে?'

আসলে, খাওলা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক 'বিলম্বিত স্ত্রী'র প্রস্তাব দিতে এসেছিলেন, যাঁর বয়স এখনও বাচ্চাকাল পার হয়নি? না, মোটেও এমনটা নয়। বরং খাওলার চিন্তায় ছিল দুজন হবু স্ত্রীর কথা, যাঁদের একজন হলেন কুমারী আয়িশা বিনতু আবী বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা; আর অপরজন হলেন বিধবা সাওদা বিনতু যামআ ইবনি কাইস ইবনি আবদি শামস আল-আমিরিয়্যাহ ؓ।[১]

আরও কথাবার্তার পরে রাসূল ﷺ খাওলাকে উভয় জনের জন্য প্রস্তাব দেওয়ার অনুমতি দিলেন। খাওলা তাই প্রথমেই গেলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ঘরে। এরপর পৌঁছুলেন যামআ'র ঘরে। সেখানে গিয়েই তিনি সাওদাকে পেয়ে গেলেন। বললেন, 'সাওদা, আল্লাহ যে তোমাকে কী কল্যাণ ও বরকতে ধন্য করছেন, জানো?'

সাওদা ؓ তো কিচ্ছু জানেন না, বললেন, 'কী হয়েছে, খাওলা?'

খাওলাও লুকোচুরি না-করে বলে ফেললেন, 'রাসূল ﷺ তো আমাকে তোমার

[১] বনু আমির ইবনি লুয়াইর মেয়ে ছিলেন তিনি। *নাসাবু কুরাইশ* : ৪৩১; *জামহারাতুল আনসাব* : ১৫৭।

জন্য তাঁর বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন!'

সাওদা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আবেগে, আনন্দে যেন নিজেকে ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল তাঁর জন্য। আপ্লুত গলায় তিনি বললেন, 'আমি প্রস্তুত! তুমি আমার বাবাকে গিয়ে বলো।'

খাওলা তখনই সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার বাবার কাছে গেলেন। তখনকার রীতিমুতাবিক বৃদ্ধকে সম্মান জানালেন। এরপর বললেন, 'আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি আবদিল মুত্তালিব আপনার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন।'

বৃদ্ধ তো আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন—'ওহ, কী চমৎকার ও উত্তম মেলবন্ধন! তা, সাওদার মত কী, জানো?'

'সে এতে রাজি।'

শুনে বৃদ্ধ ডেকে পাঠালেন সাওদাকে। সাওদা আসার পর বললেন, 'বেটি, মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে এটা খুবই সুন্দর এক বন্ধন হবে। তোমাকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলে তুমি কি রাজি?' সাওদা বললেন, 'জি, আমি রাজি।'[১] এরপরেই সাওদার বাবা যামআ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। খাওলাকে বললেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ঘরে দাওয়াত করার জন্য। খাওলা তো এরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি ছুটলেন রাসূলের শূন্য ঘর আবার জনকোলাহলে পূর্ণ করতে। আবার নবীগৃহকে প্রেমের গানে মুখরিত করার আয়োজনে ছুটলেন তিনি দ্রুত পদক্ষেপে...

বিপত্নীক মুহাজির মুহাম্মাদ ﷺ

পুরো মক্কায় খবর রটে গেল—মুহাম্মাদ সাওদা বিনতু যামআকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। মানুষেরা যেন নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না! সাওদার মতো বয়স্কা নারীকে বিয়ে করে কী লাভ! মানুষ একে অপরকে সংশয় নিয়ে জিজ্ঞেস করছিল—একজন বয়স্কা বিধবা নারী কি খাদীজার স্থলাভিষিক্ত হবে, যেই খাদীজাকে মুহাম্মাদ প্রস্তাব দিয়েছিলেন এমন এক মুহূর্তে, যখন

[১] *তারীখু তাবারী* : ০৩/১৭৬; *আস-সিমতুস সামীন* : ১০২।

খাদীজা ছিলেন কুরাইশের শ্রেষ্ঠ নারীদের অন্যতম এবং ছিলেন তখনকার কুরাইশনেতাদের আকাঙ্ক্ষার পাত্রী?

না, সাওদা বা অন্য কেউই কক্ষণও খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন না! তিনি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে আসলেও, সেটা তাঁর জবরদস্তিরই প্রকাশ হবে; কিবা, এটা তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যও হতে পারে; কারণ, তাঁর স্বামী—যে তাঁর চাচাতো ভাইও ছিল—সাকরান ইবনু আমর তাঁকে নিয়ে হাবশায় হিজরত করেছিলেন; সেখানে যাওয়ার পরে সাকরান ইন্তিকাল করেন; প্রবাসের কষ্টের মধ্যে সাওদা পড়ে যান স্বামী-হারানোর কষ্টসাগরে। দ্বীন বাঁচানোর জন্য নিজের মাটি, মানুষ ও পরিচিত জগত ছেড়ে অন্য অনেকের মতো স্বামীর সঙ্গে যেই সুদূর হাবশায় হিজরত করলেন সাওদা, সেই হাবশাতেই তিনি হারিয়ে ফেললেন জগতের সবচেয়ে নিকটতম মানুষটিকে...

রাসূল ﷺ সাওদার কথা ভেবেছেন গভীরভাবে; সাওদা তো এমন এক নারী, যিনি তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতিবিজড়িত ভূমি ছেড়ে এবং বার্ধক্যের বিশ্রামের মাটি ছেড়ে ঈমান বাঁচাতে বেরিয়ে পড়েছিলেন এমন এক অজানা দেশের পথে, যেখানকার মানুষের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারা তাঁর ভাষাভাষী ছিল না; এমনকি তাঁর ধর্মেরও ছিল না! এরপর, সেই অচেনা দেশ থেকে ফেরার আগেই না-ফেরার দেশে চলে গেছেন তাঁর স্বামী। মৃত্যু তাঁকে পরিবার ও নিকটজনদের কাছে এসে বিদায় নেওয়ার সুযোগটুকুও দেয়নি। সুযোগ দেয়নি তাঁকে পরপারে চলে যাওয়া আত্মীয়দের কবরসঙ্গ গ্রহণের জন্য মক্কায় এসে মরতে... [১]

সাওদার এসব অবস্থার কথা ভেবে তাঁর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে এতটা মায়া ও সমব্যথা জেগেছিল যে, খাওলা তাঁর কাছে সাওদার কথা বলামাত্রই তিনি সাওদার জন্য নিজের দরদী হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি

[১] সাকরানের মৃত্যু সম্পর্কে আসলে দুরকম বক্তব্যই পাওয়া যায়। কোথাও লেখা হয়েছে, যে, হাবশায় থাকাকালেই তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। আবার, কেউ বলেছেন—সাওদাকে নিয়ে তিনি মক্কায় ফেরত এসেছিলেন; কিন্তু মদীনায় হিজরতের আগেই ইন্তিকাল করেছেন। ইবনু আবদিল বার এই উভয় মত উল্লেখ করেছেন, *আল-ইসতীআব* : ০২/৬৮৫; ইবনু হাযম উল্লেখ করেছেন প্রথম মতটি, *আল-জামহারাহ* : ১৫৭; আর, ইবনু ইসহাক এনেছেন দ্বিতীয় মত, *আস-সীরাহ* : ০২/০৭।

চেয়েছেন—সাওদা এই পড়ন্ত জীবনে একটু সম্মানের ঠিকানায় থাকুক; জীবনের কষ্টস্মৃতি কিছুটা হলেও মুছে যাক তাঁর এখানে এসে।

আমার পাওনা রাতটি দিলাম আয়িশাকে

এরপর, একদিন সত্যিই সাওদা ﷺ রাসূলের স্ত্রী হয়ে গেলেন।[১] কিন্তু স্বামীর বিরাট বড়ত্ব ও মর্যাদার কারণে তাঁর মধ্যে একধরনের শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় ঢুকে গিয়েছিল। রাসূলের পাশে নিজেকে কল্পনা করতে ভয় ও আনন্দের যুগপৎ মিশ্র অনুভূতির শিকার হতেন তিনি। এমনকি, নিজেকে খাদীজার মতো মহীয়সী নারীর স্থলাভিষিক্ত ভাবতে; কিবা, প্রতীক্ষিত নববধূ আয়িশার সতীন ভাবতেও তাঁর সঙ্কোচ বোধ হতো। আবার, এমন শ্রেষ্ঠ মানুষদের সঙ্গ পাওয়ার আনন্দ ও বিস্ময়ানুভূতিতে মনে হতো তাঁর ছোট্ট পৃথিবীটা বুঝি অনেক বড় হয়ে গেছে!

সাওদার মন কখনও তাঁকে ধোঁকায় ফেলতে পারেনি; বরং তিনি তাঁর বয়স ও অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পেরেছিলেন, যে, তাঁর ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ের মাঝে এমন একটা আড়াল আছে, যা একেবারে সরিয়ে ফেলার কোনো উপায় নেই। স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত থেকেই তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, যে, তাঁকে যেই 'রাসূল' বিয়ে করেছেন, তিনি এমন কোনো 'পুরুষ' নন, যাঁর নবুওয়াত তাঁকে মানবিক গুণাবলি থেকে একেবারে মুক্ত করে ফেলেছে। ফলে, তাঁর সঙ্গে রাসূলের সম্পর্ক যে মূলত দয়া ও রহমের—তা দ্বিধাহীনভাবে বুঝে ফেলতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি তাঁর।

কিন্তু এই সত্য-অনুধাবন তাঁকে দুঃখী, বা, বিদ্রোহী ও অভিমানী বানিয়ে ফেলেনি; বরং তিনি বিষয়টিকে এইভাবে চিন্তা না-করে অন্যভাবে চিন্তা করেছেন। তাঁর মন কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়েছে এ-জন্য, যে, রাসূল ﷺ তাঁকে সাকরানের 'বিধবা স্ত্রী' থেকে 'উম্মুল মুমিনীন'-এর মহান মর্যাদাপূর্ণ উচ্চাসনে আসীন করেছেন। অথচ সেখানে আসীন হওয়ার কী যোগ্যতা ছিল তাঁর! রাসূলের ঘরকে নিজের ঠিকানা বানাতে পেরে এবং তাঁর মেয়েদের সেবা করতে পেরে সাওদার আনন্দের

[১] মুহাব্বারে (৮০) আছে, যে, সাকরানের মৃত্যুর আগে সাওদা একটি স্বপ্ন দেখে সাকরানকে জানান; সাকরান তখন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় নিজের দ্রুত মৃত্যু এবং এরপরেই রাসূলের সঙ্গে সাওদার বিয়ের কথা বলেন। এই ব্যাখ্যা ছিল সাওদার জন্য বড় কষ্টের। কিন্তু সত্যিই অল্প ক'দিন পরে সাকরান ইন্তিকাল করেন এবং সাওদাও স্ত্রী হয়ে আগমন করেন রাসূলের ঘরে।

শেষ ছিল না।

সাওদা একটু মোটা ছিলেন। তাঁর হাঁটা দেখে নবীজি ﷺ কখনো হাসলে, কিবা, তাঁর কোনো কথা-কাজ নবীজি পছন্দ করলে নিজেকে বড় সৌভাগ্যবান মনে করতেন তিনি।

একবার তিনি নবীজিকে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, রাতে আপনার পেছনে সালাতে দাঁড়িয়েছিলাম; রুকুতে যাওয়ার পর আপনি এতটা সময় নিচ্ছিলেন, যে, রক্ত পড়ার ভয়ে আমি নিজের নাক চেপে ধরেছিলাম।' [১]

তাঁর কথা শুনে নবীজি হেসে ফেললেন।

সাওদার মধ্যে একধরনের সরলতা কাজ করত সবসময়। ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন—বদরযুদ্ধের পরে বন্দীদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে মদীনায়। সাওদা ﵂ তখন আফরা-পরিবারের ঘরে। তাঁদের দুই পুত্র আওফ ও মুআউইযের শোক-সমবেদনা জানাতে গিয়েছেন। তখনও উম্মুল মুমিনীনদের ওপর পর্দা ফরয হয়নি। তো, পরবর্তী ঘটনা সাওদার নিজের বর্ণনাতেই শুনুন—

সাওদা বলেন, 'বদরের বন্দীদেরকে নিয়ে আসার ঘোষণা শুনে আমি ওই বাড়ি থেকে নিজের ঘরে ফিরে আসি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তখন ঘরেই ছিলেন। আমি দেখলাম—ঘরের এক কোণে আমার দেবর সুহাইল ইবনু আমর (প্রাক্তন স্বামী সাকরান ইবনু আমরের ভাই) বসে আছে। তার দুহাত রশি দিয়ে গলার সাথে বাঁধা। আল্লাহর কসম! তার এই অবস্থা দেখে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। আমি বলে ফেললাম—"ও আবু ইয়াযীদ! এমন লাঞ্ছিত হয়ে হাত বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছ যে? সসম্মানে মৃত্যুবরণের সুযোগ কি পাওনি?" স্বামীর ভাইকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে আমার আসলে হুঁশ ছিল না। কিন্তু নবীজি যখন ঘরের আরেক কোণ থেকে বলে উঠলেন—"সাওদা, তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে তাকে উদ্দীপ্ত করছ?", তখন আমার হুঁশ ফিরেছে। আমি তখন জবাব দিলাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমি আসলে আবু ইয়াযীদকে হাত-বাঁধা পড়ে থাকতে দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি, ফলে, অযাচিত ও অনুচিত

---

[১] *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৮৬৭; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/১১৮।

কথা বলে ফেলেছি।"'[১]

নবীর ঘরে সাওদা যাপন করতে লাগলেন জীবনের অন্যতম সোনালি সময়গুলো। এভাবে একদিন তাঁর সতীন-সঙ্গে হাজির হলেন আয়িশা বিনতু আবী বকর ﵂। সাওদা তখন নববধূর জন্য ঘরের প্রথম কামরাটি ছেড়ে দিলেন এবং মনে মনে তাঁর খুশি ও আনন্দের জন্য নিজে কষ্ট করার মানসিকতা পোক্ত করলেন।

এরপর তো দিনে দিনে আরও অনেক স্ত্রীই ঘরে এসেছেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন হাফসা বিনতু উমর, যাইনাব বিনতু জাহশ ও উম্মু সালামা বিনতু আবী উমাইয়া আল-মাখযূমী। তো, ভালোবেসে ও সাফ মনেই আয়িশাকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন সাওদা; এবং এতে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। অবশ্য, অন্য সতীনদের সঙ্গেও কখনো কোনো রূঢ় আচরণ করেননি তিনি—যাঁদের প্রত্যেকেই রাসূলের আদর-ভালোবাসা একান্ত নিজের করে পেতে চাইতেন।

আবার, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ভালোবাসার বঞ্চনা দিতে চাইতেন না। তাঁর মনে এই ভাবনা আসবে, যে, তিনি অন্যদের মতো ভালোবাসার পাত্রী নন—এমন পরিবেশ হয়ে যাওয়াকে রাসূল অপছন্দ করতেন; বরং তিনি তাঁকেও হৃদয় খুলে ভালোবাসা দিতে চাইতেন; কিন্তু রাসূলের মানবিক সীমাবদ্ধতা তাঁকে সেই ইচ্ছা পূরণ থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই, তাঁর সাধ্যাধীন সর্বোচ্চ কাজ এটুকুই ছিল, যে, তিনি সাওদা ও অন্যদের মাঝে রাত্রিযাপন, আর, খরচাদি সমান সমান রাখতে পারেন। তিনি সেটাই করেছিলেন। কিন্তু আবেগ ও ভালোবাসা? মানুষ বলেই এটার বেলায় তাঁর সাধ্য ছিল না, যে, অনাগ্রহের কাউকেও ভালোবাসা দেবেন; কিবা, ভালোবাসায়ও দাঁড় করাবেন ইনসাফ নামের কোনো পাল্লা!

অবশেষে রাসূলের মনে হলো, যে, সাওদাকে এভাবে ভালোবাসাহীন রেখে দিয়ে, শুধু শুধু কষ্ট দেওয়া, তাঁর মনে ব্যথা দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। এরচেয়ে বরং তাঁকে সুন্দর পন্থায় বন্ধনমুক্ত করে তালাক দিয়ে দেওয়াই উত্তম। তো, নবীজি সাওদার পালায় থাকা রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর সেই রাতে যখন তাঁর কাছে গেলেন, তখন তাঁকে খুব কোমলভাবে নিজের তালাকের ইচ্ছা জানালেন। রাসূলের কথা শুনে তো সাওদার পুরো শরীর অবশ হয়ে গেল। তাঁর

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/২৯৯।

মনে হচ্ছিল, যে, বুকের ওপর এখনই ঘরের দেয়াল ভেঙে পড়বে; আর, তিনি তা সামলাতে না-পেরে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবেন। অনেক কষ্টে রাসূলের দিকে মাথা তুলে তাকালেন তিনি। তাঁর সেই চাউনি ছিল বড় করুণ। নীরব-নিস্তব্ধ তিনি রাসূলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর, সাহায্য চাওয়ার ভঙ্গিতে হাত বাড়ালেন। রাসূলও দরদ ও মায়ার হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর মনেও তখন এই চিন্তাই বিরাজ করছিল, যে, এই মুহূর্তে সাওদা যেই মানসিক চাপে অসহায় হয়ে পড়েছেন, যেকোনোভাবে যদি তাঁর থেকে তা দূর করে দেওয়া যেত!

রাসূলের হাতে হাত রেখে যেন সাওদা একটু স্থির হতে পারলেন। একটু শ্বাস নিয়ে মিনতিভরা গলায় বললেন, 'অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাকে রেখে দিন। আল্লাহর কসম! স্বামীর হকপ্রাপ্তির কোনো আগ্রহ আমার নেই। কিন্তু আমার বড় আকাঙ্ক্ষা—কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সামনে যেন আপনার স্ত্রী হিসেবে উঠতে পারি!'[১]

এইটুকু বলে চিন্তাক্লিষ্ট মুখটি আবার নত হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর অপছন্দের ব্যাপারে জবরদস্তি করতে খুব কষ্ট হচ্ছিল সাওদার। রাসূলের ইচ্ছার আহ্বানে সাড়া না-দিতে তাঁর খারাপ লাগছিল। বার্ধক্যের জরা যে দুর্বল শরীরটিকে আরও কাবু করে ফেলেছে, এটা সাওদা ঠিকই বুঝতে পারছিলেন, আর, এমতাবস্থায়ও স্বামীকে আঁকড়ে ধরে রাখতে তাঁর লজ্জা হচ্ছিল, যাঁর ভালোবাসা পেতে আয়িশা, যাইনাব, উম্মু সালামা ও হাফসা বিনতু উমরের মতো শ্রেষ্ঠ রমণীরা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করছেন। এঁদের মধ্যে নিজের অবস্থানকে বড় বেমানান লাগছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল, এঁদের সমান হকদার সেজে একটি রাত রাসূলকে নিজের কাছে রাখা মানে, নিজের অপ্রাপ্য কিছু দখল করে রাখা! ভাবতে ভাবতে লজ্জা ও সঙ্কোচে তিনি যেন বলেই ফেলছিলেন, যে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে তালাক দিয়েই দিন তাহলে!' কিন্তু গলায় যেন কথা আটকে গেছে। কোনো শব্দই উচ্চারণ করতে পারলেন না তিনি।

---

[১] *আল-ইসাবাহ* : ০৮/১১৭; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৮৬৭; *উয়ূনুল আসার* : ০২/৩০০। মুহাব্বার (৮০) ও *আল-ইসাবাহ*'য় আরেকটি বর্ণনা এসেছে, যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজনকে দিয়ে সাওদার কাছে তালাকের খবর পাঠান; তখন সাওদা মিনতি করে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে বলেন; এবং নিজের পালার দিনটি আয়িশার জন্য ছেড়ে দেন।

খুব কষ্ট হতে লাগল সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার। চিন্তায় পুরো দেহ হিম হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর পাশে বসে তাঁর দিকে মায়াভরা চোখে তাকিয়ে আছেন। আরও কিছু সময় কেটে গেল। হঠাৎ একটি চিন্তা ঝিলিক দিল মাথায়। মন খুশি হয়ে গেল তাঁর। শান্ত, নরম স্বরে তিনি নবীজিকে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে রাখুন। আমি আমার পালার রাতটি আয়িশাকে দিয়ে দিচ্ছি এবং আপনার কাছ থেকে স্ত্রীর একান্ত হকের দাবি প্রত্যাহার করছি।'[১]

তাঁর এই কথায় রাসূল ﷺ খুবই বিস্মিত হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন—তাকে আমি নারী জাতির সবচেয়ে অপছন্দের বিষয়—তালাকের কথা শোনাতে এসেছি, আর, সে আমাকে কী অনন্য ঔদার্যের কথা শোনাচ্ছে! চাওয়া শুধু এটুকুই—আমার সন্তুষ্টি!

রাতের আঁধার কেটে গেল। সাওদার প্রিয় রাসূল ও স্বামী মুহাম্মাদ ﷺ ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন। আর, সাওদা? তিনি তো তখন আনন্দে উদ্বেল। রাসূলের প্রতি ঈমান ও সন্তোষপূর্ণ হৃদয়ে তিনিও সালাতে দাঁড়ালেন...

সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা বড় খোশ ও নির্ভার মনে সালাতে মগ্ন হলেন। রবের প্রতি শোকর ও কৃতজ্ঞতায় শির নুয়ে আসছিল তাঁর—আহ, মহিয়ান রব আমার, এমন সুন্দর একটি সমাধান মনে না-করিয়ে দিলে তো শ্রেষ্ঠ মানবের সংস্পর্শ হারাতে হতো আমাকে!

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সবসময়েই সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার সেই মহানুভবতার কথা মানুষকে বলতেন। এবং এর উত্তম প্রতিদানের চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন—'সাওদা বিনতু যামআ ব্যতীত অন্য কোনো নারীর খোলসে আমি থাকতে চাই না; কারণ, তিনিই তো বলেছিলেন—"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার কাছে পাওনা রাতটি আয়িশার জন্য দিয়ে দিলাম।"'[২]

এরপর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ সময় অবধি তাঁর ঘরেই

---

[১] *আল-ইসাবাহ* : ০৮/১৮৬৭; *আস-সিমতুস সামীন* : ১০৩।

[২] মুসলিম : ১৪৬৩; *আল-ইসাবাহ* ও *আল-ইসতীআবে* সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনী অধ্যায়েও এই আলোচনা আছে।

বাস করেছেন সাওদা ﵂। হযরত উমরের খিলাফাতের শেষদিকে[১] তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত সেই 'উম্মুল মুমিনীন' উপাধি ধারণ-অবস্থায়ই মাটির দুনিয়া ছেড়ে প্রিয়তমের সান্নিধ্যে পাড়ি জমান। রাদিয়াল্লাহু আনহা।

[১] উয়ূনুল আসার : ০২/৩০১; আল-ইসাবাহ ও আল-ইসতীআবেও আছে।

নবীজির প্রেমগোলাপ

আয়িশা সিদ্দীকা বিনতু আবী বকর আস-সিদ্দীক

আমর ইবনুল আস ﵁ বলেন, 'আমি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?"

'তিনি বললেন, "আয়িশা।"

'আমি বললাম, "পুরুষদের মধ্যে কে?"

'তিনি বললেন, "আয়িশার বাবা।"

'আমি বললাম, "তারপর?"

'তিনি বললেন, "উমর।"'

[বুখারী, মুসলিম]

সুমহান মর্যাদার ধারক যে জামাতা

'আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ করেছে আবু বকর। তার সম্পদ ও সঙ্গদানে। আমি (দুনিয়ার) কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু এখন তো ইসলামের ভ্রাতৃত্বই আছে।'

—হাদীসে নববী। সহীহ মুসলিম।

খাওলা বিনতু হাকীম আস-সুলামিয়্যাহ ﵂। একজন বিশিষ্ট নারী-সাহাবী। তিনি হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকালের পর হঠাৎ একদিন হাজির হলেন

প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে। রাসূল—ত্রিভুবনের সব সৌন্দর্য আর ভালোবাসার আধার হয়ে যিনি বিরাজ করছেন এই ধূলির ধরায়; আসমানের ইশারায় যাঁর নামকরণ করা হয়েছিল আরবের তুলনাহীন এক নামে—মুহাম্মাদ; সকলজনের প্রশংসায় সিক্ত ও আপ্লুত এক মহান সত্তা।

একমাত্র প্রিয়তমাকে হারিয়ে রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ পার করছিলেন তখন ভালোবাসার কোমল-মায়াহীন দিন-রাত। সেই সময়টাতেই তাঁর দরবারে খাওলা এলেন। তারপর বড় আশা আর আবেগ নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন বিয়ের কথা। একপর্যায়ে অকল্পনীয়ভাবে বললেন—'আল্লাহর রাসূল! কোনো কুমারী মেয়েকে চাইলে আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির কন্যা আয়িশাকে বিয়ে করুন।'

তাঁর কথা শুনে রাসূলের মনের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ল বেহেশতী সুবাসমাখা একটি গোলাপের সৌরভ। আবেগের আকাশে জমে থাকা স্মৃতিরা যেন রিমঝিম করে নেমে এল তাঁর মনের মাটিতে। তিনি ভাবতে লাগলেন—সত্যিই তো, সেই কোমল শৈশব থেকে আজকের পিচ্ছিল পথচলা-অবধি প্রতিটি পদক্ষেপে যার সঙ্গ ও ভালোবাসা আমি গ্রহণ করেছি, এই বিয়ে হতে পারে সেই প্রিয়তম আবু বকর ও আমার সম্পর্কের এক সুদৃঢ় সোনালি বাঁধন।

তিনি সম্মতি দিলেন। খাওলার চিন্তিত মুখমণ্ডলে ঝিলিক দিল তাবাসসুম। খুশির হাওয়া তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে চলল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ঘরের দিকে।

এরপর কী ঘটল? পাঠক, ইমাম তাবারী'র কলমে উঠে এসেছে[১] খাওলার সেই অত্যুচ্চ আনন্দভরা বিয়ে-প্রচেষ্টার বয়ান। খাওলা বলেন—

'আবু বকরের ঘরে পা রাখতেই আমি আয়িশার মা উম্মু রূমানকে দেখলাম। বললাম, "উম্মু রূমান, কী মহাবরকত ও কল্যাণের ভাগিদার আপনাদেরকে বানাচ্ছেন আল্লাহ—জানেন?"

'"না তো! কী হয়েছে, বলবে?"

'"রাসূল ﷺ আমাকে আয়িশার জন্য প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন।"

'"সুবহানাল্লাহ, তাই? আচ্ছা, আবু বকর এখুনি আসবেন, একটু অপেক্ষা করো।"

[১] *তারীখু তাবারী* : ০৩/১৭৬; *আস-সিমতুস সামীন* : ৩১।

'আবু বকর আসতেই আমি তাঁকে বললাম, "জনাব, কী মহাবরকত আর কল্যাণ আপনাদের দুয়ারে হাজির! রাসূল ﷺ আমাকে আয়িশার জন্য প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন।" শুনে আবু বকর বললেন, "আয়িশা কি রাসূলের জন্য বৈধ হবে? ও তো তাঁর ভাতিজি।"

'এই শুনে আমি রাসূলের নিকটে গিয়ে ঘটনা বললাম।

'তিনি বললেন, "তাঁকে গিয়ে বোলো, আমাদের ভ্রাতৃত্ব তো দ্বীন-ইসলামের, বিয়ের ক্ষেত্রে এটা বাধা হবে না।" ফিরে এসে আবু বকরকে আমি সেই কথা শোনালাম। তিনি বললেন, "একটু বসো, আমি আসছি।"

'আবু বকর বেরিয়ে যাওয়ার পর উম্মু রূমান আমাকে বললেন, "আসলে, মুতইম ইবনু আদী তার ছেলে জুবাইরের জন্য আয়িশার প্রস্তাব দিয়ে রেখেছিল। আর, আবু বকর তো কখনোই ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। এ-জন্যই তিনি তোমাকে বসিয়ে রেখে ওদের কাছে গিয়েছেন।"'

এদিকে আবু বকর গিয়ে দেখলেন, মুতইম ও তার মুশরিক স্ত্রী উম্মু জুবাইর একসঙ্গে বসে আছে। তাকে দেখেই বুড়িটা বলে উঠল, 'ও আবু কুহাফার ছেলে (আবু বকর), আমাদের ছেলেকে তোমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে তুমি যদি ওকে নিজের ধর্মে নিয়ে যাও![১] (সুতরাং ওদের বিয়েটা হবে না)।'

আবু বকর বুড়ির জবাব না-দিয়ে মুতইমের দিকে ফিরে বললেন, 'এটা কী বলছে তোমার স্ত্রী?' মুতইম বলল, 'যা শুনছ, তা-ই বলছে।'

এই জবাব শোনামাত্রই আবু বকর সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মনে খুশির গীত বেজে উঠল—'আহ, রব, তুমি আমাকে ওয়াদা-ভঙ্গ করা থেকে বাঁচিয়েছ।, ঘরে এসেই খাওলাকে বললেন, 'যাও, নবীজিকে আমার ঘরে দাওয়াত করো।' তাঁর কথা শুনে খাওলার তো আর আনন্দ ধরে না। তক্ষুণি গিয়ে নবীজিকে নিয়ে এলেন।

এরপর?

আহা, এরপর হযরত আবু বকরের ছোট্ট ঘরটির প্রতিটি ধুলিকণাও যেন আনন্দের হল্লা করে উঠল। আসমানী খোশ-আমদেদের সুমধুর সুর যেন ছড়িয়ে

[১] *আস-সিমতুস সামীন* : ৩১।

পড়ল উপস্থিত প্রতিটি সদস্যের হৃদয়-গহনে। যেন বেহেশতেরও ঈর্ষা হলো এই দৃশ্যের প্রতি। কারণ, বেহেশত তো পায় নি আজও এমন অপূর্ব সৌন্দর্যভরা আয়োজন। মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠতম আরেকটি ভালোবাসার গল্প শুরু হলো খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। নবীজি ﷺ তাঁর এতদিনকার প্রিয়তমের ঘরেই পেয়ে গেলেন বাকি জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রিয়তমা—আয়িশা সিদ্দীকা।

রাসূলের সঙ্গে বিয়ে হলো হযরত আয়িশার। ছয় কি সাত বছরের এক বালিকা। বিয়ের মহর ধরা হলো পাঁচ শ' দিরহাম।

ইতিহাসে হযরত আয়িশার বিয়ে-সম্পর্কিত তথ্য মোটামুটি এটুকুই। বিশেষত, তিনি ছয় কি সাত বছরের বালিকা ছিলেন; এবং তাঁকে বিয়ের জন্য জুবাইর ইবনু মুতইমের প্রস্তাব ছিল।

হযরত আয়িশার পিতার বংশ-পরম্পরা এমন—আবু বকর ইবনু আবী কুহাফা ইবনি আমির ইবনি আমর ইবনি কা'ব ইবনি সাদ ইবনি তাইম ইবনি মুররাহ।

অপরদিকে, তাঁর মায়ের বংশ-পরম্পরা হলো—উম্মু রূমান বিনতু উমাইর ইবনি আমির ইবনিল হারিস ইবনি গানাম ইবনি কিনানা।[১]

ভদ্রতা, বীরত্ব, আমানত রক্ষা ও সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হযরত আয়িশার গোত্র—বনু তাইম—বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। নারীদের সঙ্গে কোমল ও সৌন্দর্যপূর্ণ সদাচারেও তারা ছিল প্রবাদতুল্য। আয়িশার পিতা আবু বকর ؓ বংশীয় সেই পবিত্র ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ ধারক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের কাছে নম্রতা, কোমলতা ও সর্বোত্তম আচরণে খ্যাতি পেয়েছিলেন।[২]

ইসলামের ইতিহাসবিদগণ এ-বিষয়ে একমত, যে, আয়িশার পিতা আবু বকর ছিলেন কুরাইশের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। কুরাইশ বংশ এবং বংশের ভালো-মন্দ—সব ধরনের মানুষ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত ছিলেন। একজন সদাচারী ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সঙ্গীদের প্রতি উত্তমাচারের মতো নানা

---

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/২৯৩; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১৭৭; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৮৮১; *উয়ূনুল আসার* ০২/৩০০। মুতইম ইবনু আদী বদরযুদ্ধের আগেই মক্কায় মারা গেছে মুশরিক অবস্থায়। তবে, জুবাইর ও তাঁর মা উম্মু জামীল বিনতু সায়ীদ আল-আমিরিয়্যাহ মক্কাবিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন।

[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/২৬৭; 'মানাকিবু আবী বকর' অধ্যায়, বুখারী; 'ফাযাইলু আবী বকর' অধ্যায়, মুসলিম।

কারণে বংশের লোকেরা তাঁর কাছে আসতে পছন্দ করত।

নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর এই আবু বকর নিজের এতসব মুগ্ধকর গুণ ও সুখ্যাতির সঙ্গে আরেকটি হীরকখণ্ড যুক্ত করতে পারার মহাসৌভাগ্য লাভ করেন—ইসলামের মহাদৌলত (স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে) তিনিই সর্বাগ্রে লুফে নেন। এরপর থেকে তিনি সর্বাত্মকভাবে ইসলামের পক্ষে অবতীর্ণ হন। এবং বীরত্ব, সাহসিকতা ও সতর্কতার সঙ্গে ইসলামী আলোর বাণী পৌঁছে দিতে থাকেন একেকটি আঁধার-নিমজ্জিত ঘরে। ফলে, তাঁর দরদমাখা আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামের আলোর তরীতে আশ্রয় নেন অনেক গণ্যমান্য কুরাইশ-ব্যক্তিত্ব। যেমন—উসমান ইবনু আফফান, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনু আওফ, সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ও তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ প্রমুখ। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। এঁদের সকলেই কিন্তু পরবর্তীকালে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

নবীজি ﷺ বলেছেন, 'আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, সে-ই কিছুটা হলেও দ্বিধা, সঙ্কোচ ও চিন্তাভাবনায় পড়েছে; কিন্তু আবু কুহাফার ছেলে আবু বকরকে আমি দাওয়াত দেওয়ার পর সে বিন্দুমাত্র সময়ক্ষেপণ, বা, চিন্তাভাবনা করেনি।' আরেকবার তিনি বলেছেন, 'আবু বকরের সম্পদ আমাদের যেই উপকার করেছে, তেমন উপকার আর কারও সম্পদই করেনি।' হাদীসে এসেছে—রাসূলের এই কথা শুনে হযরত আবু বকরের চোখে পানি এসে যায়; তিনি বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ও আমার সমস্ত সম্পদ কি আপনার জন্য উৎসর্গিত নয়?'[১]

তো, পাঠক, এই হলেন হযরত আয়িশার পিতা আবু বকর ইবনু আবী কুহাফা। চলুন, এবার তাঁর মায়ের সম্পর্কে কিছু জানা যাক।

হযরত আয়িশার মা হলেন উম্মু রূমান বিনতু আমির আল-কিনানিয়্যাহ।[২] নারী-সাহাবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ইসলামপূর্ব সময়ে তিনি আবদুল্লাহ

[১] প্রাগুক্ত।

[২] তিনি মালিক ইবনু কিনানার বংশধর হওয়া নিয়ে ঐতিহাসিকদের কোনো বিরোধ নেই। তাঁর বাবা থেকে নিয়ে কিনানা পর্যন্ত বংশধারা নিয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। দেখুন—*আল-ইসতীআব* : ০৪/১৯৩৬; *নাসাবু কুরাইশ* : ২৭৬; *জামহারাতু আনসাবিল আরব* : ১২৭; *উয়ূনুল আসার* : ০২/৩০০; *তাহযীবুত তাহযীব* : ১২/৪৩৩।

ইবনুল হারিস আল-আসাদীকে বিয়ে করেন। সেখানে তুফাইল নামে তাঁর একটি ছেলে জন্ম নেয়। এরপর হযরত আবু বকরের সঙ্গে বিয়ে হয়। এবারে তিনি মা হন আরও দুজন সন্তানের—আয়িশা ও আবদুর রহমান। নবীজি হযরত আবু বকরকে নিয়ে মদীনায় পৌঁছে সবকিছু ঠিকঠাক করার পর উম্মু রূমান মদীনায় হিজরত করেন। ইফকের ঘটনার পরে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবৎকালেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁকে কবরে রাখার সময় নবীজি তাঁর কবরে নেমে বলেন, 'আল্লাহ, উম্মু রূমান তোমার জন্য আর তোমার রাসূলের জন্য যা কিছু সয়েছেন, তা যেন তোমার কাছে হালকা ও তুচ্ছ না-হয়ে যায়।'

একবার নবীজি বলেছিলেন—'আনতনয়না কোনো হুর কেউ দেখতে চাইলে, উম্মু রূমানকে দেখুক।' [১]

সুবহানাল্লাহ! রব ও তাঁর রাসূলের নিকটে কী অসামান্য প্রিয় দুজন মা-বাবা। এমন মা-বাবাই শ্রেষ্ঠ নবীকে একজন শ্রেষ্ঠ প্রিয়তমা উপহার দিতে পারবেন, এ-ই কি স্বাভাবিক নয়?

বড় কাঙ্ক্ষিত ছিল এই বন্ধন

আয়িশা। একজন শ্রেষ্ঠ কুরাইশ-বাবার কন্যা। বরং সমগ্র মক্কার নির্দ্বিধ শ্রদ্ধা যাঁদের তরে নিবেদিত, তাঁদের মধ্যে অন্যতম মানুষটির কলিজার টুকরো আয়িশা। আসলে, আয়িশার বাবার পরিচয় তো শুধু এটুকুই নয়, তাঁর বাবা হলেন শ্রেষ্ঠ মহামানবের সবচেয়ে প্রিয়তম সঙ্গী—জীবন ও মহাজীবনের সর্বক্ষেত্রে যিনি রাসূলে আরাবীর একান্ত সহচর। এমনকি, নাদান মুশরিকদের 'মৃত্যু-তীর' যখন গারে সাওরের মুখ অবধি পৌঁছে গিয়েছিল, তখনও আয়িশার বাবা আবু বকর ছিলেন রাসূলের সঙ্গে। রাসূলের জীবনশঙ্কায় তিনি শশব্যস্ত ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। আর, ঈমান ও তাকওয়ার সর্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে রাসূল তাঁকে বলেছিলেন—'লা তাহযান, ইন্নাল্লাহা মাআনা।'

তো, এমন মহান বাবার শাহযাদী যে আয়িশা—তাঁকে তো বাবার হৃদয়-সিংহাসন থেকে নিয়ে স্থান দিতে হবে আরও সুউচ্চ-সুরম্য কোনো প্রাসাদে; আদরের

[১] *তাবাকাতু ইবনি সাদ*, *আল-ইসাবাহ* ও *আল-ইসতীআব* প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর জীবনী সম্পর্কীয় অধ্যায়টি দেখা যেতে পারে। ইফকের ঘটনার পরে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে বলে সবাই মত দিয়েছেন, কিন্তু ঠিক সনটি তাঁরা নির্দিষ্ট করতে পারেননি।

দুলালীকে যেখানে দেখতে পেয়ে বাবার হৃদয়-অলিন্দে ছড়িয়ে পড়বে অনন্ত সুখের নরম-কোমল আলো।

কিন্তু আয়িশা কি শুধুই এক মহান বাবার কন্যা ছিলেন? না, বরং তাঁর সৌন্দর্য ছিল জাদুমাখা। দীপ্তিমান মেধা ও দুরন্ত-সবুজ শৈশবের ঐশ্বর্যকে ধারণ করতেন এই অসাধারণ বালিকা আয়িশা সিদ্দীকা।

মক্কার আকাশে ইসলামের সূর্য উদয়ের চতুর্থ কি পঞ্চম বছরে তাঁর জন্ম। খুব কম বয়সেই তিনি ও তাঁর বোন আসমা ইসলামের আলোকিত আঙিনায় পা রাখেন। মুসলিমদের সংখ্যাও ছিল তখন খুবই নগণ্য।

দুনিয়ার বুকে চোখ মেলার পর থেকে রাত-দিনের দোলনায় চড়ে চড়ে যখন ফুলকলির মতো ফুটছিলেন আয়িশা, তখন থেকেই তাঁকে চেনেন প্রিয় রাসূল ﷺ—জগতের সমস্ত শিশুর প্রতি যাঁর মায়া আর ভালোবাসা আজও অতুলনীয়, অদ্বিতীয়। রাসূলের দৃষ্টিসীমার মধ্যেই বেড়ে ওঠেন আয়িশা। তাঁর শৈশবের সুকুমারবৃত্তির বিকাশ, অসাধারণ বাকপটুতা, ভাষার মাধুর্য ও বিশুদ্ধতা, আর, সাহসী মনের কার্যকলাপ দেখে দেখে তো মুগ্ধতায় হারাতেন রাসূল। তাঁর প্রতি রাসূলের মায়া বোঝা যায়, তাঁর মাকে দেওয়া রাসূলের উপদেশ থেকে। রাসূল বলেছেন—'ও উম্মু রূমান, (সবসময়) আয়িশার জন্য তা-ই কামনা করুন, যা তার জন্য ভালো; আর, তাঁর সঙ্গে আচরণের বেলায় আমার উপদেশ স্মরণ রাখবেন।' একদিন নবীজি উম্মু রূমানকে দেখলেন, যে, আয়িশার প্রতি রেগে গেছেন। নবীজি কাছে গিয়ে, মৃদু কঠোর স্বরে বললেন, 'আমি কি আপনাকে আয়িশার বেলায় আমার উপদেশ মেনে চলতে বলিনি?'

দুই শ্রেষ্ঠ বন্ধুর পরিবার বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের সম্পর্কের খুঁটি আরও মজবুত করছেন—এমন খবরে মক্কাবাসীর মধ্যে কোনো বিচলন, বা, অবাক হওয়ার ঘটনা কিন্তু ঘটেনি; বরং তারা একে একটি স্বাভাবিক, প্রার্থিত ও কাঙ্ক্ষিত বিষয় হিসেবেই স্বাগত জানিয়েছে। ইসলামের কোনো শত্রুর চোখে এ-নিয়ে রা করার সুযোগও ধরা পড়েনি। নবীজিকে কটূক্তির কোনো পথই যারা ছাড়েনি; মিথ্যা, অপবাদ ও বানোয়াটি—সর্বউপায়ে যারা তাঁর ওপর হামলা করেছে; তারা তাঁর সঙ্গে হযরত আয়িশার বিয়ের ক্ষেত্রে সামান্য ছিদ্রপথও খুঁজে পায়নি দোষ ধরার, বা, কোনো কুৎসা রটানোর।

আসলে, তাদের বলার মতো ছিলই-বা কী! তারা কি আয়িশার মতো একটি নিতান্তই কমবয়েসী বালিকার বিয়ে-প্রস্তাবকে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারত—জীবনের সপ্তম বসন্তটিও যে এখনও পেরোয়নি?

নাহ, এটার কোনো সম্ভাবনা, বা, কল্পনাও ছিল না; কারণ, এর আগে জুবাইর ইবনু মুতইমও তো আয়িশাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে রেখেছিল; যার ফলে আবু বকরও প্রথম দফায় খাওলাকে কথা দিতে পারছিলেন না; বরং মুতইমের ঘর থেকে তাকে ব্যাপারটি সাফ করে আনতে হয়েছিল।

কিবা, একটি মেয়েশিশুর সঙ্গে ৫৩ বছর বয়সী একজন প্রায়-প্রৌঢ় ব্যক্তির বিয়ের বিরুদ্ধে কি মক্কাবাসী কোনো আপত্তি করতে পারত?

না, এ-ঘটনাও তাদের জন্য আশ্চর্যজনক কিছু ছিল না; এবং সেখানকার পরিবেশ-প্রকৃতিতে আয়িশাই এমন প্রথম বালিকা ছিলেন না, যার বিয়ে হয়েছে বাবার বয়সী কারও সঙ্গে; বরং এমন বালিকার সংখ্যা অনেক। এই যেমন—আবদুল মুত্তালিবের সবচেয়ে ছোট ছেলে আবদুল্লাহ যেদিন মুহতারামা আমীনাকে বিয়ে করেন, সেদিনই বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিব বিয়ে করেন আমীনার সমবয়সী চাচাতো বোন হালা'কে। পরবর্তী সময়েও এমন দৃষ্টান্ত আছে। যেমন—হযরত উমর ﵁ বিয়ে করেছেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মেয়েকে; অথচ মেয়েটির পিতার চেয়েও বেশি বয়সী ছিলেন উমর। আবার, উমর নিজের যুবতী কন্যা হাফসা'র বিয়ের প্রস্তাব করেছেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে; অথচ হাফসা আর আবু বকরের মাঝে নবীজি ও আয়িশা'র মতো ফারাক।

মোটকথা, সেই সময় ও পরিবেশে অমন বিয়ে কোনো অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু তেরো শ' বছর পরে এসে কতক প্রাচ্যবাদী গবেষক সেই বিয়ে নিয়ে কথা তুলেছেন। তাঁরা সময় ও পরিবেশের এই দীর্ঘ ব্যবধান ভুলে গিয়ে সেই বিয়েকে আখ্যা দিয়েছেন—'অপ্রাপ্ত বয়স্ক কুমারী শিশুর সঙ্গে এক বৃদ্ধ পুরুষের আশ্চর্যরকম বন্ধন।' তাঁরা হিজরতেরও আগে মক্কায় অনুষ্ঠিত একটি বিয়েকে নিজেদের মনমতো তুলনা করেছেন আধুনিক পশ্চিমের বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে; যেখানে সাধারণত পঁচিশের আগে কোনো তরুণী বিয়ের পিঁড়িতে বসে না। অথচ এই বয়সটা এই যমানাতেই জাযীরাতুল আরবে, বরং মিশরের গ্রামাঞ্চলে এবং প্রাচ্যের অধিকাংশ এলাকায় বিয়ের জন্য অতি বিলম্বিত বয়স বলে গণ্য

করা হয়। একজন ন্যায়নিষ্ঠ প্রাচ্যবিদ জাযীরাতুল আরবে পর্যটনে গিয়ে এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং ফিরে এসে বলেছেন—'আয়িশা অল্প বয়সেই অন্য আরব-যুবতীদের মতো দ্রুত-বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, এই দ্রুত-বৃদ্ধিটা এমন ছিল, যে, এর ফলে বয়স ২০-এর পরে দ্রুতই তাঁরা যৌবন হারাতে শুরু করতেন...। (তাই, কম বয়সেই গঠনগত কারণে তাঁরা বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যেতেন।)...কিন্তু এই বিয়ের কারণে তথাকথিত কিছু ইতিহাসবিদ প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা তাঁকে বিচার করেছে নিজেদের চারপাশের বর্তমান-পরিবেশ দিয়ে। ফলে, তাদের এটা ভাবার সুযোগ হয়নি, যে, এমন বিয়েই এশীয়-অঞ্চলে সেই সুদূর অতীত থেকে আজ অবধি খুব স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে প্রচলিত আছে। তাদের চিন্তায় এটা আসেনি, যে, এই রীতি ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে আজও বিদ্যমান। স্পেন ও পর্তুগালেও কিছুকাল এর প্রচলন ছিল; এমনকি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিছুটা দূরবর্তী বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায়ও এমন বিয়ে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।'[১]

হিজরত—অচেনা ভূখণ্ডের পানে...

একটি কচি শিশু—অপূর্ব সৌন্দর্য ও কোমলতা যাকে মায়াবী ওড়নার মতো ঢেকে রেখেছে—শৈশবীয় নিষ্পাপ হাসি-আনন্দে যে ভাসছে দিন-রাত; হঠাৎ করে দাম্পত্যের গুরুগম্ভীর দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে, তার কোমল কাঁধের ওপর যুলুম করতে চাননি চির-দয়ার আধার নবীজি মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি বরং তাঁকে আগের মতোই তাঁর পিতার ঘরে থাকতে দিয়েছেন। যেন তিনি বান্ধবীদের সঙ্গে উপভোগ করতে পারেন আনন্দ-উচ্ছলতায় ভরা একেকটি দুরন্ত দিন। যেন তিনি শৈশবের বর্ণিল জান্নাতে প্রাণ খুলে উড়তে পারেন ফড়িং, প্রজাপতি, বা, কোনো সবুজ পাখির মতো।

তবে, এর মানে কিন্তু এ নয়, যে, আয়িশা কেবল তাঁর সখীদের সঙ্গেই পড়ে থাকতেন—রাসূলের কাছে যেতেন না। বরং নবীজি ﷺ হযরত আবু বকরের ঘরে গেলে প্রায়ই আয়িশা তাঁকে দেখতে ছুটে আসতেন। আহা! আর, নবীজি? আয়িশার হৃদয়হারী-সব কাণ্ডকীর্তি দেখে তিনি সামনে পড়ে থাকা সব ব্যস্ততা ভুলে যেতেন; 'একা' ও 'অপরিচিত'র মতো ঘরে ফেরার যে-বিষণ্ণতায় তিনি

[১] বোড লি কৃত আর-রাসূল-এর আরবী অনুবাদ (ফারজ ও সাহার কৃত) ১২৯।

ভুগতেন, আয়িশার দর্শন তাঁর সেসব কিছু মুছে দিত। সত্যিই রাসূল 'একা' ছিলেন। ভালোবাসার মায়াময় আঁচলে জড়িয়ে তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার কেউ ছিল না। যদিও তাঁর ঘরদোর ও বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য নিবেদিতপ্রাণ সাওদা ছিলেন। সত্যিই তিনি 'অপরিচিত' ছিলেন। দুনিয়ার সব ছেড়েছুঁড়ে বিষণ্ণ-বিধ্বস্ত মনে যখন ঘরে ফিরতেন, তখন একান্ত আপন করে তাঁর মনের দহলিজে সুখের ঠান্ডা হাওয়া বইয়ে দেওয়ার কেউ তো ছিল না। যদিও যুগযুগান্তর ধরে তাঁর বাপ-দাদার আবাস যেই ভূমি, সেই মক্কাতেই তিনি বসবাস করতেন।

তাই, যখনই তাঁর মনের আকাশে 'একা' আর 'অপরিচিত'র অনুভূতি মেঘ হয়ে জমাট বাঁধত, তখনই তাঁর মনে চাইত বন্ধু আবু বকরের ঘরে ছুটে যেতে। ইচ্ছে হতো—কয়েক টুকরো সময় বাগদত্তার সংস্পর্শে কাটাতে। তাঁর দর্শনই তো সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। তাঁর নিষ্পাপ হাসি-কৌতুকেই তো বুদ্ধির এমন সূর্য লুকিয়ে থাকে—বিষণ্ণ মনের যমীনে যা ছড়িয়ে দেয় কোমল রোদের মতোন মুঠো মুঠো সুখ।

আবার, তাঁর প্রতি আয়িশার প্রতিটি নজরেও মিশে থাকত অপার মুগ্ধতা—'মানুষ কী করে এত মহান হয়! মহিমা, মর্যাদা আর আত্মসম্মানে এতটা আকাশছোঁয়া কেউ কী করে হতে পারে! আবার, তিনিই কিনা আমার বাবার বন্ধু!'

আয়িশার নিজস্ব আনন্দ-জগতের একটি অন্যরকম আকর্ষণ ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা কেবলই বিমোহিত করে তুলত সুগন্ধ আতরের মতো। তিনি আয়িশার কাছে গেলে সুখ পেতেন। মনের মধ্যে গোলাপের কোমল ছোঁয়া অনুভব করতেন আয়িশার সঙ্গে হাস্যরস আর খেলাধুলায়। দিনে অন্তত একবার—সকাল কিবা সন্ধ্যায়—আবু বকরের ঘরে রাসূলের নিয়মিত আগমনে ছেদ পড়ত না। এ-বিষয়টি আয়িশার মনেও এনে দিত বড় সুখের তৃপ্তি।[১]

একদিন—যখন কাফিররা অত্যাচারের চূড়ান্ত করে ফেলেছিল, বিশ্বাসের তো বটেই, জীবনেরও গলা টিপে হত্যা করতে যখন ওরা সাক্ষাত-জল্লাদ হয়ে উঠেছিল, একপর্যায়ে যখন অতিষ্ঠ মুসলিমেরা রাসূলের অনুমতি পেয়ে একে একে পাড়ি জমিয়েছিলেন মদীনায়—বন্দী, কিবা, সমস্যাগ্রস্ত ব্যতীত আর কেউ রয়নি নিজেদের প্রিয় জন্মভূমিতে, কেবল রয়ে গেছেন রাসূল ও তাঁর দুই শ্রেষ্ঠ

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/১২' : *উয়ূনুল আসার* : ০১/১৮২।

সঙ্গী—আবু বকর ও আলী ইবনু আবী তালিব; তেমনই একদিনে আয়িশা তাঁর ঘরে বসে একা একাই খেলছিলেন। রোদ্রতপ্ত প্রখর দুপুরেও শৈশবের দুরন্তপনা তাঁকে ঘুমোতে দেয়নি, অমন নিঝঝুম দুপুরেও অন্য সবার মতো তাঁকে দেয়নি ক্লান্ত হয়ে চুপটি মেরে শুয়ে-বসে থাকতে।

হঠাৎ আয়িশার মনে হলো কে যেন আসছে। কান পেতে আরেকটু খেয়াল করতেই তাঁর মুখে ছড়িয়ে পড়ল এক টুকরো হাসি—'আরে, তিনি আসছেন! তিনিই তো!' প্রিয়তমের আগমন-আনন্দে যেন তর সইছিল না আর। কয়েক মুহূর্ত পরেই মুখজুড়ে প্রেমগোলাপের রঙ মেখে তিনি ছুটলেন দরজার দিকে; তাঁকে স্বাগত জানাতে হবে না?

আবু বকর ﵁ শুয়ে ছিলেন। এই ভরদুপুরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দরজায় দেখেই এক ঝটকায় বিছানা ছেড়ে দরজায় হাজির হলেন। তাঁর মনে হলো—অতি জরুরি কিছু না-হলে এই অসময়ে তো রাসূল আসতেন না।

আবু বকরের চৌকিতে এসে বসলেন রাসূল। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর মুখমণ্ডলে চিন্তার ছাপ। অবস্থা দেখে খানিকটা দূরে দাঁড়ানো দুই সহোদরা—আয়িশা ও আসমা'র যেন উৎকণ্ঠায় শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল। চুপচাপ কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকলেন তাঁরা। ঘরের লোকদের দিকে না-তাকিয়েই রাসূল বললেন, 'অন্য কেউ থাকলে, সবাইকে সরিয়ে দাও।' আবু বকর বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘরে তো আমার মেয়েরাই শুধু। কী হয়েছে, বলবেন কী? আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতাও কুরবান হোন!'

নবীজি বললেন, 'আমাকে হিজরত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মক্কা ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে।'

এটুকু শুনতেই আবু বকর ﵁ আনন্দে অভিভূত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কিন্তু সাথে থাকবই!'[১]

আসলে, আবু বকর তো বহুবার রাসূলের কাছে হিজরতের অনুমতি চেয়েছেন। তিনি অনমতি চাইলেই নবীজি তাঁকে বলতেন, 'আরে, তাড়াহুড়ো করো না;

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/১২৯। অবশ্য সহীহাইনে হযরত আয়িশা ও ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সূত্রে হিজরতে বের হওয়ার হাদীসটি বর্ণিত আছে।

আল্লাহ হয়তো কোনো সঙ্গী জুটিয়ে দেবেন তোমাকে।' আবু বকর রাসূলের এমন কথা শুনতেন, আর, মনে মনে বলতেন, সেই সঙ্গী আপনি হয়ে গেলেই তো...!

দুই বন্ধু কথা শুরু করলেন। অদূরেই তাঁদের মনযোগী শ্রোতা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন আয়িশা ও আসমা। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে তাঁরা আলাপ করতে লাগলেন—কুরাইশ খুব ক্ষেপে গেছে। ওরা যখনই বুঝতে পেরেছে, যে, এমন কিছু লোক মুহাম্মাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে, যারা না-কুরাইশের কেউ; আর, না-মক্কার কোনো বাসিন্দা; বরং সুদূর ইয়াসরিবে বসে তারা মুহাম্মাদের মাক্কী সাথীদেরকেও সেখানে ডেকে নিচ্ছে; ফলে, মক্কার মুহাম্মাদীরা কুরাইশের হাতছাড়া হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে এক অভিজাত ও শক্তিশালী হালিফের আশ্রয়ে; এমনকি খুব শিগগির মুহাম্মাদও সেখানে চলে গিয়ে সর্বনাশের চূড়ান্ত করবে; কারণ, মুহাম্মাদ সেখানে পৌঁছেই কুরাইশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রস্তুতি শুরু করবে। তো, যখনই এটা তারা বুঝতে পেরেছে, তখনই এই ষড়যন্ত্রতত্ত্বের চিন্তাতে তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। উন্মাদের মতো তারা হাজির হতে শুরু করেছে 'দারুন নদওয়া'য়—যেখানে তাদের সর্বরকম পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটি ছিল তাদের অন্যতম পূর্বপুরুষ কুসাই ইবনু কিলাবের ঘর। এখানেই তারা আজ একত্র হচ্ছে রাসূল মুহাম্মাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে।

দারুন নদওয়ায় একে একে উপস্থিত হয়েছে উতবা ইবনু রবীআ ও তার ভাই শাইবা, আবু সুফিয়ান ইবনু হারব, তুআইমা ইবনু আদী, জুবাইর ইবনু মুতইম, নজর ইবনুল হারিস ইবনিল কালদা, যামআ ইবনুল আসওয়াদ, আবু জাহল ইবনু হিশাম, হাকীম ইবনু হিযাম ও উমাইয়া ইবনু খালাফের মতো অগুনতি ইবলীসী মস্তিষ্কের কুরাইশ-সরদার।

দীর্ঘ সময় নানা কথাবার্তা চলল। অবশেষে মহাদুরাচারী আবু জাহলের কথামতো সিদ্ধান্ত হলো—প্রত্যেক গোত্র তাদের শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী একজন যুবককে নাঙা তলোয়ার দিয়ে পাঠাবে। এরপর সব যুবক একত্রে মুহাম্মাদকে হত্যা করবে। এতে, মুহাম্মাদের রক্তের দায় গিয়ে বর্তাবে সব গোত্রের ওপর। ফলে, তাকে হত্যার দায়ে একা বনু আবদি মানাফ বাকি সব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে পারবে না। বাধ্য হয়ে তাদেরকে রক্তপণ গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট হতে হবে। এবং খুব

সহজে, এই সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে কুরাইশ মুক্তি পাবে মুহাম্মাদের সব জ্বালাতন (!) থেকে।[১]

অপরদিকে মহাকৌশলী রবও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিজরতের আদেশ করলেন। আর, রাসূল তাঁর সফরসঙ্গী নির্বাচন করলেন সেই মানুষটিকে, সঙ্গলাভের ঘোষণা শোনার জন্যই বহুদিন যাবত যিনি বসে ছিলেন প্রতীক্ষার চাতক হয়ে—আবু কুহাফার পুত্র, প্রিয়তমা আয়িশার মহান পিতা 'আবু বকর আবদুল্লাহ'।

পাশে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিলেন আয়িশা। হিজরতের কথা শুনতেই বুকটা কেঁপে উঠল তাঁর। কোথা থেকে যেন নীল বিষাদের তীর এসে বিঁধল মনের নরম মাটিতে। কেবলই মনে হতে লাগল—'হায়, এই হিজরতের উসীলা করেই বুঝি তাঁকে হারাতে বসলাম! পাষাণ কাফিরদের কারণে আজ প্রাণের প্রিয়তমকে হারিয়ে আমি একলা কী করে থাকব!'

আয়িশা প্রিয়তমের দিকে তাকালেন। দেখলেন, তিনি কাঁদছেন; অথচ তাঁর অভিব্যক্তিতে আনন্দের আভা। এর মানে, তাঁর চোখে আসলে আনন্দের অশ্রু?! বয়স যেটুকুই হয়েছে, এর মধ্যে আয়িশা কখনও কাউকে আনন্দে কাঁদতে দেখেননি। তিনি যেন ভাবতেও পারছেন না—আনন্দেও কেউ কাঁদতে পারে!

এরপর তিনি নজর ফেরালেন বাবার দিকে। হতভম্ব হয়ে দেখলেন—বাবাও প্রিয়তমের মতোন কাঁদছেন। তাঁর দু'গণ্ড বেয়েও গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে সুখের কোমল কণারা![২] এমন দৃশ্য দেখে অভূতপূর্ব এক অনুভূতিতে আয়িশা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হতে লাগল—এমন বিরহেও নিশ্চয় সুখ আছে। এমন দহনের কোনো ক্ষণে নিশ্চয় শোনা যাবে—'ইয়া নারু, কূনী বারদান ওয়াসালামা' (হে আগুন, শীতল ও শান্তি হও)-এর আসমানী ঘোষণা।

খুব শিগগির সফরে বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু হলো। আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকিতকে ডেকে পাঠালেন আবু বকর; সে মানুষকে পথদেখানোতে সেরা ছিল যেমন, তেমনই ছিল বিশ্বস্ত। সবরকম পথঘাট এবং সেসবের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে তার চেয়ে ভালো জানাশোনার লোক ছিল খুবই কম।

---

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/১২৪, ১২৬; *তারীখু তাবারী* : ০২/২৪৩; *উয়ূনুল আসার* : ০১/১৭৬।
[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/২৪৬।

তার কাছে আবু বকর দুটি বাহনজন্তু দিলেন সফরের সময় অবধি দেখাশোনা করার জন্য। অপরদিকে রাসূল ﷺ খবর দিলেন চাচাতো ভাই আলী ইবনু আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। অবস্থার জটিলতা ও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আলীকে বিস্তারিত জানালেন তিনি। এরপর তাঁকে এমন এক দায়িত্ব দিলেন, ইতিহাস যেটির প্রতি বাকহারা বিস্ময় আর মুগ্ধতা নিয়ে তাকায়। তিনি আলীর হাতে কিছু আমানতের মাল উঠিয়ে দিলেন—প্রত্যেকটি স্ব স্ব মালিকের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে বললেন! হায়, মক্কার ওই যালিমগুলো তবু এমন বিস্ময়কর চরিত্র-মাধুর্যের অধিকারী মানুষটিকে নিজেদের অন্ধ-প্রতিহিংসার শিকার বানাতে পিছপা হয়নি।

সফরে বেরুনোর আগ মুহূর্তে আবু বকরের ঘরের নিকটবর্তী একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়ালেন নবীজি। কিছুটা সময় কাবামুখী হয়ে থাকলেন। এরপর পুরো মক্কার দিকে তাকিয়ে বললেন—'ও উম্মুল কুরা, আল্লাহর যমীনের মধ্যে তুমিই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আল্লাহর কাছেও তোমার চেয়ে প্রিয় কোনো ভূখণ্ড নেই। তোমার সন্তানেরা আমাকে বের না-করে দিলে আমি তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।'[১]

এরপর তিনি তাকালেন আয়িশার দিকে। বিদায়কালে এক টুকরো হাসি তাঁকে উপহার দিতে চাইলেন; কিন্তু আয়িশাকে তো আচ্ছন্ন করে রেখেছে দ্রুতই ঘটতে যাওয়া এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও অযাচিত বিরহের বিষাদ! আয়িশা যেন হারিয়ে গেছেন কোনো ঘোরে। তাঁর ঠাহর হচ্ছে না, যে, তিনি জাগ্রত, নাকি ঘুমের কল্পরাজ্যে তাঁকে ভয় দেখিয়ে পেরেশান করছে দুষ্ট স্বপ্নরা!

দুই মহান মুসাফির আবু বকরের ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে পাথেয় হিসেবে নিলেন মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম। এই দিরহামগুলো ছিল আবু বকর-পরিবারের একমাত্র সম্বল। প্রাণের চেয়েও প্রিয় রাসূলের তরে এই কুরবানীটুকুর জন্য সামান্য দ্বিধা, বা, চিন্তা-ভাবনাও করতে হয়নি তাঁদের।

আয়িশা একা রয়ে গেলেন। বেদনা, বিষাদ, আর, পেরেশানির আঁধারে ছটফট করতে লাগলেন তিনি। আসমা বসে গেলেন রান্নায়; সন্ধ্যার আঁধার নেমে এলে গুহায় যেতে হবে খাবার নিয়ে। তাঁদের ভাই আবদুল্লাহ গেলেন মানুষের সমাগম,

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/১২৯; *তারীখু তাবারী* : ০২/২৪৭।

আর, বিভিন্ন আড্ডায়; লোকেরা কী বলাবলি করে, তা খেয়াল করা তাঁর দায়িত্ব। অপরদিকে, মুসাফিরদ্বয় পা চালালেন সাওর পাহাড়ের একটি গুহার উদ্দেশ্যে। আবু বকরের পরিবার ও আলী ব্যতীত মক্কার আর কেউই জানতে পারল না—নিজেদের, কিবা, শুধু মক্কার নয় বরং তামাম জগতের কল্যাণের জন্যই আপন ভিটেমাটি ত্যাগ করে চুপচাপ বেরিয়ে পড়েছেন দুই আলোক-অভিযাত্রী—রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর প্রিয়তম সহচর আবু বকর رضي الله عنه।

আবদুল্লাহ ঘরে ফিরে এলে আয়িশা তাঁর কাছে শহরের হালত জানতে চাইলেন। আবদুল্লাহ বললেন, 'মুশরিকেরা রাসূলের চলে যাওয়াটা টের পেয়ে গেছে। ওরা তাঁকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে একশ' উটনী।' শুনে তো আয়িশার অস্তিত্ব কেঁপে উঠল। পেরেশানি, আর, অস্থিরতায় যেন জান যায় তাঁর। মন চাইছিল—হাওয়ায় উড়ে তাঁর কাছে চলে যেতে। দুর্বল হাতে হলেও তাঁকে ঢেকে রাখতে ভালোবাসার চাদরে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান তাঁর মনকে ভেঙে পড়তে দিল না। সাথে, ভাই আবদুল্লাহ ও গোলাম আমির ইবনু ফুহাইরার কথোপকথন শুনে আরও অনেকটা সান্ত্বনা পাওয়া গেল। আমিরকে আবদুল্লাহ বলছিলেন—'দিনের বেলায় মক্কার চারণভূমিতে বকরি চরাবে; আর, সন্ধ্যায় সেগুলো নিয়ে যাবে গুহার কাছে। এতে করে, গুহায় যারা গিয়েছে, মরুর বালিতে-থাকা তাদের পায়ের ছাপগুলো মুছে যাবে।'

দিনভর আয়িশা শুধু একটি কাজ করেছেন; সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত গুণেছেন—কখন ফুরাবে দিন, কখন সান্ধ্য-চাদর গায়ে জড়িয়ে উড়ে আসবে সান্ত্বনা ও সুখের খবরেরা! একেকটি মিনিট-মুহূর্তকে তাঁর মনে হয়েছে যেন কয়েক বছর। দুষ্ট সময়েরা যেন তাঁর কষ্ট বাড়াতেই বরফ মেখে দাঁড়িয়ে আছে ঠায়!

অবশেষে বেলা ফুরাল। আসমা তৈরি হলেন গুহার উদ্দেশে। আয়িশা তখন বোনের কাছে খাবারের সঙ্গে দিলেন তাঁর হৃদয়োৎসারিত সালাম আর দুআ। আসমা চলে গেলে আয়িশা দুরুদুরু বুক, আর, শঙ্কিত মন নিয়ে বোনের ফেরার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। বহুক্ষণ পর আসমাকে ফিরে আসতে দেখেই তাঁকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন আয়িশা। আসমার চোখে, কানে ও হাতে চুমু খেলেন তিনি; কারণ, এই চোখ দিয়েই তো আসমা দুই প্রিয়তমের দর্শন করে এসেছেন! এই হাত দিয়েই তো তিনি তাঁদের সঙ্গে মুসাফাহা করেছেন! এবং এই কান দিয়েই

তো শুনে এসেছেন প্রিয়তমদের মায়াবী কণ্ঠ! এরপর আয়িশা তাঁকে ধরলেন বাবা ও প্রিয়তম স্বামীর খবর জানাতে।

আসমা বলতে লাগলেন—'গুহায় থাকাটা বেশ কষ্টের। আব্বাকে দেখলাম রাসূলকে নিয়ে বড় পেরেশান। গুহার সঙ্কীর্ণ কুঠরিতে একাকী-পরিবারহীন ও অপরিচিত পরিবেশে রাসূল হয়তো বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন—ভেবে আব্বা তাঁকে বলেছিলেন, "আমি খুন হলে কিচ্ছু হবে না, একটিমাত্র মানুষ আমি, কিন্তু আপনি খুন হলে তো পুরো জাতি শেষ!" রাসূল ﷺ তাঁর জবাব দিয়েছেন এই বলে—"চিন্তা করো না; আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।"'

আয়িশা বারবার বোনের কাছে গুহাবাসীর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। এভাবে রাত পেরিয়ে গেল, আয়িশাও ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখে নেমে এল ঘুমের মেঘ। হৃদয়টা উড়ে গেল গুহার কাছে—এই মুহূর্তে যেটি তাঁর কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় ও অমূল্য আশ্রয়স্থল।

দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হতে লাগল। খবর এল—কুরাইশের একটি দল রওনা হয়েছে মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীকে ধাওয়া করার জন্য। সন্ধ্যায় আসমা গুহায় গেলেন খাবার নিয়ে। ফিরে এসে আয়িশাকে শোনাতে লাগলেন ধাওয়াকারীদের গল্প—কী করে ওরা একেবারে গুহার মুখে পৌঁছে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ ওরা ছিলও সেখানে। আর একটু হলেই নাকি রাসূলকে দেখে ফেলেছিল। ভাগ্যিস, গুহার মুখে এরই মধ্যে মাকড়সা জাল বুনে ফেলেছিল; আর, ডিম পেড়ে রেখেছিল দুটি জংলি কবুতর।

আসমা বললেন আয়িশাকে—'বাবা সবচেয়ে বেশি পেরেশান হয়েছিলেন ওদেরকে নিজেদের একেবারে কাছে চলে আসতে দেখে। ওদের সাথে এক-দু কদমের দূরত্ব ছিল মাত্র। নিজেদের মধ্যে ওরা পরামর্শ করছিল, গুহায় ঢুকবে কিনা; বাবা তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, "ওদের কেউ পায়ের দিকে তাকালেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে!" এই শুনে রাসূল কী বলেছিলেন, জানো? রাসূল বলেছিলেন, "এমন দুজন লোকের নিরাপত্তা-বিষয়ে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ?"[১]

[১] সহীহাইনের হিজরতের হাদীস থেকে নেওয়া হয়েছে এটি। *উয়ূনুল আসার* : ০১/১৮২।

তৃতীয় রাত। আসমার প্রতীক্ষায় আয়িশা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর নির্দিষ্ট জায়গায়। সারাটা দিন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কেটেছে তাঁর। এখন একদৃষ্টে পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখ যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে; তবু, আঁধারের পর্দায় তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে তিনি খুঁজে ফিরছেন আসমার দেহাবয়ব। হঠাৎ মনে হলো—ওই তো, বহুদূর থেকে খুব ক্ষীণভাবে কার যেন পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই সে আসমা হবে! সে এলেই সর্বান্তকরণে তার শ্রোতা হয়ে একনিষ্ঠভাবে শুনব প্রিয়তমদের কথা।

রাতের এক প্রহর শেষ। আয়িশা একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। চিন্তা-পেরেশানিতে তাঁর মাথা যেন চক্কর দিতে শুরু করেছে। আর কোনোক্রমেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না তিনি। অবশেষে দেখা গেল আসমাকে—হাঁপাতে হাঁপাতে এলোমেলো পা ফেলে একরকম দৌড়ে দৌড়ে আসছেন আসমা। দেখে তো উদ্বেগে আয়িশার যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। আসমার কাছে গিয়ে দেখলেন—তাঁর কোমরের ফিতা ছেঁড়া; একাংশ গায়েব!

আয়িশার উদ্বেগ দূর করতেই যেন আসমা কোনোমতে বললেন, 'তাঁরা নিরাপদেই গুহা ছাড়তে পেরেছেন।' এরপর একটু শ্বাস ফেলে আয়িশার কাছে আসমা বলতে লাগলেন ইতিহাসের পাতায় অবিস্মরণীয় সেই রাতের কথা, যেই রাতে শুধু আরবের নয়—পুরো জগতের ইতিহাসেরই নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল—'চারদিকে সন্ধ্যার নীরবতা ছেয়ে যেতেই রাহবার আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকিত এসে পৌঁছোয়। সাথে নিয়ে আসে কদিন আগে বাবার দেওয়া বাহনজন্তু-দুটি; নিজের জন্যও একটি বাহনজন্তু আনে সে। গুহার মুখে পশুগুলোকে বসায়। এরপর গুহা থেকে বেরিয়ে আসেন রাসূল ও বাবা। এদিকে, খাবার নিয়ে আমি পৌঁছোই। একটি দস্তরখানে পোটলার মতো মুড়িয়ে খাবারগুলো নিয়ে গিয়েছিলাম; কিন্তু এই পোটলার মুখটা বাঁধতে ভুলে গিয়েছিলাম। সফর শুরুর আগ-মুহূর্তে পোটলাটি অন্যান্য পাথেয়ের সাথে বেঁধে দিতে গিয়ে দেখলাম, কোনো রশি নেই আমার হাতের কাছে। উপায় না-পেয়ে নিজের কোমর-বন্ধনীটা দুটুকরো করে ফেললাম। এক টুকরো দিয়ে পোটলা বাঁধলাম, অপরটি বাঁধলাম কোমরে। এরপর বাবা দুটি বাহনজন্তুর মধ্য থেকে ভালোটি বেছে রাসূলকে দিলেন, আর, বললেন, "আরোহণ করুন। আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতাও

কুরবান হোন।" রাসূলের পর বাবা আরোহণ করলেন অপর জন্তুটিতে। বাবার পেছনে বসল গোলাম আমির ইবনু ফুহাইরা।

'কাফেলা মক্কার প্রান্তভূমি ছেড়ে জনপদের বাইরে দিয়ে দক্ষিণমুখী পথ ধরল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ধীরে ধীরে অপসৃয়মান কাফেলার দিকে তাকিয়ে। যেন দেখতে পেলাম—মেঘের মতো আঁধারে এক গুচ্ছ তারকা হারিয়ে গেল অল্পক্ষণেই। এরপর ধাওয়াকারীদের কাছে ধরা পড়ে যাই কিনা, এই ভয়ে ভয়ে কোনোমতে বাড়িতে এসে পৌঁছুলাম।'

আসমার কথা শুনতে শুনতে আয়িশা ﵂ হারিয়ে গেলেন দূর ইয়াসরিবের পথে; যে-পথ মাড়িয়ে ইতিহাসের সোনালি ভোরের দিকে এগিয়ে চলেছে তাঁর দুই প্রিয়তমজন; রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ ও বাবা আবু বকর ﵁। তাঁর মনে হলো—তিনি বুঝি বসে আছেন রাসূলের পেছনেই। তাঁর চেয়ে জগতে শ্রেষ্ঠ সুখী এই মুহূর্তে আর কেউ নেই। হঠাৎ আয়িশার ভাবনা ছিন্ন হয়ে গেল। দরজায় জোরে জোরে করাঘাত!

এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে গেলেন আয়িশা। ভয়ের হিম-বরফে জমে গেল তাঁর দেহ—কে এল এই রাতের আঁধারে? দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গেলেন আসমা। দরজা খুলতেই দেখলেন—কুরাইশের একটা দল দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে আছে আবু জাহলও। গলা চড়িয়ে আবু জাহল বলল, 'ও আবু বকরের মেয়ে, তোমার বাবা কোথায়?' আসমা বললেন, 'জানি না। আল্লাহই ভালো জানেন বাবা এখন কোথায়।' কথা শেষ না-করতেই আবু জাহল হঠাৎ ওপরে হাত তুলে প্রচণ্ড জোরে এক চড় মারল আসমার গালে। তাঁর কানের দুলও ছিঁড়ে গিয়ে দূরে ছিটকে পড়ল।[১] হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন আসমা। তিনি তো মিথ্যা বলেননি। বাবার সঙ্গে তো তাঁর সর্বশেষ দেখা হয়েছিল গুহা থেকে তাঁদের বেরিয়ে যাওয়ার সময়। এরপর প্রিয় রাসূলের সঙ্গে অজানা মরুর পথে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছেন বাবা, তা তো তাঁর জানার কথা নয়! আবু জাহলের দল রাগে হম্বিতম্বি করতে করতে ফিরে গেল।

এর পরবর্তী কয়েক দিন মক্কায় শুধু ওই নিষ্ঠুর ও হিংসাত্মক বিতাড়নের

---

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/১৩২; *তারীখু তাবারী* : ০২/২৪৭। *আল-ইসাবাহ* ও *আল-ইসতীআবে* আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনী অধ্যায় দেখুন।

কথাই গুঞ্জরিত হতে থেকেছে। অপরদিকে, প্রায়-নিরস্ত্র মুহাজিরদের পেছনে ইয়াসরিবমুখী সমস্ত পথ-ঘাট ও মরুঅঞ্চল হণ্যে হয়ে চযে ফিরেছে কুরাইশ। ওই দুর্বল কাফেলাটি কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলেই কুরাইশ-বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হবে—যেখানে বাধা দেওয়া, বা, কোনো রা করারও সুযোগ থাকবে না মক্কাবাসীর—এমন চিন্তাই মাথা খারাপ করে দিয়েছে কুরাইশের। কিন্তু আল্লাহ্ তো রাসূল ও তাঁর সাথীকে প্রথমে গুহায়, এরপর, ইয়াসরিবমুখী পথে পথে শত্রুর নাপাক হাত থেকে হেফাজত করেছেন।

মুহাজিরদের খোঁজে দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়ানো লোকদের মাধ্যমে নানারকম খবর আসতে লাগল। একদিন ইয়াসরিবের একটি খবর আসল, যে, সেখানে মুহাম্মাদের অনুসারীরা প্রতিদিন তাঁর প্রতীক্ষায় ইয়াসরিবের প্রবেশমুখে এসে বসে থাকে। ফজরের পর থেকে সূর্য প্রখর হয়ে ওঠা পর্যন্ত তারা বসে থাকে—কখন যেন তিনি আসেন, আর, পলকেই আলোকিত করে তোলেন ইয়াসরিবের মাটি, মানুষ ও খেজুরপাতায় দোল দেওয়া সুশীতল হাওয়া।

এমনই একদিন তারা প্রতীক্ষা করতে থাকে। সূর্য প্রখর হয়ে উঠতেই তারা ঘরে ফিরে যেতে শুরু করে; আর, অমনিই এক ইহুদীর কণ্ঠ শোনা যায়—'ও লোকেরা, ওই দেখো তোমাদের মেহমান এসে গেছেন।' শোনামাত্র সবাই ছোটে তাঁকে দেখতে। একটা গাছের নিচে তাঁরা উভয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুজনেই যেহেতু প্রায়-সমবয়সী, আর, ইয়াসরিবের অধিকাংশ লোকই তাঁদেরকে আগে কখনো দেখেনি; তাই, কে নবী—তারা চিনতে পারে না। সম্ভ্রম আর শ্রদ্ধার কারণে জিজ্ঞাসাও না-করতে পেরে তারা দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ বাদে দুজনের মধ্য থেকে একজনের গায়ে রোদ এসে পড়ে; তখন অপরজন দাঁড়িয়ে তাঁকে ছায়া দেন; লোকেরাও চিনতে পারে প্রিয়তম রাসূলকে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

রাসূল-আগমনের মিষ্টি খবর মুহূর্তেই ইয়াসরিবের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ে। যেন কোনো সুখবর নয়; বরং সুখের হাওয়া ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সর্বত্র। রাসূলের মুলাকাত পেতে ইয়াসরিবের পথে পথে জনতার স্রোত বইতে শুরু করে। ইয়াসরিবের পাখি, পাতা, হাওয়া, আর আকাশও যেন তাঁর আগমন-আনন্দে সুখের গীত গাইতে শুরু করে। সর্বত্র তাঁর বন্দনা, তাঁর প্রতি মুগ্ধতা।

তাঁরই জন্য আকুল সকল হৃদয়-গহন। ইয়াসরিব আর 'ইয়াসরিব' রয় না; হয়ে যায় মদীনা, 'মদীনাতুর রাসূল'।

পুরো সংবাদ শুনে প্রিয়তমের মহানত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদা নতুন করে অনুভব করলেন আয়িশা ﷺ। কুরাইশও তাঁর নিশানাও না-পেয়ে বুঝতে পারল—মুহাম্মাদ শুধু আমাদের হাতছাড়াই হয়নি; বরং বহু ঊর্ধ্বে ও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে গেছে। কুরাইশ এখন কেবল ভয়-শঙ্কা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল—আগামী সকাল জানি আরও কত সর্বনাশা খবর নিয়ে হাজির হয়! লজ্জায় কুরাইশ যেন মুখ লুকোনের জায়গা পাচ্ছিল না। হতাশা আর লাঞ্ছনায় যেন ডুবে যাচ্ছিল তারা—মাত্র একজন লোককে তারা ধরতে পারল না! অথচ তাঁর সাথে একজন সহযাত্রী, অমুসলিম (তথা, অন্য ধর্মাবলম্বী) একজন পথপ্রদর্শক, আর, একজন গোলাম ছাড়া আর কেউ ছিল না!

নতুন দিনের সূচনা-লক্ষ্যে তোলা এই মুহাজিরদের প্রতিটি কদম ইতিহাসের সেতারে নতুন সুর তুলেছে। মানবেতিহাসের পাতায় নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে এই হিজরতের মাধ্যমে। আর, ইয়াসরিবও পা রেখেছে এক বরকতপূর্ণ নয়া যামানার আঙিনায়—যুগযুগান্তরের আলোক-স্মৃতিতে যার অস্তিত্ব থাকবে সদা ঝলমলে—অমলিন।

নববধূর সাজ

হিজরতের পর নবীজি ﷺ তাঁর নির্দিষ্ট অবস্থানে থিতু হলেন। এরপর যাইদ ইবনু হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কায় পাঠালেন নবী-তনয়াদেরকে নিয়ে আসার জন্য। সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র একটি চিঠিও দিলেন তাঁর ছেলে আবদুল্লাহর উদ্দেশে। চিঠিটিতে আবু বকর লিখেছিলেন—আবদুল্লাহ যেন যাইদের সাথে নিজের মা উম্মু রূমান, আর, বোন আসমা ও আয়িশাকে নিয়ে চলে আসে। তো, ইয়াসরিব থেকে এই পয়গাম নিয়ে মক্কায় পৌঁছুলেন যাইদ ও রাসূলের গোলাম আবু রাফে।

কথামতো মক্কা থেকে এই পুরো দলটি সফরের যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে বেরিয়ে পড়ল। আনন্দে, সুখোল্লাসে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সামনে হঠাৎ যেন জগতটা অনেক বড় হয়ে গেল। সফরের শুরুর দিকে তাই খুব চঞ্চল আর

উচ্ছলতায় মজে থাকলেন তিনি। পথে এক জায়গায় তাঁর উটটি অন্য পথে ছুটে পালাল। উম্মু রূমান হায় হায় করে বলে উঠলেন—'হায় আমার মেয়েরা, হায় নববিবাহিতা কনে!'[১]

তাঁর আওয়াজ শুনে ছেলে আবদুল্লাহ, তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ, যাইদ ইবনু হারিসা ও আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহুম ছুটলেন উটের খোঁজে। খানিক বাদেই তাঁরা উট নিয়ে ফিরলেন। এরপর আয়িশা ﷺ একেবারেই চুপ হয়ে গেলেন। আর কোনো চঞ্চলতা দেখা গেল না তাঁর। কেবল নতমুখে বসে রইলেন, আর, মনের মধ্যে উথাল-পাথাল করতে থাকল প্রিয়জনদের মুলাকাত-সুখের ঢেউয়েরা।

এদিকে মদীনায় আয়িশার জন্য একটি ঘর প্রস্তুত করে রেখেছিলেন রাসূল। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কুবায় রাসূল অবস্থান করেছিলেন চার দিন। সেখানে ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। কালসুম ইবনু হিদম আনসারীর[২] একটি উট-ঘর ছিল, কুবায় থাকাকালে রাসূল সেখানেই ছিলেন। জুমুআর দিন তাঁর কাসওয়া নামক উটনীতে চড়ে কুবা থেকে ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বনু সালিম ইবনু আওফে পৌঁছুনোর পর সালাতের সময় হয়। ফলে, সেখানেই ইয়াসরিবের প্রথম জুমুআ আদায় করেন। এরপর আবার সফর শুরু করেন।

ইয়াসরিবের যেই পাড়া, বা, মহল্লাতেই তিনি পৌঁছুতেন, সেখানকারই লোকেরা বেরিয়ে এসে তাঁকে খোশআমদেদ জানাত, আর, বলতে থাকত—'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের ঘরে আসুন। আমরা সর্বউপায়ে আপনার সঙ্গ দেব।' জবাবে রাসূলও শুকরিয়া জানিয়ে বলতেন—'আমার উটনীটিকে ওর নিজের মতো করে চলতে দাও; ও নিজেই সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে আমাকে।' এভাবে চলতে চলতেই উটনীটি আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ঘরের সামনে গিয়ে বসে পড়ে। ফলে, মসজিদ ও নিজ ঘরের নির্মাণকাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন রাসূল।[৩]

---

[১] হিজরতের ঘটনাবলি অধ্যায়, *তারীখু তাবারী*; উম্মু রূমানের জীবনী অধ্যায়, *আল-ইসতীআব* ও *আল-ইসাবাহ*।

[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/১৩৯; *তারীখু তাবারী* : ০২/২৫৬; *ওয়াফাউল ওয়াফা বিআখবারি দারিল মুসতফা* : ০১/২৫০।

[৩] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/১৩৯; *ওয়াফাউল ওয়াফা* : ০১/২৫৬।

মুহাজির ও আনসার—সবাই পুরোদমে কাজে লেগে যান। জানতোড় মেহনতে অবশেষে ছবির মতো দৃশ্যমান হয় মসজিদ ও তার পার্শ্ববর্তী নয়টি কামরা; যার কোনো কোনোটা তৈরি হয়েছে মাটি ও খেজুরডাল দ্বারা; আর, কোনোটা তৈরি হয়েছে একটার ওপর একটা ছাঁচা পাথর দিয়ে। সবগুলো কামরার দরজা রাখা হয় মসজিদমুখী।

এই ঘরগুলোর একটায় থাকতে শুরু করেন হযরত সাওদা। তিনি নববী ঘরের সবকিছু দেখাশোনা করেন। নবীজি ঘরে আসলে তাঁর সেবা করেন; আর, নবী-কন্যা উম্মু কুলসুম ও ফাতিমার সর্বকাজে সহযোগিতা ও তদারকি করেন। নবী-কন্যা রুকাইয়া মদীনাতেই স্বামী উসমানের ঘরে ছিলেন। আর, যাইনাব ছিলেন মক্কায়, স্বামী আবুল আস ইবনু রবী'র সাথে। আবুল আস যাইনাবের খালাতো ভাই ছিলেন। তখন অবধি তিনি মুশরিক ছিলেন। ইসলাম তখনও তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা দেয়নি।

মসজিদ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘর নির্মাণশেষে মুসলিমরা যাঁর যাঁর ঘরে থিতু হয়ে যান। শত্রুভয় থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যেন নীড়ে ফেরা পাখির মতো শুরু হয় তাঁদের ক্লান্তিমোছা সুখ-সফর। এই সময়ে আবু বকর ﵁ আবার তিন বছর আগে মক্কায় হওয়া-বিয়ের প্রতি মনযোগী হন। রাসূলের কাছে পয়গাম পাঠান বিয়ের বাকি কাজ সম্পন্ন করে ফেলার বিষয়ে। নবীজিও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন। তাৎক্ষণিক আনসারদের বেশ কজন নারী-পুরুষকে নিয়ে খাযরাজ গোত্রে-থাকা হযরত আবু বকরের ঘরে গিয়ে পৌঁছান।

পাঠক, এর পরবর্তী গল্প হযরত আয়িশার মুখেই শুনুন—

'রাসূল ﷺ আমাদের ঘরে এলেন। তাঁর আশপাশে আনসারদের অনেক নারী-পুরুষ জমা হলো। এদিকে, আমার মা এলেন আমার কাছে। আমি তখন দুটি খেজুরগাছে বাঁধা দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম। মা আমাকে দোলনা থেকে নামিয়ে চুল ঠিকঠাক করে দিলেন। একটু পানি নিয়ে চেহারা ধুয়ে দিলেন। এরপর আমাকে সামনে নিয়ে চলতে শুরু করলেন। দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই যেন আমার বুকটা খালি হয়ে গেল। এরপর আমাকে ঘরের ভেতরে রাসূলের সামনে নিয়ে গেলেন; যেখানে তিনি বসে ছিলেন একটি খাটে। আমাকে রাসূলের সামনে বসিয়ে মা বললেন, 'এঁরাই তোমার (নতুন) পরিবার। আল্লাহ তোমাদের

পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের জন্য বারাকাহ দান করুন।'[১] এরপর লোকেরা সব উঠে চলে গেল। আনসারী মহিলাগণও বেরিয়ে গেলেন। আর, আমাদের বাড়িতেই আমাকে রাসূলের সঙ্গে বাসরঘরে দেওয়া হলো। আমার বিয়ে উপলক্ষে কোনো উট বা বকরি জবাই করা হয়নি। সেসময় আমার বয়স ছিল নয়। একটু পরে সাদ ইবনু উবাদাহ আমাদের ঘরে আসেন একটি বাটি নিয়ে। তিনি সেটি রাসূলের হাতে অর্পণ করেন।'

অন্য বর্ণনায় আছে—নবদম্পতির ঘরে এক পেয়ালা দুধও পাঠানো হয়েছিল। প্রথমে সেটা থেকে একটু পান করেন রাসূল ﷺ; এরপর পেয়ালাটি যায় কাঁপা-কাঁপা লজ্জা-লাজুক নববধূর হাতে। নববধূও সামান্য পান করেন বারাকাহ প্রাপ্তির আশায়।

আয়িশা ؓ তো বড় কোমল আর মিষ্টি এক মেয়ে ছিলেন। হালকা গড়ন, টানা টানা চোখ, কোঁকড়ানো চুল, আর, দীপ্তিমান লাল বরণ মুখমণ্ডল যেন তাঁকে সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে দাঁড় করিয়েছিল।

বাসররাতের পর আয়িশা তাঁর নতুন আবাসে চলে আসেন। মসজিদে নববী-সংশ্লিষ্ট কাঁচা ইট ও খেজুরগাছের ডাল-পাতা দিয়ে বানানো কামরাগুলোর একটি তাঁর জন্য নির্ধারিত হয়। মাটির ওপরে মাদুর বিছিয়ে তার ওপরে বিছানা পাতা হয়। একটি চামড়ার তৈরি বিছানা, যার ভেতরে বিভিন্ন পাতা-লতা ও ছাল-বাকল দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছে, সেটিই নববধূর শয্যা হিসেবে প্রস্তুত হয়। কামরার দরজার সামনে টানানো হয় একটি পশমের পর্দা।[২]

মোটকথা, এই ছোট্ট, সাধারণ কুঠরিটিতেই আয়িশা ؓ তাঁর কীর্তি-বিভায় উদ্ভাসিত দাম্পত্যজীবনের সূচনা করেন এবং এই ঘরে পদার্পণের মাধ্যমেই তিনি ইসলাম ও রাসূলের প্রেমমাখা বিপ্লবী জীবনে এমন এক দৃপ্ত, সুরভিত কদম রাখেন; আজ-অবধির ইতিহাস যার প্রতি বাকহারা মুগ্ধতায় থ হয়ে আছে। বরং ভবিষ্যত-পৃথিবীর ইতিহাসও কিয়ামাত তক খুঁজে পাবে না তাঁর প্রতি মুগ্ধতায় কমতির কোনো উপায়!

---

[১] *আস-সিমতুস সামীন* : ৩২; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১৭৬; *ওয়াফাউল ওয়াফা* : ০১/২৬০; সামান্য ব্যতিক্রমসহ *সহীহ মুসলিমে* এই বর্ণনাটি এসেছে বিবাহ অধ্যায়ে : ১৪৪২।
[২] *ওয়াফাউল ওয়াফা* : ০২/৪৫৯; *মুসলিম* : ২০৮২, ২৪৩৮।

আয়িশা ﷺ কম-বয়সী ছিলেন; কতক নিন্দুক তো তাঁকে বরং 'বাচ্চা' বলতেই বেশি সাচ্ছন্দ্য বোধ করে; তো, প্রাচ্যবিদদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব বোড লি লিখেছেন—'রাসূল মুহাম্মাদের ঘরে আয়িশার পদার্পণের পর থেকে সবাই তাঁর আলাদা বিশেষ 'অস্তিত্ব' উপলব্ধি করতে পারছিল। এ-জায়গায় কোনো যুবতী হলে, সে বুঝতে পারত—আগামী দিনে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে! তবু, আয়িশা যেহেতু আবু বকরের মতো মহান আর বহু বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ব্যক্তিত্বের কন্যা ছিলেন, তাই, রাসূলের মসজিদ-লাগোয়া ঘরে আগমনের প্রথম দিন থেকেই তিনি মনযোগী হয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্বের সুরম্য প্রাসাদ বিনির্মাণে।'[১]

এরচেয়েও সূক্ষ্ম কথা কী, জানেন? বলা হয়, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মনস্তাত্ত্বিক বৃদ্ধিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে এসেই হয়েছে। একটি বালিকা, যার কাছে খেলাধুলার জন্য তার সখীদেরকে নিয়ে আসেন তাঁরই স্বামী; কিবা, স্বামীর কাঁধে থুতনি রেখে যে দূর থেকে উপভোগ করে একদল হাবশীর খেলা;[২] রাসূল তো খুব ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন করেছেন—কী করে আয়িশা এমন-বয়সী বালিকা থেকে নিয়ে একজন পরিণত ও বুদ্ধিদীপ্ত তরুণী-রূপে নিজেকে নির্মাণ করেছেন; যেখানে এক মহিলার সাজগোজ বিষয়ক জটিল কোনো প্রশ্নের জবাবে তিনি বলছেন—'স্বামীর জন্য সাজতে গিয়ে যদি মনে হয়, যে, চোখের মণিদুটো খুলে আরও বেশি-সুন্দরদর্শন-জায়গায় সেগুলো বসাতে পারবেন, ফলে, আপনি তার সামনে আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবেন; তবে, তা-ই করবেন।' পতি-বিয়োগের শোকের মধ্যেই কোনো মহিলা নতুন কোনো স্বামী গ্রহণ করাটাকে অপছন্দ করে হাদীস বর্ণনা করছেন—'কোনো মহিলার জন্য কারও দুঃখে তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়; তবে, স্বামীর জন্য তা করবে।'

ইফকের পরীক্ষা : জীবন-কুসুমে ফোটা কাঁটার বিষাদ

জীবন-পরিক্রমায় একবার বিভীষিকাময় এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন আয়িশা। তাঁর চারপাশে সমগ্র পৃথিবী তখন হতাশার কালো আঁধারে ছেয়ে

---

[১] বোড লি কৃত '*আর-রাসূল*' গ্রন্থের অরবী অনুবাদ : ১৩০।
[২] বুখারী, অধ্যায়-ক্রম : ৩০।

গিয়েছিল। সময়ের প্রতিটা লমহায় মনে হতো—এই বুঝি জীবনের চেরাগ নিভে গেল! সেই মহাপরীক্ষার কালে মহামহিম আল্লাহর রহম তাঁর জন্য আশার আলোক-দ্বীপ হয়ে জ্বলে উঠেছিল; এবং জগদ্বাসীর সামনে সূর্যালোকের মতো স্পষ্ট করে দিয়েছিল, যে, আয়িশা এমন এক নিষ্কলঙ্ক নারী, কিয়ামাত পর্যন্ত স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের পাক কালাম যাঁর সচ্চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে যাবে প্রতিটি সত্যান্বেষী তিলাওয়াতকারীর সামনে।

পাঠক, শ্বাসরুদ্ধকর সেই ঘটনাটিকে 'ইফকের ঘটনা' বলা হয়। আমরা তা সরাসরি হযরত আয়িশার বর্ণনানুসারেই তুলে ধরছি—

ঘটনাটা হিজরী ষষ্ঠ সালের। কিছু দিন আগেই রাসূল ﷺ যাইনাব বিনতু জাহ্শ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেছেন। এখন তিনি বনু মুসতালিকের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অন্যান্য যুদ্ধ-সফরের মতো এবারেও তিনি সঙ্গিনী নির্বাচনের জন্য স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করলেন। লটারিতে নাম এল আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার।[১] সৌভাগ্য ও আনন্দানুভূতি নিয়ে আয়িশাও সঙ্গী হলেন প্রিয়তমের যুদ্ধযাত্রায়।

আয়িশার এই সঙ্গ যেন সুলক্ষণের পরশ হয়ে এল রাসূলের এই সফরে। তিনি এই যুদ্ধে জয় লাভ করলেন এবং বিজয়ী বেশে ফেরার পথ ধরলেন। তাঁর বিজয়ী বাহিনীও কদম বাড়াল সেই মদীনার অভিমুখে, যার প্রতিটি অলি-গলি তখন মুখরিত হচ্ছিল বিজয় আর আসমানী মদদের সুখ-সংগীতে।

পথিমধ্যে মদীনার নিকটবর্তী এক জায়গায় বাহিনী একটু যাত্রাবিরতি করল। রাতের কিছু অংশ সেখানে বিশ্রাম সেরে আবার তারা রওনা হলো; কিন্তু ঘুর্ণাক্ষরেও কেউ টের পেল না, যে, উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ﵂ তাঁদের কাফেলার পেছনে বিশ্রামের জায়গায়ই রয়ে গেছেন! ভোরেই মদীনায় পৌঁছে গেল কাফেলা। উম্মুল মুমিনীনের উটকে নিয়ে বসানো হলো তাঁর ঘরের সামনের নির্দিষ্ট জায়গায়। খুব সাবধানে হাওদা নামানো হলো। আর, তখনই যেন বাজ পড়ল সবার মাথায়! হাওদায় নেই উম্মুল মুমিনীন!

রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীগণ পেরেশান হয়ে পড়লেন। এক অস্থির-অস্বস্তিতে সময়

[১] *তারীখু তাবারী* : ০৩/৬৭; *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/৩১০; *তাবাকাতু ইবনি সাদ* : ০২/৪৭।

কাটতে লাগল তাঁদের। কেউ গেল খুঁজতে; কোথায় হারিয়ে গেলেন রাসূলের প্রিয়তম মানুষটি! হঠাৎ দূরে একটি উট গোচরীভূত হলো সবার। উটের লাগাম ধরে এগিয়ে আসছেন যে-লোকটি, সবাই তাঁকে চেনে 'সফওয়ান ইবনু মুআত্তাল আস-সুলামী' নামে।

আয়িশাকে ভালোয় ভালোয় ফিরে পেয়ে রাসূল ﷺ নিশ্চিন্ত হলেন। এরপর তাঁর কাছ থেকে কারণসহ ঘটনার বিবরণ শুনে উপলব্ধি করলেন, এমনটি ঘটাই স্বাভাবিক ছিল। আয়িশার যবানেই শোনা যাক সেই ঘটনা—[১]

'বিশ্রামস্থল থেকে কাফেলা রওনা হওয়ার আগে আমি একটু নিজের প্রয়োজন সারতে বের হলাম। আমার গলায় ছিল হার। প্রয়োজন সেরে আসার সময় হারটি কখন গলা থেকে পড়ে গেল, টেরও পাইনি। নিজের জায়গায় ফিরে এসে গলায় হাত দিয়ে দেখি, হার নেই! এদিকে লোকেরা বিশ্রাম শেষে আবার রওনা হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে। আমি সেই জায়গায় ফিরে গিয়ে হারটি কিছুক্ষণ খুঁজেটুজে পেয়ে গেলাম।

'অপরদিকে, যিম্মাদার লোকেরা আমার উটের কাছে এসে হাওদা উঠিয়ে বেঁধে দিল। আমি খুবই হালকা গড়নের ছিলাম বলে হাওদায় আমার থাকা-না-থাকা একই রকম মনে হতো; তাই, ওরা বুঝতে পারেনি, যে, আমি হাওদায় নেই! তারা আমার উট নিয়ে চলে গেল। এরপরেই আমি সেখানে পৌঁছে দেখি, কেউ নেই, কিছু নেই—সব কেমন সুনসান নীরব। যেন কাফেলা চলে গেছে অনেক আগেই।

'এই দেখে, চাদর মুড়ি দিয়ে আমি নিজের জায়গায় শুয়ে পড়লাম; কারণ, আমার বিশ্বাস ছিল, আমাকে খুঁজে না-পাওয়া গেলে ঠিকই এখানে কাউকে পাঠানো হবে। আমি শুয়ে থাকলাম। এরই মধ্যে সফওয়ান ইবনু মুআত্তাল ﷺ সেখানে পৌঁছুলেন। তিনি তাঁর কোনো প্রয়োজনে কাফেলার পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দূর থেকে কাউকে শুয়ে থাকতে দেখে কাছে আসতেই আমাকে দেখে ফেললেন। আর, আমার ওপর পর্দা ফরয হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন; তাই, আমাকে চিনতে পেরে তিনি বলে উঠলেন—"ইন্না

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৪১৪১, ২৬৬১; *মুসলিম* : ৬৯১৩।

লিল্লাহ, রাসূলের স্ত্রী! আপনি কী করে পেছনে রয়ে গেলেন?”

‘আমি তাঁকে কোনো উত্তর দিইনি। তিনি উট আমার কাছে এনে একটু পেছনে সরে গিয়ে বললেন, “উঠুন।” আমি উঠে পড়লাম। আল্লাহর শপথ! আমরা কাফেলার নাগাল পাইনি; আবার, আমাকে খুব বেশি খোঁজাখুঁজিরও দরকার পড়েনি; কারণ, সকাল হতে-না-হতেই লোকেরা দেখতে পেল, আমার উটের লাগাম ধরে এগিয়ে আসছেন এক লোক (সফওয়ান ইবনু মুআত্তাল)।’

ঘরে পৌঁছে আয়িশা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু জেগে রইল পুরো মদীনা। ব্যাপার হলো, হামেশাই যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে নিজেদের ঘৃণ্য বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের বিষ নিয়ে প্রস্তুত থাকত—যাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনি সালূল—ইহুদী ও মুনাফিকদের এমন একটা চক্র এই ঘটনাকে নিজেদের উপযুক্ত উপাদান হিসেবে লুফে নিল এবং মনের সমস্ত দ্বেষ, ক্ষোভ ও ঘৃণা উগড়ে দিয়ে এমন অশালীন এক অলীক-গল্প তৈরি করল, জগতশ্রেষ্ঠা মহামানবী আয়িশার ক্ষেত্রে কোনো সভ্য মানুষের কল্পনার ধারেকাছেও যা আসতে পারে না! হায়, তবু যদি এতে ওদের হিংসা ও দ্বেষের অনল কিছুটা হলেও স্তিমিত হতো!

ইবনু সালূলের ঘর থেকে একে একে সেই অশালীন নীল-গল্প ছড়িয়ে পড়ল মদীনার ঘরে ঘরে। দুঃখজনকভাবে, কতক সত্যিকার মুসলিমও না-বুঝেই সেই গল্পের ফাঁদে পড়ে গেলেন। আর, বোকামি করে লোকজনের কাছে তা বলাও শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রাসূলের কবি—হাসসান ইবনু সাবিত, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু’র আত্মীয় ও অনুগ্রহধন্য মিসতাহ ইবনু আসাসা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফুর মেয়ে ও স্ত্রী যাইনাবের বোন হামনা বিনতু জাহশ!

ঘটনা রাসূলের কানে চলে গেল। আবু বকর আর উম্মু রূমানেরও শোনার বাকি রইল না সেই অশ্রাব্য ও অকল্পনীয় গুজব। কিন্তু এঁদের কেউই এই ঘৃণ্য গল্প নিয়ে আয়িশার মুখোমুখি হতে পারলেন না; কারণ, সফর থেকে ফেরার পর হতেই আয়িশা ﵂ প্রচণ্ড অসুস্থতায় কাতরাচ্ছিলেন। এজন্য তাঁর সম্পর্কে কে কী বলছে—এর কিছুই তিনি শুনতে পাননি; টেরও পাননি।

তবে, একটি বিষয় তাঁর মনের মধ্যে খচখচ করছিল, মানসিক পীড়াও দিচ্ছিল,

যে, ইতিপূর্বে প্রতিটি অসুস্থতায় রাসূল ﷺ নিজের একান্ত স্নেহ-ভালোবাসার চাদরে যেমন ঢেকে রাখতেন, এইবার যেন তেমনটি দেখা যাচ্ছে না আর! এইবার শুধু তিনি বিভিন্ন সময়ে এসে পাশে বসে থাকা মাকে জিজ্ঞেস করেন, 'ও কেমন আছে?' এর বেশি আর কিছুই বলেন না! মনের এই উথালপাথাল অবস্থার বাস্তবতা যাচাইয়ের জন্য তাঁর কাছে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না আয়িশার। তিনি শুধু দেখতেন—রাসূল কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেছেন। সারাক্ষণ কেমন চিন্তিত, পেরেশান! তাঁর বোধ হলো—রাসূল নিশ্চয় বড় রকমের কোনো জটিল পেরেশানিতে পড়েছেন। নিজেকে শক্ত ও দৃঢ় রাখার জন্য আয়িশা মনকে বোঝাতে লাগলেন—আমার বিশাল আকাশ ঢেকে-ফেলা দুশ্চিন্তার এই কালো মেঘ, দুঃসময়ের এই অমানিশা একদিন ঠিকই দূর হয়ে যাবে। একদিন ঠিকই নিশ্চিন্ততার বার্তা নিয়ে উঠবে লাল সূর্য। বইবে মন-বারান্দায় সুখ-বিলানো ঝিরঝিরে হাওয়া। আয়িশার বক্তব্য—

'আমি আমার প্রতি রাসূলের একরকম মায়াহীনতা অনুভব করতে পেরে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অনুমতি পেলে আমি শুশ্রূষার জন্য মায়ের ঘরে চলে যেতে চাই।" রাসূল বললেন, "অসুবিধা নেই।" তখন আমি মায়ের কাছে চলে গেলাম। বাইরের "ঝড়-তুফান" সম্পর্কে তখনও কোনো খবর ছিল না আমার। বিশ-বাইশ দিন পর আমার ব্যথা সেরে গেলে, এক রাতে আমি মিসতাহর মায়ের সঙ্গে—যিনি ছিলেন আবু রহম ইবনু মুত্তালিব ইবনি আবদি মানাফের কন্যা; এবং তাঁর মা ছিলেন আবু বকরের খালা—একটু প্রয়োজন সারতে বের হলাম। পাশাপাশি হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর চাদরে পা লেগে আমি হোঁচট খেলাম। তখন তিনি বললেন, "মিসতাহ ধ্বংস হোক!" আমি বললাম, "ছি, এটা তো ভালো কিছু হলো না। আপনি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন মুহাজির সাহাবীর ব্যাপারে কী বললেন এটা!" তিনি বললেন, "আরে, ও আবু বকরের মেয়ে, তুমি কি ঘটনা কিছুই শোনোনি?" বললাম, "কী ঘটনা?" তখন তিনি পুরো ঘটনা বলতে শুরু করলেন।

'আল্লাহর কসম! তাঁর কথাগুলো শুনে আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারছিলাম না। প্রয়োজন না-সেরেই আমি ঘরে ফিরে আসলাম। মনে হচ্ছিল—কষ্টে, কান্নায় যেন আমার কলিজা ফেটে যাবে! আমি মাকে বললাম, "আল্লাহ

আপনাকে ক্ষমা করুন, লোকেরা যা বলার, বলেছে; কিন্তু আপনিও আমার কাছে বিষয়টা গোপন করলেন? কিছুই জানালেন না আমাকে?" মা বললেন, "বেটি, ব্যাপারটি সহজভাবে নাও। আল্লাহর কসম! স্বামীর ভালোবাসায় সিক্ত কোনো সুন্দরী রমণীর সতীনেরা, বা, আশপাশের লোকেরা তার বদনাম করবে না—এমনটা খুব কমই হয়।"'

কিন্তু আয়িশার অশ্রু কি আর এই সাধারণ কথায় থামে? সারারাত চলে গেল, আয়িশা পড়ে রইলেন অশ্রুসিক্ত, নির্ঘুম।

আয়িশা তো দূর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একই কষ্ট-পেরেশানিতে সময় পার করছিলেন। তাঁর মন বলছিল—আয়িশা নিশ্চয় এক অন্যায় ও জঘন্য অপবাদের শিকার। সারাক্ষণ তিনি উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন—মিথ্যার গন্ধ-ছড়ানো সেই গুজবী-হাওয়া এখন কোন দিকে বইছে। একপর্যায়ে তিনি মানুষের সামনে কথা বলার জন্য দাঁড়ালেন। মহান রবের স্তুতি ও প্রশংসাবাক্য পাঠ করে তিনি বললেন, 'লোকসকল! কিছু লোক আমার পরিবারের ব্যাপারে অন্যায় কথা বলে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে কেন? তাদের কী হয়েছে? আল্লাহর কসম! আমি তো আমার পরিবারের ব্যাপারে ভালো কথাই জানি। তারা এমন এক পুরুষকে জড়িয়ে কথাগুলো বলছে, যার ব্যাপারে কোনো খারাপ কথা আমার জানা নেই। সে তো আমার কোনো ঘরে প্রবেশ করলে আমার সঙ্গেই প্রবেশ করে।'

তাঁর কথা শুনে, তাঁর বেদনা ও অন্তর্দাহ অনুভব করতে পেরে, মুসলিমদের হৃদয়গুলো ভেঙে খানখান হয়ে গেল। এক মহিমান্বিত সম্ভ্রান্ত নারীর ইজ্জত-আব্রুর জন্য তাঁদের ক্ষোভ জ্বলে উঠল। তাঁদের কণ্ঠে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হতে লাগল প্রতিশোধ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি।

এই ঘটনার কথা তখনও আয়িশার গোচরীভূত হয়নি। আয়িশা বলেন, 'রাসূল ﷺ হযরত আলী ও উসামা ইবনু যাইদকে ডাকালেন এবং তাঁদের কাছে এ-ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। তো, উসামা আমার প্রশংসা করে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তো আপনার স্ত্রী। তাঁর ব্যাপারে আমরা সবাই ভালোই তো জানি। এখন যা শোনা যাচ্ছে, তা সবই মিথ্যা ও বানোয়াট।" আর, আলী বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলার তো অভাব নেই। আপনি তো চাইলেই তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারেন। তবে, আপনি বাঁদির কাছে জিজ্ঞেস করলে, সে

আপনাকে সত্যটা বলবে।" রাসূল ﷺ আমার বাঁদি বারীরাহকে ডাকলেন। আলী তাঁকে কড়া স্বরে বললেন, "রাসূলের কাছে সত্য বলবে।" তখন সে বলতে শুরু করল, "আল্লাহর কসম! আমি তো তাঁকে ভালোই জানি। আমার চোখে তাঁর কোনো দোষ ধরা পড়েনি। শুধু এটুকু বলা যায়, যে, আমি আটার খামিরা করে তাঁকে সেটা হেফাজত করতে বলতাম। কিন্তু তিনি সেটা রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন আর বকরি এসে তা খেয়ে ফেলত।"'

রাসূল ﷺ তবু যেন কোনো কুল খুঁজে পেলেন না। ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিধ্বস্ত ও চিন্তাক্লিষ্ট মন নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। কিছু সময় পরে আবু বকরের ঘরে ফিরে এসে দেখলেন—বেদনা-ভারাক্রান্ত আয়িশা কেঁদেই চলেছেন। তাঁকে দেখতে আসা এক আনসারী নারীও কাঁদছেন এ-জন্য। মলিনমুখে তার দিকে চেয়ে আছেন তাঁর বাবা-মা। অপবাদের রটনা প্রচার হওয়ার পরে, এই প্রথমবারের মতো রাসূল গিয়ে আয়িশার পাশে বসলেন। তাঁকে বললেন, 'আয়িশা, মানুষের কথাবার্তা তো তুমি শুনেছই! এমন কিছুর কাছাকাছিও হয়ে থাকলে, তুমি আল্লাহর নিকট তাওবা করো। আল্লাহ্ তো তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন।'

এই কথা শুনে তো প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেলেন আয়িশা। তাঁর অশ্রু থেমে গেল। তীব্র হীম বাতাসে যেন শরীরের সব রক্ত জমাট বেঁধে গেল। রাসূলের কথার ভয়াবহ্ ইঙ্গিত বুঝতে তাঁর মোটেও দেরি হলো না। তিনি জবাব দিতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। অপারগ হয়ে বাবা-মার দিকে তাকালেন তাঁর পক্ষ থেকে নবীজিকে জবাব দেওয়ার জন্য; কিন্তু হতাশ হয়ে তিনি দেখলেন—জবাব দেওয়ার কোনো চেষ্টাই তাঁরা করছেন না। দুঃখে, ক্ষোভে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনারা কি জবাব দেবেন না?' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর কসম! কী জবাব দেব, বুঝতে পারছি না!'

এই শুনে দুচোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল আয়িশার। যেন অশ্রুর এই ঢলই তাঁর বিস্ফোরণোন্মুখ ক্ষোভকে অনেকটা স্তিমিত করে দিল। এরপর স্বামীর দিকে মুখ করে তিনি বললেন, 'কসম আল্লাহর! আপনি যা বললেন, এমন কোনো কিছু থেকে তো আমি কক্ষণই তাওবা করব না; কারণ, আমি নিশ্চিতভাবেই জানি, যে, মানুষের এই অপবাদ আমি স্বীকার করে নিলে—অথচ আল্লাহ সাক্ষী, আমি এথেকে সম্পূর্ণ মুক্ত—সেটা এক নির্জলা অবাস্তব

বিষয়ের স্বীকারোক্তিই হবে শুধু। পক্ষান্তরে, আমি তাদের অভিযোগ অস্বীকার করলে, আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আমি বরং হযরত ইউসুফের বাবার মতো করে বলব—ধৈর্যই উত্তম; তোমরা যা বলছ, সে-ব্যাপারে আল্লাহই আমার সাহায্যকর্তা।'

এটুকু বলে আয়িশা চুপ হয়ে গেলেন।[১] এর খানিক বাদে সেই মজলিসেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহী নাযিল হওয়ার আলামত দেখা দিল। তাঁকে একটি কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত করে দেওয়া হলো। চামড়ার একটি বালিশ তাঁর মাথার নিচে দেওয়া হলো। ওদিকে দুশ্চিন্তা, আর, পেরেশানিতে মা-বাবা দুজনের যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল; কিন্তু আয়িশা বসে রইলেন নিশ্চিন্ত, নির্ভিক; কারণ, তাঁর তো জানা ছিল, যে, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ, আর, তাঁর রব তাঁর প্রতি অবিচার করবেন না কখনোই। একটু পরে রাসূল তাঁর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে উঠে বসলেন, আর, বললেন, 'আয়িশা, সুসংবাদ! আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা ও নিষ্কলুষতার কথা নাযিল করেছেন।'

রাসূলের কথা শুনে আবু বকর এমনভাবে শ্বাস নিলেন, যেন এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। আনন্দে যেন লাফিয়ে উঠলেন উম্মু রূমান। ইশারায় আয়িশাকে তাঁর স্বামীর প্রতি দাঁড়িয়ে সম্মান ও শোকর জানাতে বললেন। কিন্তু অভিমানী কণ্ঠে তখন আয়িশা বললেন, 'আমি তাঁর জন্য দাঁড়াব না, কসম আল্লাহর! আমি তো কেবল আল্লাহরই প্রশংসা করব; কারণ, তিনিই আমার নির্দোষিতার কথা অবতীর্ণ করেছেন।'

এরপর আয়িশা তাঁর বাবার দিকে তাকালেন। বাবা—আবু বকর কাছে এসে তাঁর কপালে চুমু খেলেন। বাবার চোখ থেকে ঝরছে তখন আবেগের শিশির, সুখের অশ্রুকণা। কন্যা পিতাকে বললেন, 'বাবা, আপনি আমার পক্ষে কথা বলেননি কেন?' পিতা বললেন, 'যা আমার জানা নেই, তা বললে, কোন আসমান আমাকে ছায়া দিত? কোন যমীন আমাকে ঠাঁই দিত তার বুকে?' রাসূল ﷺ তখন মুগ্ধতা, আবেগ, আর মায়াময় ভালোবাসা নিয়ে তাকিয়ে আছেন প্রিয়তমার দিকে। তাঁর চোখের তারায় ভেসে উঠছে অন্যায় অপবাদের শিকার হওয়া প্রিয়তমার সেই বেদনাভরা গল্প-ছায়া, দুঃসময়ের একেকটি অসহনীয়

[১] *আস-সিমতুস সামীন* : ৬৭; *তারীখু তাবারী* : ০৩/৬৭।

মুহূর্তের করুণ-চিত্র।

এরপর তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে গেলেন। আর, মানুষের সামনে তিলাওয়াত করলেন সদ্য অবতীর্ণ পাক কালামের আয়াত; সূরা নূরের যেই আয়াতগুলোতে মহামহিম রব তাঁর প্রিয় বান্দীর নূরমাখা সফেদ চরিত্রের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। রাসূল ﷺ পড়লেন—

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

'যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু আছে, যতটুকু সে গুনাহ করেছে; আর, তাদের মধ্যে যে এ-ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। তোমরা যখন এ-কথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করোনি এবং বলোনি যে, এটা

তো নির্জলা অপবাদ? তারা কেন এ-ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? অতঃপর, যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে, তজ্জন্য তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত। যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে; এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল। তোমরা যখন এ-কথা শুনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়! আল্লাহ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন—তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনো পুনরায় এ-ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি কোরো না। আল্লাহ তোমাদের জন্য কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।'[১]

এরপর, যারা এই অশালীন কথাবার্তা জনে জনে বলে বেড়িয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলার আদেশ মুতাবিক বেত্রাঘাত করা হলো; কারণ, আল্লাহ বলেছেন—

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত করবে; এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান।'[২]

---

[১] সূরা নূর : ১১-১৯।
[২] সূরা নূর : ০৪।

রচিত হলো এক সুদৃঢ় বন্ধন

সব আঁধার কেটে গেল। মেঘশূন্য আকাশ হেসে উঠল আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার আনন্দ-সূর্যের সোনালি আভায়। আয়িশা ফিরে এলেন তার চিরচেনা প্রেমকাননে; মুহাম্মাদী আলো-হাওয়ারা যেখানে অহোরাত্রি প্রতীক্ষায় ছিল তাঁর। আয়িশা এবার যেন এক নতুন মেহমান হয়ে পা রাখলেন নবীগৃহে। সচ্চরিত্রের আসমানী সনদ, আর, সমগ্র সত্তাকে ঘিরে রাখা কুরআনী আয়াতের আলোকবলয়ের মধ্য দিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন প্রিয়তমের ঘরে। তাঁর নিষ্কলুষ পবিত্রতার কথা মহামহিম রব এমনভাবে জানিয়েছেন, যে, কিয়ামাত-তক মুসলিমেরা সেই কথাগুলো পাঠ করে যাবে অনন্য পুণ্যকর্মরূপে।

আয়িশা ﷺ তাঁর কীর্তিময় দাম্পত্য-জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। নিজের তারুণ্য, প্রীতিপূর্ণ আচরণ, আর প্রিয়তমের বিশেষ প্রেমময়তা অর্জনের গর্ব নিয়ে তিনি জীবনের নয়া দহলিজে এসে বসলেন। তাই, এর পরবর্তী সময়ে সতীনদের ওপর গর্ব করে তিনি বলতেন—'স্বামীর কাছে আমার চেয়ে প্রভাবশালী, আর, মর্যাদাবান কেউ কি আছে?' স্বামীর সেই প্রিয় উক্তিটি আবৃত্তি করতেন খুবই গর্বের সঙ্গে—'আয়িশা! আমার হৃদয়ে তোমার ভালোবাসা এক সুদৃঢ় বন্ধনের মতো মজবুত হয়ে আছে।'

আমর ইবনুল আস ﷺ বলেন, 'আমি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?"

'তিনি বললেন, "আয়িশা।"

'আমি বললাম, "পুরুষদের মধ্যে কে?"

'তিনি বললেন, "আয়িশার বাবা।"

'আমি বললাম, "তারপর?"

'তিনি বললেন, "উমর।"' [১]

আয়িশা ﷺ নিজেই বর্ণনা করেন, 'একবার রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, "তুমি কখন আমার প্রতি খুশি থাক আর কখন রাগ করে থাক তা আমি বুঝতে পারি।"

---

[১] *বুখারী* : ৩৬৬২, ৪৩৫৮; *মুসলিম* : ৬০৭১; *তিরমিযী* : ৩৮৮৫।

আমি বললাম, "কীভাবে বোঝেন?" তিনি বললেন, "তুমি খুশি থাকলে কথার মধ্যে বলো 'মুহাম্মাদের রবের কসম', আর রাগ থাকলে বলো 'ইবরাহীমের রবের কসম।'" আমি বললাম, "হ্যাঁ, সত্যিই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে, আমি কিন্তু সেসময় আপনার নামটিই শুধু বাদ দিই; অন্য আর কিছু করি না!"'[১]

আর, উম্মু যারা'র হাদীস তো প্রসিদ্ধ। যার সার হলো—

১১জন নারী একত্রে নিজেদের স্বামীদের ব্যাপারে গল্প করতে বসে। প্রথমেই তারা প্রতীজ্ঞাবদ্ধ হয়, যে, তাদের সঙ্গে স্বামীদের কোনো আচরণই তারা গোপন করবে না। তো, প্রত্যেকেই নিজের স্বামী ও তার মা-বাবা সম্পর্কে গল্প করে। এদের মধ্যে একজন ছিল উম্মু যারা (যারা'র মা)। সে তার স্বামী আবু যারা (যারা'র বাবা) সম্পর্কে বলতে গিয়ে অত্যুচ্চ প্রশংসা করে; তার সদাচার, উদারতা ও চরিত্র-মাধুর্য সম্পর্কে দিল খুলে চমৎকার সব শব্দ-বাক্যে স্তুতি গায়। তো, পুরো ঘটনা শুনে রাসূল ﷺ আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেন, 'উম্মু যারা'র জন্য আবু যারা যেমন, তোমার জন্য আমিও তেমন।'[২]

বিদায়

ইফকের ঘটনার পরবর্তী কয়েক বছর বেশ বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। সে-সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা ও গৌরবের পতাকা চারদিকে উড়তে শুরু করেছে পতপত করে। আয়িশা ﷺ সেগুলো উপভোগ করতেন। একের পর এক যুদ্ধ থেকে নবীজি ফিরতেন বিজয়ীবেশে; আয়িশা ﷺ তখন নবীজির প্রেমপূর্ণ আহ্বানের প্রতীক্ষায় থাকতেন—আনন্দে যেন আকাশে উড়াল দেবেন; আবার, কী করবেন, তা ভেবে না-পেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে আসতেন। তিনি যেন তখন হয়ে যেতেন ভোরের শত-সহস্র আলোকণা—যা রাতের আঁধার হটিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বিপুল বিস্তৃত পৃথিবীতে।

এরপর, এক মহা কর্মমুখর, সংগ্রামী ও জিহাদী জীবনের অস্ত যাওয়ার সময় হলো। রিসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায়ের পর রাসূল ﷺ এসে দাঁড়ালেন পার্থিব জীবনের শেষ সিঁড়িটিতে। দশম হিজরীর শেষাংশে তিনি রাসূল হিসেবে

[১] *বুখারী* : ৫২২৮; *মুসলিম* : ৬১৭৯।
[২] *বুখারী* : ৫১৮৯; *মুসলিম* : ৬১৯৯।

প্রথম ও শেষ হজ সম্পাদন করে মদীনায় ফিরে এলেন। কদিন না-যেতেই সফর মাসের শেষ দিকে এক রাতে তিনি নির্ঘুম থাকলেন, মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা, এই অবস্থায়ই বাকী কবরস্তানে গেলেন সেখানে 'ঘুমন্ত' প্রিয়জনদেরকে সালাম পেশ এবং তাঁদের জন্য ইস্তিগফার করতে।

সকালে ফিরে আসার সময় আয়িশাকে দেখলেন—'আমার মাথা গেল রে' বলে বলে কাঁদছেন, আর, ব্যথায় কাতরাচ্ছেন। তিনি কাছে গিয়ে সমবেদনা প্রকাশ করে বললেন, 'আয়িশা! বরং আমি আর আল্লাহও তোমার সঙ্গে বলি, উফ! মাথা গেল রে!'

কিন্তু আয়িশার কাতরতা থামছিল না। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে মায়া করে বললেন, 'আরে, তোমার পেরেশানি কী? তুমি যদি আমার আগে ইন্তিকাল করো, তাহলে আমিই তোমার সবকিছুর ব্যবস্থা করব—আমিই তোমাকে কাফন পরাব; আমিই তোমার জানাযা পড়াব; এবং আমিই দাফন করব তোমার লাশ।'

এই কথা শুনে আয়িশার চিন্তা চলে গেল আরেক দিকে। বিস্ফোরণোন্মুখ ঈর্ষায় জ্বলে উঠে তিনি বললেন, 'এমন ভাগ্য আমার না-হয়ে অন্য কারও হোক। আল্লাহর শপথ! আমি তো দিব্যি দেখতে পাচ্ছি, যে, আপনি আমাকে এমনটা করতে পারলে, এরপরেই আমার ঘরে ফিরে আরেক স্ত্রীকে নিয়ে সেখানেই বাসর করবেন।' [১]

আয়িশার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমণ্ডলে হাসির ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্য নিজের মাথাব্যথাও ভুলে গেলেন তিনি। সেখান থেকে উঠে অন্য স্ত্রীদের ঘরের দিকে রওনা হলেন। একটু পরেই আগের চেয়ে আরও প্রচণ্ডভাবে তাঁর মাথাব্যথা অনুভূত হতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে তিনি মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরের কাছে পৌঁছুতেই দেখলেন—ব্যথার তীব্রতা সহ্যসীমা ছাড়িয়ে গেছে। তিনি পাশে দাঁড়ানো সব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কাতরকণ্ঠে বললেন, 'আমি আগামীকাল কার ঘরে থাকব? এর পরদিন কার ঘরে থাকব?' অবস্থায় সবাই বুঝতে পারছিলেন, যে, তিনি আয়িশার ঘরে থাকতে চান; কিন্তু তাঁর ঘরে থাকার পালা আসতে অনেক দেরি; এ-জন্যই কবে-কোথায় থাকবেন, তা জানতে চাইছেন। তো, তাঁর এই মনোভাব বুঝতে

[১] *আস-সিমতুস সামীন* : ৫৫; *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/২৯২; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১৯১।

পেরে তাঁরাও তাঁকে তাঁর পছন্দের জায়গায় রেখে সেবা দেওয়া ভালো মনে করলেন। তাই, সবাই একত্রে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা নিজেদের পালার দিনগুলো আয়িশার জন্য দিয়ে দিলাম।'[১] রাসূল ﷺ বললেন, 'আবু বকরকে বলো, মানুষের সালাতের ইমামতি করতে।'

এরপর তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে চলে গেলেন। আয়িশাও জগতের সবচেয়ে মায়াময় মানুষটির সেবায় বিনিদ্র রজনী কাটালেন। তিনি তো চাইছিলেন—প্রাণের বিনিময়েও যদি লাঘব করা যেত সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মানুষটির সামান্য ব্যথা, খুব সামান্য বেদনা...

কিন্তু তাঁর সময় চলে এসেছিল। আয়িশার কোলে মাথা রেখে তিনি শুয়েছিলেন। সেই শোকাবহ মুহূর্তটির বর্ণনা আয়িশা দিয়েছেন এভাবে—

'আমার মনে হলো, কোলের মধ্যে রাসূলের মাথা মুবারক ভারি হয়ে যাচ্ছে। আমি তাঁর চেহারার দিকে তাকালাম। দেখলাম—তাঁর চোখ বড় হয়ে গেছে। তিনি বলছেন—"আমি বরং সবচেয়ে বড় বন্ধুর সান্নিধ্য চাই।" আমি বললাম, "কসম তাঁর, আপনাকে যিনি সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! রবের তরফ থেকে আপনাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। আপনিও বেছে নিয়েছেন তাঁকে।" এরপরেই রাসূল এই জগতবাসীকে বিদায় জানিয়ে পাড়ি জমান পরপারে। তাঁর মাথা তখন আমার বুক ও কণ্ঠনালীর মধ্যবর্তী স্থানে হেলান দেওয়া ছিল। হায়, আমি যদি তাঁকে রেখে দিতে পারতাম! আমি কোনোমতে তাঁর মাথা মুবারক একটি বালিশে রেখে উঠলাম; এরপরই আমাকে ভাসিয়ে নিল শোকের মাতম।'[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পরেই এক মহা ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বিশেষ রহমে মুসলিমদেরকে তা থেকে হেফাজত করেছেন। হযরত আবু বকরের মনে তাঁর করণীয় বিষয়টি আল্লাহ জাগিয়ে দিয়েছেন, ফলে, আবু বকর মুসলিমদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'লোকসকল! রাসূল মুহাম্মাদের কোনো পূজারি থাকলে সে জেনে রাখুক, যে, তিনি ইন্তিকাল করেছেন। আর, আল্লাহর ইবাদাতকারী জেনে

[১] *মুসলিম* : ২৪৪৩; *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/২৯২; *আস-সিমতুস সামীন* : ৫৫। *তারীখু তাবারীতে* (০৩/১৯১) আছে, যে, রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন হযরত আয়িশার ঘরে থাকার জন্য; তাঁরা তাঁকে সানন্দে অনুমতি দিয়েছিলেন।

[২] *বুখারী* : ১৩৮৯, ৪৪৪৯; *মুসলিম* ৬১৮৬; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১৬৭।

রাখুক, যে, তিনি চিরঞ্জীব; তাঁর মৃত্যু নেই।' এরপর তিনি আয়াত তিলাওয়াত করলেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝

> *'মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল মাত্র। তাঁর আগেও বহু রাসূল গত হয়েছেন। তিনি ইন্তিকাল করলে, বা, শহীদ হয়ে গেলে কি তোমরা তোমাদের পেছনে (কুফর ও শিরকে) ফিরে যাবে? যে তার পেছনে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর, আল্লাহ্ অতি শিগগির শুকরগুজারদের প্রতিদান দেবেন।'*[১]

আল্লাহর কসম! সেদিন আবু বকরের এই তিলাওয়াতের ফলে মানুষের এমন অবস্থা হয়েছিল, যেন তারা জানতই না, যে, এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল![২]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে নবীজি যেখানে ইন্তিকাল করেছিলেন, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। এরপরেই খলীফা হন আয়িশার বাবা আবু বকর আস-সিদ্দীক ﷺ।

এই সময়ে এসে হাদীস ও সুন্নাহর প্রথম শীর্ষ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন আয়িশা। ইসলামের প্রথম ফকীহর আসনও অলঙ্কৃত করেন তিনি।

ইমাম যুহরী বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব স্ত্রীর ইলমের সঙ্গে; বরং জগতের সমস্ত নারীর ইলমের সঙ্গে আয়িশার ইলমের তুলনা করলে, আয়িশার ইলমই শ্রেষ্ঠ ও বেশি হবে।'

হিশাম ইবনু উরওয়া তাঁর বাবার সূত্রে বর্ণনা করেন, 'ফিকহ, চিকিৎসা ও কবিতায় আয়িশার চেয়ে বেশি জ্ঞানী কাউকে আমি দেখিনি।'[৩]

---

[১] সূরা আলে ইমরান : ১৪৪।

[২] বুখারী : ১২৪১, ৪৪৫৪।

[৩] আল-ইসতীআব : ০৪/১৮৮৩; আল-ইসাবাহ : ০৮/১৪০।

একজন আরব নারী, বরং একজন মুসলিম নারীর প্রতি মানুষের ধারণার জগতে প্রবল আলোড়ন ও চমক সৃষ্টির জন্য এবং ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে ভূমিকা রাখার জন্যই যেন আয়িশা ﵂ বেঁচে ছিলেন দীর্ঘ একটা সময়। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ইন্তিকালের পর ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ অধ্যায়ের সূচনা হয়। সেসময়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বিরুদ্ধে এক যোদ্ধাবাহিনীর নেতৃত্বও দেন আয়িশা।

এরপর, জীবনের ৬৬টি কর্মমুখর, দীপিত ও সুরভিত বসন্ত পেরিয়ে আয়িশা ﵂ শেষবারের মতো ফিরে তাকান অগুনতি স্মৃতিতে ঠাসা এই জগতের দিকে। ভেসে ওঠে—মুসলিম জাতির দ্বীন, সমাজ ও শাসনক্ষেত্রের জন্য তাঁর রেখে আসা অসংখ্য অবদানের ছবি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখনিঃসৃত কয়েক হাজার[১] হাদীস যে মানুষকে শুনিয়ে গেছেন আয়িশা—শুধু এই কাজের জন্যই তো সশ্রদ্ধ সালামে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি।

সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকাল হয়েছিল ৫৭ হিজরীর সতেরই রামাদান মঙ্গলবার রাতে।[২] তাঁর জানাযার ইমামতি করেছিলেন আবু হুরাইরা ﵁। এরপর তাঁর ওসীয়ত মুতাবিক রাতের অন্ধকারেই জান্নাতুল বাকী কবরস্তানে তাঁর লাশ নিয়ে যাওয়া হয়। পেছনে পেছনে তখন সেই মহাযাত্রার সাক্ষী হয়েছিল শোকার্ত জনতার মাতমের মিছিল। রাতের জানাযায় এত মানুষ আর কখনও দেখা যায়নি।

অন্য উম্মুল মুমিনীনগণের পাশেই[৩] রচনা করা হয় তাঁর পরজাগতিক সফরের প্রথম মনযিল।

সহীহ বুখারীতে এসেছে, যে, আয়িশা ﵂ নিজের বোন আসমার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ওসীয়ত করেছিলেন, যে, তাঁকে যেন তাঁর সঙ্গিনীদের (নবী-পত্নীদের) সাথেই দাফন করা হয়।

তাঁকে শেষ বিছানায় রাখতে কবরে নেমেছিলেন পাঁচজন মহান ব্যক্তিত্ব। দুই

---

[১] এর মধ্যে দুই হাজার একশ' দশটি হাদীস আছে কুতুবে সিত্তায়।

[২] *তারীখু তাবারী* : '৫৮ হিজরী সনের ঘটনাবলি'। *আস-সিমতুস সামীন* : ৮২; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৮৮৫।

[৩] তাঁর কবর সম্পর্কীয় আরও তথ্যের জন্য দেখুন *ওয়াফাউল ওয়াফা* : ০৩/৯১৩।

ভাগ্নে—বোন আসমার ছেলে আবদুল্লাহ ও উরওয়া, তিন ভাতিজা—ভাই মুহাম্মাদের ছেলে কাসিম ও আবদুল্লাহ, আর, ভাই আবদুর রহমানের ছেলে আবদুল্লাহ। এই পাঁচজনের প্রত্যেকেই আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন।[১]

জগতের সমস্ত সম্পর্ক ভুলে আয়িশা রওনা হয়ে যান এক অনন্ত জগতের পথে। একটু যদি পেছনে ফিরে তাকাতেন, দেখতেন—তামাম দুনিয়া হতবাক হয়ে তাঁর দিকেই চেয়ে আছে। ইতিহাস তাঁর শত মুগ্ধতা, বিস্ময়, আর, অতলস্পর্শী অনুসন্ধানের চোখ নিয়ে চষে ফিরছে তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত; সেই ছ' বছরের ছোট্ট খুকি থেকে শুরু করে বরকতপূর্ণ শাওয়ালের যেদিন তিনি শ্রেষ্ঠ মানবের প্রণয়-বন্ধনের সৌভাগ্য-পালক লাগিয়েছিলেন নিজের জীবনের ডানায়, তখন থেকে পরবর্তী ৬০ বছর যেই মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী, কীর্তিমুখর ও বিস্ময়কর আলোক-বলয়ের জীবন তিনি যাপন করেছেন, তার প্রতিটি মিনিট, সেকেন্ডও মুক্তোবিন্দুর মতো তুলে তুলে নিয়ে কোঁচড় পূর্ণ করছে জগত ও জগতের ইতিহাস।

[১] 'হযরত আয়িশার জীবনী' অধ্যায় : *তাবাকাতু ইবনি সাদ, আল-ইসতীআব, আল-ইসাবাহ, তাহযীবুত তাহযীব*।

কুরআন-সযত্নের মহীয়সী

হাফসা বিনতু উমর

> নবীজি ﷺ তাঁর কথা শুনে মুচকি হাসলেন। বললেন, 'শোনো উমর, হাফসাকে উসমানের চেয়েও উত্তম মানুষ বিয়ে করবে। আর, উসামানও বিয়ে করবে হাফসার চেয়ে উত্তম কাউকে।'
>
> [*আল-ইসাবাহ*]

বিধবা যুবতী

বদরযুদ্ধে বনু সাহম গোত্রের একজনমাত্র লোক অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই লোকটি ছিলেন মহান সাহাবী খুনাইস ইবনু হুযাফাহ আল-কুরাশী ﵁।[১] তিনি দুই দুইটি হিজরতে ধন্য হয়েছিলেন; হাবশার প্রথম হিজরত ও মদীনার হিজরত। উহুদযুদ্ধেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। এরপর সেখানে আহত হয়ে শয্যাশায়ী হন; এবং সেই আঘাতের জেরেই ইন্তিকাল করেন। যুদ্ধাহত খুনাইস তো জান্নাতে চলে যান, কিন্তু বিধবা করে রেখে যান একমাত্র যুবতী স্ত্রীকে—হাফসা বিনতু উমর ইবনিল খাত্তাব। রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিধবা হওয়া মেয়েকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান উমর। বৈধব্য তো ওর যৌবন শেষ করে দেবে, দিন দিন ওকে দুর্বল-নিস্তেজ করে দেবে, ওর

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/০৬, ৩৪১; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১৭৭; 'খুনাইসের জীবনী অধ্যায়' : *তাবাকাতু ইবনি সাদ, আল-ইসতীআব, আল-ইসাবাহ*। ওয়াফাউল ওয়াফা : ০৩/৯০০। খুনাইসের নাম অনেকে লেখেন 'হিসন'; এটা ভুল। এর জন্য দেখুন—'বনু সাহমের বংশ' অধ্যায় : *জামহারাতুল আনসাব* : ১৫৬; *আল-মুহাব্বার* : ৮৩; *নাসাবু কুরাইশ* : ৪০২।

প্রাণচাঞ্চল্য আর উচ্ছলতা হারিয়ে যাবে বৈধব্যের ঝড়ে—এ চিন্তায়ই যেন শেষ হয়ে যান উমর। যখনই ঘরে ঢুকে বিষণ্ণ চিন্তিত মেয়ের মুখটি দেখেন, তখনই যেন নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারেন না। অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে তাঁর মনে হলো, যে, মেয়েকে আবার বিয়ে দেওয়াটাই হতে পারে সবচেয়ে ভালো সমাধান। ছ'মাসেরও বেশি সময় কেটে গেছে। হাফসা ﷺ এর মধ্যে স্বামীর শোক অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন।

উমর ﷺ প্রথমেই আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কথা ভাবলেন। সেই আবু বকর, যিনি রাসূলের সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু ও শ্বশুর। ভাবতে যেন সত্যিই ভালো লাগছিল উমরের—বয়সের ভার, চরিত্রের মাধুর্য ও কোমল স্বভাবের এক অন্যরকম মানুষ আবু বকর; অপরদিকে, হাফসা তাঁর বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন কড়া মেজায ও প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধ; আবার, বৈধব্যের কঠিন পরীক্ষায় বিরক্তি ও অবসাদও তাঁকে গ্রাস করেছে। এমন দুইরকম মানস ও চরিত্রের মিশেলে তাঁদের জুটিটা সুন্দরই হবে। মোটকথা, রাসূলের সবচেয়ে নিকটতম মানুষটিকে জামাতা বানানোর ভাবনায় খুশি হয়ে উঠল উমরের মন।

এরপর এক মুহূর্তও দেরি করলেন না উমর। ছুটে গেলেন আবু বকরের কাছে। তাঁকে হাফসার সার্বিক অবস্থা শোনালেন। তিনিও খুবই অনুরাগ ও সমব্যথা নিয়ে সব কথা শুনলেন। একপর্যায়ে উমর তাঁর কাছে হাফসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। উমর মনে মনে নিশ্চিত ছিলেন, যে, আবু বকর তো এমন একজন পরহেযগার যুবতীকে স্বাগত জানাবেনই, যাঁর বাবার মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামের মর্যাদার ঝান্ডা উত্তোলন করেছেন। কিন্তু কী হলো? উমরের আশার আকাশে কালো মেঘ ছড়িয়ে দিয়ে আবু বকর চুপ করে রইলেন। কোনো জবাবই দিলেন না!

উমর খুবই কষ্ট পেলেন। তাঁর বন্ধুসম আবু বকর হাফসার মতো কনের বাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন—এটা যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না তাঁর। ভারাক্রান্ত মনে তিনি উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ঘরের দিকে রওনা হলেন। উসমানের স্ত্রী ছিলেন সাইয়্যিদা রুকাইয়া বিনতু রাসূলিল্লাহ।[১] হাবশার

[১] রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনী সম্পর্কে দেখতে পারেন লেখিকার বই '*নবী-তনয়া*'।

হিজরত থেকে ফেরার পরে, বদরযুদ্ধ চলাকালীন হাম রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন রুকাইয়া। মুসলিমরা যুদ্ধে জয় লাভের পরেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

তো, উসমানের কাছে হাফসার কথা আলোচনা করলেন উমর। একটু আগে আবু বকরের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যানের অপমানবোধে পুড়ছিলেন তিনি। বহু কষ্টে কষ্ট সংবরণ করে রেখেছিলেন। ভাবছিলেন—হয়তো উসমানকেই হাফসার জন্য নির্বাচিত করবেন আল্লাহ তাআলা; কারণ, তিনিই তো হাফসার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মানুষটির খবর জানেন। উমরের ভাবনায় ছেদ পড়ল। উসমান বললেন—'আমি ক'দিন ভেবে-চিন্তে জবাব দিতে চাই।' উমর মেনে নিলেন। ফিরে এলেন ঘরে। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে উসমান এসে বললেন, 'আমি এখন বিয়ে করতে চাচ্ছি না।'[১] তাঁর কথা শুনে উমর যেন আর নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। উপায় না-পেয়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁর দুই সাথীর ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে রওনা হলেন।

তিনি ভেবেই পাচ্ছিলেন না, যে, হাফসার মতো একজন যুবতী, পরহেযগার ও বংশমর্যাদার অধিকারিণী মেয়েকে কীভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায়! আবার প্রত্যাখ্যানকারী কারা? রাসূলের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রেও সংশ্লিষ্ট দুই মহান সাহাবী আবু বকর ও উসমান! মুসলিমদের মধ্যে এঁরাই তো উমরের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি বোঝার কথা। উমরের রিশতা পছন্দ করার এঁরাই তো বেশি হকদার!

উমর রাসূলের ঘরের সামনে গিয়ে অনুমতি চাইলেন। ক্ষোভে অপমানে তখন যেন তাঁর ফেটে পড়ার উপক্রম। একটু পরেই রাসূল ﷺ বেরিয়ে এলেন মায়ামাখা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায়। সামনে এসে উমরকে তাঁর দুঃখ-ব্যথা ও অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উমরও নিজের কষ্ট-হতাশার কথা নবীজিকে সবিস্তারে খুলে বললেন। আবু বকর ও উসমানের এমন আচরণ মেনে নিতে না-পারার কথা জানালেন।

নবীজি তাঁর কথা শুনে মুচকি হাসলেন। বললেন, 'শোনো উমর, হাফসাকে উসমানের চেয়েও উত্তম মানুষ বিয়ে করবে। আর, উসামানও বিয়ে করবে

[১] এই বর্ণনার সূত্র হলো—*আল-ইসতীআব* : ০৪/১৮১১; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/৫১; *উয়ূনুল আসার* : ০২/৩০২। আর, *আস-সিমতুস সামীনে* (৮৩) আছে—উমর ﷺ হাফসার জন্য প্রথমে উসমানকে, এরপর আবু বকরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) প্রস্তাব দেন।

হাফসার চেয়ে উত্তম কাউকে।'[১]

উমর যেন হঠাৎ হোঁচট খেলেন। সামলে উঠে ভাবতে লাগলেন, উসমানের চেয়ে উত্তম মানুষ হাফসাকে বিয়ে করবে? কে সে? মনের মধ্যে পলকেই ঝিলিক দিলো—সেই মানুষ কি রাসূল নিজেই? আল্লাহু আকবার! এতটা উচ্চাশা তো কল্পনায়ও ছিল না!

খুশিতে উৎফুল্ল উমর রাসূলের সঙ্গে 'স্বাগত-মুসাফাহা' করলেন। এরপরেই, মেয়েকে কনে সাজিয়ে প্রস্তুত করতে রওনা হয়ে গেলেন দ্রুত। আনন্দে যেন হাওয়ায় উড়ছিলেন উমর। মন চাইছিল—তক্ষুণি গিয়ে আবু বকর ও উসমানকে খবরটা দিয়ে আসেন; বরং পুরো মদীনাবাসীকেই এই মহাখোশখবর শোনানোর ব্যাকুলতা জেগে উঠল তাঁর বুকে।

পথে নামতেই আবু বকরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আবু বকরও উমরের দিকে তাকিয়ে ঘটনা বুঝে ফেললেন। তাই, অভিবাদন ও অপারগতা প্রকাশ করতে হাত বাড়ালেন সিদ্দীকে আকবার। বললেন, 'উমর, আমার প্রতি মনে কষ্ট নিয়ো না। রাসূল ﷺ আগেই হাফসার কথা বলেছিলেন আমার সঙ্গে। আমি তাঁর গোপনীয়তা নষ্ট করতে চাইনি। তিনি বিয়ে না-করলে, আমি ঠিকই হাফসাকে বিয়ে করতাম!'[২]

এরপর, উভয়ে রওনা হলেন উভয়ের মেয়ের কাছে। উমর গেলেন হাফসাকে অত্যুচ্চ মর্যাদাপূর্ণ বিয়ের খোশখবর দিতে; আর, আবু বকর গেলেন আসন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে আয়িশাকে মানসিকভাবে সহজ ও স্বাভাবিক রাখতে।

রাসূল ﷺ চাইলেন উমর ইবনুল খাত্তাবের মর্যাদার ডানায় আরও একটি অপূর্ব পালক সংযুক্ত করতে। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন আভিজাত্যের অধিকারী উমরকে আরও সম্মানিত করতে; এবং দূর করে দিতে উমর-কন্যা হাফসার বৈধব্যের দুঃখ।

পুরো মদীনা তাঁর এই সিদ্ধান্তে অভিবাদন জানাল। আবার, কদিন বাদেই যখন উসমানের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছিল উম্মু কুলসুম বিনতু মুহাম্মাদের, তখনও মদীনাবাসী

---

[১] *আস-সিমতুস সামীন* : ৮৩; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৮১১; *আল-ইসাবাহ* ০৮/৫১; *উয়ূনুল আসার* ০২/৩০২।

[২] প্রাগুক্ত।

নিজেদের উৎফুল্লতা প্রকাশ করল... তখন চলছে দ্বিতীয় হিজরী সনের জুমাদাল উখরা।

অবশেষে নবীগৃহ প্রস্তুত হলো আরেক নববধূ হাফসাকে খোশআমদেদ জানাতে, সে-বছরেরই শাবান মাসে যিনি আবদ্ধ হয়েছেন মহানবীর প্রণয়-বন্ধনে।[১]

যে গোপন-কথা রয়নি গোপন

প্রিয়তম স্বামীর ভালোবাসা ও সংসারযাপনে আরেকজন নারীর আগমন ঘটেছে, নারীসুলভ মানসিকতা থেকে আয়িশা ও সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার জন্য এটা সুখকর কোনো বিষয় ছিল না নিশ্চয়, কিন্তু যিনি তাঁদের প্রিয়তম স্বামী, তিনি তো আর-সব সাধারণ মানুষের মতো নন, তিনি সারওয়ারে কায়েনাত, সৃষ্টির সবচেয়ে সম্মানিত ও মহান ব্যক্তিত্ব, মহান রবের নির্দেশ ও ইশারা ব্যতীত তিনি নিজের নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত ফেলেন না; সুতরাং এই বিবাহও রবের ইশারা ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হয়েছে, এ ছিল তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাই হাফসার সঙ্গে সংসারযাপন ও প্রিয়তম স্বামীর অংশদারত্ব ভাগাভাগি করতে সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার তেমন কোনো বেগ পেতে হলো না। অবশ্যি আয়িশা সিদ্দীকা যেহেতু ছিলেন নবীজির ভালোবাসার প্রবল-আকাঙ্ক্ষী আবার নবীজিরও তাঁর প্রতি ছিল বিশেষ টান, তাই ভালোবাসার নতুন অংশীদারকে মেনে নিতে প্রথম প্রথম তাঁর কিছুটা বেগ পেতে হয়েছে, কিন্তু অল্পদিনের ভেতর তিনি নারীসুলভ সেই ঈর্ষাকে হৃদয়-অলিন্দে দাফন করে নবাগতা এই উম্মুল মুমিনীনের সঙ্গে গড়ে তুললেন এক অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। এমনকি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রতমা অন্যান্য স্ত্রীগণ নবীজির বিবাহাধীনে আসার পরও তাঁদের দুজনের বিশেষ বন্ধুত্ব অটুট থাকল।

মেয়ের সাংসারিক বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন হযরত উমর। এ-নিয়ে সবসময় একটা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা যেন ঘিরে রাখত তাঁকে। মেয়েসুলভ কোনো আচরণে হাফসা ﵂ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো কষ্ট দিয়ে ফেলেন কি না, এ ছিল উমরের উদ্বেগের কারণ। তাছাড়া, তাঁর কন্যা ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কন্যার পারস্পরিক নৈকট্যের ব্যাপারটি তাঁকে

[১] *তারীখু তাবারী : ০৩/০৯; ওয়াফাউল ওয়াফা : ০৩/ ৯০০; আল-ইসতীআব, আল-ইসাবাহ।*

ভাবিয়ে তুলত। কেননা, দুজনের পিতাই নবীজির অতি নিকটজন—এই বোধ থেকে তাঁরা অন্য স্ত্রীদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করতে গিয়ে এমন কোনো আচরণ করে ফেলেন কি না, যা নবীজির মনঃকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এটাও ছিল উমরের উৎকণ্ঠার একটি কারণ। পিতা হিসাবে তিনি আশংকা করতেন—আয়িশা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার পারস্পরিক এ নৈকট্য ও বন্ধুতা নবীজির পবিত্রতমা অন্যান্য স্ত্রীদের বিপরীতে আলাদা একটা দল-পাকানো-জাতীয় কিছু হয়ে যায় কি-না। নিজ-কন্যা হাফসাকে তিনি বন্ধু সিদ্দীকের কন্যা আয়িশা'র সমকক্ষ মনে করতেন না। সব স্ত্রীর প্রতি নবীজির সমান কর্তব্যপরায়ণতা থাকলেও আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ক্ষেত্রে নবীজির ভালোবাসার পারদটা যে অন্য স্ত্রীদের চেয়ে খানিকটা উঁচু, উমর-সহ সকল সাহাবীরই এ বিষয়ে জানা ছিল। তাঁরা এও জানতেন—আয়িশা ﷺ রূপে, গুণে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে—সর্বদিক বিবেচনায় ছিলেন এ ভালোবাসাটুকু পাওয়ার যোগ্যতর পাত্রী। ফলে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র সঙ্গে এ ধরনের মেলামেশা, একত্রে ওঠাবসা ও অধিক অন্তরঙ্গতা থেকে মেয়ে হাফসাকে একদা সতর্ক করলেন হযরত উমর। মেয়ের কাছে গিয়ে বললেন, 'আয়িশার সঙ্গে কি তোমাকে মানায়? তুমি কোথায়, আর, সে কোথায়? তার বাবা, আর তোমার বাবার মর্যাদাগত অবস্থানে কত তফাৎ, ভেবে দেখেছ?'

উমর একদিন স্ত্রীর কাছে শুনলেন, যে, তাঁর মেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার পিঠে কথা বলে ফেলেছেন, এবং এর জেরে রাসূল সারাদিন রাগ হয়ে ছিলেন। এই খবর শোনামাত্রই তিনি মেয়ের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। বললেন, 'আমি যা শুনেছি, তা সত্য?' হাফসা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, সত্য।' উমর ক্ষোভে চিৎকার করে উঠলেন। বললেন—'শোনো, আল্লাহর শাস্তি ও তাঁর রাসূলের রাগের বিষয়ে সাবধান থাকবে! আর, তুমি একে (মানে, আয়িশাকে) দেখে ধোঁকা খেয়ো না। সে তো নিজের সার্বিক সৌন্দর্যে রাসূলকে মুগ্ধ করতে পেরেছে। আল্লাহর কসম, তুমি রাসূলের ভালোবাসার যোগ্য কেউ নও; বরং আমি না-থাকলে তো তিনি তোমাকে তালাকই দিয়ে দিতেন!'

মেয়েকে শক্তভাষায় শাসন ও সতর্ক করে উমর ফিরে গেলেন। পিতার উপদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করলেন হাফসা। মনে মনে এই ভেবে অনুতপ্ত হলেন—

আসলেই তো! দুজাহানের সরদার যে মহাপুরুষ, যাঁর জন্য কুল-কায়েনাত উৎসর্গিত, এমন ব্যক্তিত্বের জীবন-সঙ্গিনী হবার কী যোগ্যতা তাঁর আছে! এ তো মহান রবের একান্তই অনুগ্রহ এবং প্রিয়তম স্বামীর উদারতাই কেবল।

কিন্তু স্বভাবজাত ও নিতান্তই মানবিক চঞ্চলতা কখনো কখনো তাঁকে এই বোধ থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে দিত। দাম্পত্য সম্পর্কের স্বাভাবিকতা থেকে কোনো কোনো সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার পিঠে অন্য কথা বলে ফেলতেন। কখনো নবীজির কোনো কথার ভিন্ন কোনো দৃষ্টিকোণ জানা থাকলে ভয়-ডর ছাড়াই নির্দ্বিধায় সেটা পেশ করতেন। নবীজিও তাঁদের এমন আচরণকে গ্রহণ করতেন খুবই স্বাভাবিকভাবে। আচরণে কোনো বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হলে, কিবা, তাঁদের কোনো ভুল হলে সঙ্গে সঙ্গে শুধরে দিতেন— কখনো ভালোবাসার মাধ্যমে, কখনো ধমকের সুরে, আবার কখনো অভিমানের মধ্য দিয়ে। ভুলের মাত্রা অনুযায়ী তিনি শুধরানোর পন্থা বেছে নিতেন।

হুদাইবিয়া ও বাইআতে রিদওয়ানের হাদীসে ইবনু সাদ বর্ণনা করেছেন— হুদাইবিয়ায় গাছের নিচে বসে যাঁরা রাসূলের হাতে বাইআত নিয়েছিলেন, রাসূল তাঁদের কথা হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে বলছিলেন, যে, তাঁরা জাহান্নামে যাবে না, ইনশাআল্লাহ। শুনে হাফসা বললেন, 'বরং অবশ্যই তাঁরাও জাহান্নামে উপনীত হবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ!' এই কথায় নবীজি তাঁকে ধমক দিলেন। কিন্তু হাফসার কাছে তো দলীল আছে! তিনি নবীজিকে কুরআনের এই আয়াতটি শোনালেন—

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝

> *'তোমাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে উপনীত হবে; এটা আপনার রবের সুনিশ্চিত ফয়সালা।'*[১]

নবীজি তখন বললেন, 'আরে, এরপরেই তো আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

[১] সূরা মাইয়াম : ৭১।

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝

> *"অতঃপর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব; আর, যালিমদেরকে সেখানে ছেড়ে রাখব নতজানু অবস্থায়!"*[১]

মারিয়া কিবতিয়া ﵂ ছিলেন নবীজির দাসী। স্ত্রীদের মতো তাঁর সঙ্গেও নবীজি একান্তে সময় যাপন করতেন। একদিন হাফসা ﵂ ঘরে ছিলেন না। নবীজি তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁকে পেলেন না, এমন সময় মারিয়া কিবতিয়া এসেছিলেন সেখানে। নবীজি মারিয়ার সঙ্গে একান্তে কিছু সময় পার করেন। খানিকপর হাফসা এসে বিষয়টা আঁচ করতে পারলেন। নারীসুলভ স্বভাবের কারণে এতে যেন তাঁর তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠল। যেন রক্তক্ষরণ শুরু হলো তাঁর হৃদয়ে।

মারিয়া চলে যাওয়ার পর ক্ষোভে-অভিমানে তিনি ঘরে ঢুকলেন। অভিমানভরা ভারি গলায় রাসূলকে বললেন, 'আমি দেখেছি, কে আপনার সঙ্গে ছিল! কসম আল্লাহর, সে তো আমাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে! আপনি আমাকে অপমান করার জন্য তার সঙ্গে এখানে মিলিত হয়েছেন!' এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

নবীজি ভাবেননি হাফসা এভাবে কষ্ট পাবেন। তাঁর ক্ষোভ অভিমান ও কান্নায় নবীজির হৃদয়ও ভিজে এল। হাফসাকে অপমান করবার তো প্রশ্নই আসে না! একে তো তাঁর স্ত্রী, আবার তাঁর অতিপ্রিয় সাহাবী উমরের কন্যা তিনি! তবে বুঝলেন—নারীসুলভ মন থেকে হাফসা কষ্ট পেয়েছেন এবং এ কথাটি তাঁর সে কষ্টেরই অভিমানভরা বহিঃপ্রকাশ। আর স্বামীর সঙ্গে একজন স্ত্রীর মান-অভিমানের অবকাশ তো আছেই। তাই তাঁর মান ভাঙাতে নবীজি বললেন, 'ঠিক আছে, আজকের পর থেকে মারিয়াকে আমার জন্য হারাম করে দিলাম!' তাঁর মান ভাঙাতে প্রিয়তম নবী এমন কঠিন সিদ্ধান্তে পৌঁছায় হাফসা খুশি হয়ে গেলেন, সেই সঙ্গে ভুলে গেলেন সকল অভিমান। নবীজি বললেন, 'যা কিছু হয়েছে, তা প্রকাশের দরকার নেই। এমনভাবে থাকবে, যেন কিছুই ঘটেনি।'

সেই রাত হাফসার ভাগেই ছিল, নবীজি তাঁর সঙ্গে রাত-যাপন করলেন। সকাল হতেই যখন রাসূল চলে গেলেন, এবং বান্ধবী আয়িশাকে হাফসা কাছে পেলেন, তখন গল্পের সূত্রে চেপে রাখা কথাটি আর গোপন রাখতে পারলেন না। মারিয়াকে

[১] সূরা মারইয়াম : ৭২। ঘটনাটির সূত্র *আত-তাবাকাতুল কুবরা* : ০২/৭৩।

নিয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি বলেই ফেললেন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে। মারিয়া কিবতিয়া ছিলেন খুবই কমনীয়া এবং সুন্দর দেহাবয়বের একজন রমণী। রাজ-উপহার হিসেবে এসেছিলেন তিনি নবীজির মালিকানায়। নবীজির একজন পুত্রও জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর গর্ভ থেকে। ফলে উম্মুল মুমিনীনগণের স্বভাবজাত একটা ঈর্ষার নিশানা ছিলেন তিনি। আয়িশা ﵂ যখন হাফসার কাছ থেকে আগের দিনের ঘটনা জানতে পারলেন, মনের গভীরে থাকা ঈর্ষাটা তাঁর হঠাৎ জেগে উঠল। নবীজির পবিত্রতমা অন্যান্য স্ত্রীগণও আয়িশাকে সমর্থন জোগালেন। রাসূল ﷺ যথাসম্ভব তাঁদের কথাবার্তা মেনে নিয়ে তাঁদেরকে বোঝাতে, নরম করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মানবিক দুর্বলতার কারণে তাঁরা রাসূলের আবেগ ও নম্রতাকে ঠিকভাবে অনুধাবন করতে না-পেরে জিদ ধরে নিজেদের অজান্তেই তাঁর সঙ্গে সীমাতিক্রম করে ফেললেন।

অথচ রাসূল তো এসব অনর্থক মেয়েলি মান-অভিমানে সময় দেওয়ার মতো অবসর ছিলেন না; এবং তিনি এ-ব্যাপারে হাফসা, আয়িশা ও অন্যদেরকে যতটা ছাড় দিয়েছেন, এরচেয়ে বেশি কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভবও নয়। উপায় না-দেখে তিনি এতটা শক্ত পথ অবলম্বন করলেন, যার সঙ্গে উম্মুল মুমিনীনগণ পরিচিত ছিলেন না। তিনি দৃঢ়ভাবে তাঁদের থেকে নিজের আলাদা হয়ে যাওয়ার ইরাদা জানিয়ে দিলেন। জানিয়ে দিলেন, যে, তিনি তাঁদের থেকে রিসালাত ও নবুওয়াতের মহাদায়িত্ব আদায়ে ব্যাপৃত হতে চলে যাবেন সবাইকে ছেড়ে।

মুসলিমদের মধ্যে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল—রাসূল ﷺ নিজের স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। প্রতিবাদকারী পত্নীগণ ঘরে বসে পেরেশানি আর অনুশোচনায় ডুবে যেতে লাগলেন। কারণ, ঘটনা এতদূর গড়িয়ে যাবে—এমনটা কল্পনায়ও ছিল না তাঁদের। হতাশার আঁধারে তাঁরা যেন এমন কাউকে দেখছিলেন না, যে তাঁদেরকে আল্লাহর রহম ও রাসূলের ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হওয়ার মতো ভয়ানক অশুভ পরিণতি থেকে উদ্ধার করে আনতে পারে!

প্রিয়তমাদের ছেড়ে দূরে থাকার এক মাস পেরিয়ে গেল। উম্মুল মুমিনীনগণ প্রিয়তম রাসূলের ভালোবাসাবঞ্চিত হওয়ার শঙ্কায় ভীত-কম্পিত। প্রতিটি মুসলিম নিজের প্রিয়তম নবীর নিঃসঙ্গ সময়ের নীরব সাক্ষী হচ্ছে। কিন্তু কারও সাহস হচ্ছে না, যে, তাঁকে তাঁর স্ত্রীগণের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবে। কেবল,

উমর ﷺ গিয়েছিলেন একদিন।

আসলে রাসূল ﷺ তো স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি। আল্লাহও তাঁদের প্রতি রহম করলেন, শুধু এই হুমকিটুকু দিলেন, যে, তাঁরা নিজেদের ভুল থেকে তাওবা না-করলে রাসূল তাঁদেরকে যদি তালাক দেন, তাহলে আল্লাহ তাঁকে তাঁদের চেয়েও উত্তম স্ত্রী দান করবেন।[১]

উম্মুল মুমিনীনগণের ঘরে যেন সুখ-পায়রা উড়ে এল। তাঁরা শুনতে পেলেন—সব কষ্ট আর অভিমান ভুলে প্রিয়তমাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করছেন রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ। প্রত্যেকে নিজ নিজ দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন প্রিয়তমের ফিরে আসার মুহূর্তের সাক্ষী হতে। শুধু আয়িশাই রয়ে গেলেন ঘরে। একান্তে বসে নিজেকে তিনি প্রস্তুত করতে লাগলেন প্রিয়তমের সাক্ষাত-মুহূর্তের জন্য। কারণ, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—সবার আগে তাঁরই ঘরে উঠবেন অপরূপ দ্যুতিময় এই চাঁদ।

দরজার খুব কাছেই যখন তাঁর পদশব্দ শোনা গেল, তখন যেন আয়িশার হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার যোগাড়। যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে তাঁকে দেখামাত্রই তিনি বলে উঠলেন, 'ওগো আল্লাহর নবী, আপনার প্রতি আমার মা-বাবা কুরবান হোন, আমি এমনিতেই—মন থেকে নয়—একটি কথা বললাম, আর, আপনি আমার প্রতি রাগ করে ফেললেন?'

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র কণ্ঠে অভিমান ঝরে পড়ছে। নবীজি ﷺ তাঁর দিকে আরেকটু মনযোগী হতেই তিনি হাসি-হাসি মুখ করে বললেন, 'আপনি না আমাদেরকে এক মাস দূরে রাখার কসম করেছিলেন? মাস তো এখনো পূর্ণ হয়নি, আজ তো ঊনত্রিশতম দিন, এখনো আরও এক দিন বাকি!'

তাঁর এই কথা শুনে রাসূলের চেহারায় খুশিরা ঝিলিক দিয়ে উঠল। তিনি এই ভেবে আনন্দিত হলেন, যে, তাঁর পবিত্রতমা স্ত্রীগণ তাহলে বিচ্ছেদের প্রতিটি দিন গুনে রেখেছে! তিনি জবাব দিলেন, 'আরে, এই মাস তো ঊনত্রিশ দিনেই সমাপ্ত।'

পাঠক, রাসূল ﷺ মারিয়াকে নিজের ওপর হারাম করা, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু

[১] বক্তব্যটি সূরা তাহরীমের।

আনহার কাছে হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা গোপন কথাটি ফাঁস করে দেওয়া এবং উভয়ে মিলে রাসূলের কাছে প্রতিবাদ জানানোর ঘটনা ফিকহের কিতাবগুলোতে সূরা তাহরীমের শানে নুযুলে[১] বর্ণিত আছে; তাফসীরের কিতাবাদিতে[২] তো আছেই।

আবার, বুখারী-মুসলিমে আছে, যে, তাহরীমের আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে যখন নবীজি ﷺ আয়িশা ও তাঁর সঙ্গিনীদের বারবার করা একটি প্রশ্নের মুখে নিজের ওপর মধু হারাম করেছিলেন। প্রশ্নটি ছিল—'আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন?'[৩]

তো, আসল কথা হলো, হাফসাকে রাসূল ﷺ যেই কথা গোপন রাখতে বলেছিলেন, গোপনীয়তার গুরুত্ব বুঝতে না পেরে হাফসা ওটা ফাঁস করে দিয়েছিলেন। আসলে তিনি চিন্তাও করতে পারেননি—কী ভয়াবহ আগুন তাঁর হাত দিয়ে জ্বলে উঠেছে!

কয়েকটি সূত্রে ইবনু হাজার-বর্ণিত হাদীস দেখে কেউ কেউ বলেছেন, রাসূল ﷺ হাফসাকে তৎক্ষণাৎ তালাক দিয়েছেন। বর্ণনাগুলোতে আসলে এক তালাকের কথা আছে; এবং এ-ও আছে, যে, রাসূল তাঁকে আবার ফিরিয়েও নিয়েছেন।

এই ফিরিয়ে নেওয়ার বর্ণনাগুলো আবার পরস্পরে ভিন্নরকম। একটি বর্ণনায় ফিরিয়ে নেওয়ার কারণ বলা হয়েছে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র প্রতি রাসূলে কারীমের দয়া, যে, উমর মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে বলছিলেন, 'আজ থেকে উমর ও তার মেয়ের প্রতি আর দৃষ্টি দেবেন না আল্লাহ!' পরদিন সকালে জিবরীল অবতরণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন, উমরের প্রতি দয়া করে হাফসাকে ফিরিয়ে নিতে।' আরেক বর্ণনায় আছে, জিবরীল রাসূলের কাছে এসে বললেন, 'আপনি হাফসাকে ফিরিয়ে নিন। তিনি তো নফল সালাত ও সাওম বেশি বেশি আদায় করেন। জান্নাতেও তিনি আপনার স্ত্রী হিসেবে থাকবেন।'[৪]

---

[১] মুসলিমের (০২/১১০০) টীকায় কাযী ইয়াযের বরাতে কথাটি আনা হয়েছে।
[২] তাফসীরে তাবারী, কাশশাফ, আল-বাহরুল মুহীত।
[৩] আল-লু'লু ওয়াল মারজান ফীমাত তাফাকা আলাইহিশ শাইখান : ০২/১২৬।
[৪] আল-ইসাবাহ : ০৮/৫২; আল-ইসতীআব : ০৪/১৮১২; উয়ূনুল আসার : ০২/৪০২; আস-সিমতুস সামীন : ৮৫।

তবে, প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, তালাকে রজঈর এই ঘটনা আরও আগের; তখনও উম্মুল মুমিনীনগণ মারিয়াকে নিয়ে কিছু করেননি।

এরপর যখন রাসূল ﷺ তাঁদের থেকে এক মাসের জন্য আলাদা হয়ে গেলেন, তখন স্বভাবতই অন্য উম্মুল মুমিনীনদের চেয়ে হাফসার অনুশোচনা ও অনুতাপ বেশি ছিল। নিজের ভুল সম্পর্কে তাঁদের চেয়ে বেশি লজ্জানুভূতি ছিল তাঁর। কারণ, একজন ইবাদাতগুজার, পরহেযগার রমণী হয়ে, বিশেযত, উমর ইবনুল খাত্তাবের কন্যা হয়ে রাসূলের আমানতের কথা ফাঁস করা এবং এমন রাগ-ক্ষোভ দেখানো, যে, রাসূলকে সেই রাগ ভাঙাতে বেশ কোশেশ চালাতে হয়—এটা যে তাঁর কোনোভাবেই উচিত হয়নি, তা খুব ভালো করে অনুধাবন করতে পারেন তিনি।

আল-ইসাবাহ গ্রন্থে আছে—উমর ﷺ তাঁর মেয়ের কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি কাঁদছেন। উমর বললেন, 'রাসূল কি তোমাকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন? দেখো, এর আগেও তিনি তোমাকে এক তালাক দিয়েছেন। আমার উসীলায় আবার ফিরিয়েও নিয়েছেন। এবার যদি আবার তালাক দিয়ে থাকেন, আমি কিন্তু এ-নিয়ে তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারব না!'

বুখারী ও মুসলিমে উমর ও ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে, যে, উমর মসজিদে গেলেন; দেখলেন, লোকেরা মাথা নিচু করে কঙ্কর নাড়ছে; আর, আফসোস করছে, যে, রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন!

এর মধ্যে কেউই কিন্তু উম্মুল মুমিনীনদের ব্যাপারটি নিয়ে রাসূলের সঙ্গে কথা বলার সাহস করেননি; কিন্তু উমর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তাঁর মেয়েই তো ছিলেন এই ঘটনার মূল অনুঘটক! উমর ছুটলেন সেই চিলেকোঠাটির উদ্দেশ্যে, যেখানে স্ত্রীদের থেকে আলাদা হয়ে একলা বাস করছেন রাসূল; দরজায় বসে থাকেন গোলাম রাবাহ।

উমর গিয়ে অনুমতি চাইলেন। বারবার ডাকলেন। কিন্তু রাবাহ কোনো জবাব দিলেন না। তখন উমর চিৎকার করে বললেন, 'ও রাবাহ, রাসূলের কাছে আমার জন্য অনুমতি চাও। তিনি হয়তো ভাবছেন, যে, আমি হাফসার ওকালতি করার জন্য এসেছি। আরে নাহ, আল্লাহর কসম! রাসূল আমাকে বললে, আমি

হাফসার গর্দান উড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত!'

এই আওয়াজ রাসূলও শুনতে পেলেন। তিনি উমরের অবস্থা অনুধাবন করতে পারলেন। তাই, তাঁকে ভেতরে আসার অনুমতি দিলেন। উমর কামরাটিতে প্রবেশ করেই চারদিকে তাকালেন। তাঁর চোখে পানি এসে গেল। রাসূল ﷺ বললেন, 'ও খাত্তাবের বেটা, কাঁদছ কেন?' উমর তখন রাসূলের বিছানারূপে থাকা মাদুরটির দিকে ইশারা করলেন। ওটাতে শুয়ে রাসূলের গায়ে দাগ পড়ে গেছে! এরপর তিনি কামরার এক কোণে পড়ে থাকা মাত্র কয়েক মুঠো খাবারের দিকে ইশারা করলেন! কী হাল প্রাণপ্রিয় রাসূলের! চোখের অশ্রু মুছে উমর বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, স্ত্রীদের ব্যাপারটায় আপনি এত কষ্ট সইছেন কেন? আপনি তাঁদেরকে তালাক দিয়ে দিলেও তো কোনো সমস্যা নেই। আপনার সঙ্গে আল্লাহ আছেন। আছেন তাঁর ফিরিশতাগণ, জিবরীল ও মীকাঈল। আমি, আবু বকর ও সব মুমিনও তো আছি আপনার সঙ্গে!'

তাঁর কথা শুনে রাসূল ﷺ হেসে ফেললেন। তাঁকে শান্ত করলেন এই বলে, যে, স্ত্রীদেরকে তিনি তালাক দেননি; বরং এক মাসের জন্য তাঁদের সঙ্গ বর্জন করেছেন।

এই কথায় যেন উমরের প্রাণ ফিরে এল। তিনি রাসূলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মসজিদে ফিরে এলেন এবং মুসলিমদেরকে খোশখবর দিলেন, যে, রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দেননি।

এরপর রাসূল সেই ছোট্ট কামরাটি থেকে বেরিয়ে আসেন। এবং মুসলিমদের সামনে সূরা তাহরীমের শুরুর আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۗ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ
الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ
بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ
مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۗ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞ اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ

قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝ عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝

> 'হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশি করতে নিজের জন্য তা হারাম করছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। আল্লাহ তোমাদের জন্য কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন; আল্লাহ তোমাদের মালিক; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে-বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু ব্যাপার থেকে গুরুত্বহীন রইলেন। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বলল, 'কে আপনাকে এ-সম্পর্কে অবহিত করল?' নবী বললেন, 'যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিবহাল, তিনিই আমাকে অবহিত করেছেন।' তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তাওবা করো, তবে ভালো কথা। আর, যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করো, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ, জিবরীল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়; উপরন্তু, ফিরিশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী। যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবত, তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দেবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী; যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, সালাত আদায়কারিণী, তাওবাকারিণী, ইবাদাতগুজার, সাওম পালনকারী, অকুমারী ও কুমারী।"[১]

অমূল্য আমানত

নবীপত্নীগণ তাঁর এই কষ্ট-ক্ষোভ থেকে শিক্ষা নিলেন। হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাও নির্ভার হলেন তাঁর দুশ্চিন্তা থেকে। চিন্তায় তো এতদিন তাঁর জান যাচ্ছিল প্রায়। এরপর থেকে আর কখনোই নবীগৃহে নারীসুলভ কোনো চঞ্চল-কর্মে অংশ

[১] সূরা তাহরীম : ০১-০৫।

নেননি হাফসা; এবং প্রিয়তম স্বামী ও রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁর অপছন্দনীয় কোনো কাজে জড়াননি। রাসূলের ইন্তিকালের পর সব উম্মুল মুমিনীনের মধ্য থেকে এই হাফসা বিনতু উমরকেই কুরআনের লিখিত পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

মূলত, ইরতিদাদ ও ধর্মত্যাগ-ফিতনার দমনে অনেক হাফিয সাহাবী শহীদ হয়ে যান; তখন, হযরত উমরের ইশারায় প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কুরআনের অংশগুলো একত্র করতে শুরু করেন। তাঁরা চাচ্ছিলেন—যেন কুরআনের সবগুলো অংশ একত্র করে ফেলার সময়টা অবতরণ-কাল থেকে বেশি দূরবর্তী না-হয়ে যায়; এবং প্রথম যুগের হাফিযগণ জীবিত থাকতেই যেন এই কাজ সুসম্পন্ন করে ফেলা যায়।

তো, পরিকল্পনা মুতাবিক একত্র করার পর কুরআনের এই কপিটি উম্মুল মুমিনীন হাফসার নিকট আমানত রাখা হয়।

ত্রয়োদশ হিজরীর জুমাদাল উখরার শেষদিকে খলীফা আবু বকর ﵁ ইন্তিকাল করেন। এরপর তাঁরই ওসীয়ত মুতাবিক খিলাফাতের যিন্মাদারী গ্রহণ করেন আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁। সে-সময়ে হাফসা ﵂ নিজের বাবার মহত্ত্ব ও অত্যুচ্চ কীর্তির সাক্ষী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। বাবার দায়িত্বকালেই তিনি প্রত্যক্ষ করেন শাম, ইরাক ও মিশরের বিজয়...

এবং দেখতে দেখতে সেই মুহূর্তটা হাজির হয়, যখন শুধু হাফসা নন, বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ বাকরুদ্ধ হয়ে লক্ষ করে—এক অগ্নিপূজক গোলাম আবু লুলুর খঞ্জরের পাষাণ আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন উম্মাহর অবিসংবাদিত অভিভাবক উমর ইবনুল খাত্তাব। ত্রয়োবিংশ হিজরীর যুলহিজ্জা মাসের সেই অন্ধকার রাত যেন তামাম দুনিয়ার মুসলিম-হৃদয়ে ছড়িয়ে দেয় বাকহারা শোকের কালো আঁধার...

ইন্তিকালের সময় উমর ﵁ ছ'জন বিশিষ্ট সাহাবীর শূরা-কমিটির কাছে খিলাফাতের দায়িত্ব ন্যাস্ত করে যান; এবং সব পরামর্শের পর, সবার অনুরোধে আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনু আফফান ﵁ সেই গুরুদায়িত্ব বহনে রাজি হন। তাঁর সময়েই উম্মুল মুমিনীন হাফসার কাছ থেকে কুরআনের সেই কপিটি বুঝে নেওয়া হয়; এবং কুরআনের একক হরফ ও লেখ্যরীতির কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন

করা হয়। এরপর হযরত উসমানের প্রস্তুতকৃত কপির আদলে প্রয়োজনমতো আরও কপি তৈরি করে মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নির্মম ও বেদনাদায়ক শাহাদাতের পর হিজরী ৩৫ সালের যুলহিজ্জায় আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনু আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র হাতে মানুষ বাইআত নেয়। এরপর তো বিরাট ফিতনা শুরু হয়; মুসলমানদের মধ্যে দুটি পক্ষ হয়ে যায়। একপক্ষের নেতৃত্বে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ﷺ, অপরপক্ষের নেতৃত্বে আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনু আবী তালিব ﷺ। দুটো পক্ষের মধ্যে হয় তুমুল যুদ্ধ।

তো, সে-সময়ে হযরত আয়িশার সঙ্গে মিলে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করেন হাফসা ﷺ। আগে যেমন আয়িশাকে সঙ্গ দিতেন, তেমনই এই সময়েও তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার পুরো মনস্থ করে ফেলেন তিনি। কিন্তু তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনু উমর তাঁকে বাধা দেন; এবং মহাধোঁয়াশাপূর্ণ সেই বিষয়ে জড়িয়ে পড়া থেকে তাঁকে হেফাজত করেন।

ফলে, তিনি চুপচাপ মদীনায় বসে নফল সালাত ও সওমে মগ্ন থাকেন। এভাবেই একদিন, যখন মুসলিমবিশ্বে চলছে হযরত মুআবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র শাসন, জীবনের পাঠ চুকিয়ে মহামহিম রবের সান্নিধ্যে রওনা হন হাফসা। শোকসন্তপ্ত মদীনাবাসী তাঁকে রেখে আসে তাঁর জীবৎকালের সঙ্গিনী অন্য উম্মুল মুমিনীনদের নিকট জান্নাতুল বাকী'তে।[১] হাফসা চলে যান; রয়ে যায় তাঁর 'উম্মুল মুমিনীন' ও 'হাফিযুল হাদীস' উপাধির অগুনতি জ্বলজ্বলে কীর্তি ও স্মৃতি।

[১] তাঁর ইন্তিকালের সন নিয়ে মতভেদ আছে; তবে, সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হচ্ছে, তিনি ৪৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন *আত-তাবাকাত*, *আল-ইসতীআব*, *আল-ইসাবাহ*; এবং *উয়ূনুল আসার* : ০২/৩০২।

উম্মুল মাসাকীন

যাইনাব বিনতু খুযাইমাহ

'দুস্থ-অসহায়দেরকে যাইনাব অনেক মায়া ও স্নেহ করতেন; এ-জন্যই তাঁকে উম্মুল মাসাকীন তথা, অসহায়দের মা বলা হয়।'

—ইবনু ইসহাক।

[*আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ*]

নবীগৃহে হাফসার আগমনের অল্প ক'দিন পরেই সেখানে আগমন ঘটে এক কুরাইশ শহীদ ও প্রথম সারির মুহাজিরের বিধবা স্ত্রীর। চতুর্থ উম্মুল মুমিনীন হয়ে নবীগৃহে কদম রাখেন যাইনাব বিনতু খুযাইমা ইবনিল হারিস ইবনি আবদিল্লাহ আল-হিলালিয়্যাহ।

সম্ভবত নবীগৃহে যাইনাবের অল্প সময়ের অবস্থানের ফলে জীবনীকারগণ তাঁর বিষয়ে খুব একটা কলম ধরেননি; তাই, তাঁর সম্পর্কে আমাদের সুনির্দিষ্ট জানাশোনাটা খুবই কম। তাঁর পিতৃকুল সম্পকীয় তথ্য নিয়ে ঐতিহাসিকগণ মতভেদ করেননি; কিন্তু মাতৃকুল নিয়ে একাধিক মত পাওয়া যায়। এর মধ্যে ইবনু আবদিল বার আবুল হাসান জুরজানীর মত উল্লেখ করেছেন, যে, 'যাইনাব বিনতু খুযাইমা হলেন উম্মুল মুমিনীন মাইমুনা বিনতুল হারিসের বৈপিত্রেয় বোন।' এরপর ইবনু আবদিল বার বলেন— 'এমন বক্তব্য আর কারও কাছে পাইনি আমি। আল্লাহই আসলে ভালো জানেন।' এই একই মত ইবনু আবদিল বারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন ইবনু সায়্যিদিন নাস। বর্ণনার পরে তিনি ভিন্ন কোনো

মত ব্যক্ত করেননি।

আর, আমার (লেখিকা) বক্তব্য হলো—বিশিষ্ট বংশবিদ আবু জাফর ইবনু হাবীবও জুরজানীর অনুরূপ কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন—'উম্মুল মুমিনীন মাইমুনা বিনতুল হারিসের মা হলেন—হিন্দ বিনতু আউফ ইবনিল হারিস আল-হুমাইরিয়্যাহ। মাইমুনার সহোদরা বোনগণ হলেন—লুবাবা আল-কুবরা, যিনি আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিবের সন্তানদের মা; লুবাবা আস-সুগরা, যিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের মা...মাইমুনার বৈপিত্রেয় বোনেরা হলেন—যাইনাব বিনতু খুযাইমা ইবনিল হারিস আল-হিলালিয়্যাহ...আরবে বৈবাহিক সম্পর্কের বিবেচনায় হিন্দ বিনতু আউফের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অভিজাত কোনো নারীর খবর আমাদের জানা নেই; যিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন মাইমুনা ও তাঁর বোনদের মা।'[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে যাইনাব কার বিবাহ-বন্ধনে ছিলেন—এ-নিয়েও ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। তবে, সবচেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো—(মূলত আল্লাহই তো সবচেয়ে ভালো জানেন।) তিনি রাসূলের আগে তুফাইল ইবনুল হারিস ইবনি আবদিল মুত্তালিবের বিবাহাধীন ছিলেন। তুফাইলের পরে তাঁর ভাই উবাইদা ইবনুল হারিস তাঁকে বিয়ে করেন। বদরযুদ্ধে তিনিও শহীদ হয়ে যাওয়ার পর রাসূল ﷺ বিয়ে করে নেন যাইনাবকে।

ইবনু হাবীব, জুরজানী, ইবনু সায়্যিদিন নাস, মুহিব্বুত তাবারী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপর্যুক্ত বর্ণনাটি তাঁদের লেখায় পেশ করেছেন। *আল-ইসতীআব* ও *আল-ইসাবাহ* গ্রন্থদ্বয়েও হযরত যাইনাবের জীবনীতে এই বর্ণনাটি এসেছে।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, যে, যাইনাব তুফাইলের বিবাহাধীন ছিলেন; একপর্যায়ে সে তাঁকে তালাক দেয়; তখন রাসূল তাঁকে বিয়ে করেন।

এ-ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি বর্ণনা এসেছে *সীরাতু ইবনি হিশাম*, *আল-ইসাবাহ* ও তাবারীতে।

যাইনাবের ব্যাপারে তৃতীয় মতভেদটি হলো—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তাঁর বিয়ের বিষয়ে মধ্যস্থতা করেছে কে? *আল-ইসাবাহ* গ্রন্থে

[১] *আল-মুহাব্বার* : ১০৫-১০৯; *আল-ইসাবাহ*: ০৮/৯৫।

ইবনুল কালবী থেকে বর্ণিত আছে, যে, রাসূল ﷺ নিজেই যাইনাবকে প্রস্তাব দিয়েছেন; যাইনাব বিষয়টি রাসূলের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন; তখন রাসূল তাঁকে বিয়ে করে নিয়েছেন।

আর, ইবনু হিশাম তাঁর প্রণীত সীরাতে বলেছেন, 'যাইনাবকে তাঁর চাচা কুবাইসা ইবনু আমর আল-হিলালী বিয়ে দিয়েছেন রাসূলের সঙ্গে। রাসূলের পক্ষ থেকে চারশ দিরহাম মহর লাভ করেন যাইনাব।'

তাঁর ব্যাপারে চতুর্থ মতবিরোধের বিষয় হলো—নবীগৃহে তাঁর অবস্থানকাল নিয়ে। *আল-ইসাবাহ* গ্রন্থের একটি বর্ণনার বক্তব্য হলো—'হাফসার পরেই রাসূল ﷺ তাঁর সঙ্গে বাসর করেন। এরপর দুই কি তিন মাসের মাথায় তিনি ইন্তিকাল করেন।' আর, ইবনুল কালবী থেকে আরেকটি বর্ণনায় আছে—'রাসূল ﷺ তৃতীয় হিজরীর রামাদানে তাঁকে বিয়ে করেন। এরপর, তিনি আট মাস রাসূলের সংসার করে চতুর্থ হিজরীর রবীউল আখীরে ইন্তিকাল করেন।'

শাযারাতুয যাহাবে আছে—'তৃতীয় হিজরীতেই রাসূল ﷺ যাইনাব বিনতু খুযাইমা আল-আমিরিয়্যাহ উম্মুল মাসাকীনকে বিয়ে করে ঘরে আনেন। এরপর তিন মাস সংসার করে যাইনাব ইন্তিকাল করেন।'

যাইনাবের নাম নিয়েও কোনো কোনো গবেষক মতবিরোধ করেছেন। ড. হাইকাল তাঁর নাম লিখেছেন, 'যাইনাব বিনতু মাখযূম।' তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, যে, যাইনাব আগে উবাইদা ইবনুল মুত্তালিবের স্ত্রী ছিলেন; যিনি বদরযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। সাথে এ-ও বলেছেন, যে, যাইনাব সুন্দরী ছিলেন না![১] অথচ আমি (লেখিকা) যাইনাব-সম্পর্কীয় তথ্যসূত্রগুলোর কোথাও তাঁর আকার-আকৃতি ও সৌন্দর্য-বিষয়ক বর্ণনা দেখিনি।

বোড লি লিখেছেন—'...হাফসাকে বিয়ে করার পরেই মুহাম্মাদ আরেকটি বিয়ে করেন। অন্য যেকোনো বিয়ের চেয়ে এই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা ছিল বেশি। নববধূ ছিলেন উবাইদা ইবনুল হারিসের—নবী মুহাম্মাদের বদরে শহীদ হওয়া চাচাতো ভাই—বিধবা স্ত্রী। তাঁর নাম ছিল যাইনাব বিনতু খুযাইমা। মুহাম্মাদ তাঁকে বিয়ে করেছিলেন মূলত স্বামী হারানোর শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। আয়িশা বা

[১] *হায়াতু মুহাম্মাদ* : ২৮৮, ২৯১।

হাফসা—কেউই এই নববধূর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেননি। নবীগৃহে আসার আট মাস পরেই তিনি ইন্তিকাল করেন।'[১]

নবীগৃহে আসার পরে বেশি দিন বাস করা হয়নি তাঁর; তা না-হলে কেউ হয়তো বলতে পারত, যে, তাঁর বিয়েটা ছিল সান্ত্বনার জন্য স্রেফ আনুষ্ঠানিক।

যা-ই হোক, ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপারে একমত, যে, যাইনাব ﵂ অনেক নেককার, দয়া ও দানশীলা ছিলেন। কোনো গ্রন্থেই তাঁর নাম 'উম্মুল মাসাকীন' উপাধিবিহীন যেন উল্লেখ করাই যায় না। *সীরাতু ইবনি হিশামে* আছে—'দুস্থ-অসহায়দেরকে যাইনাব অনেক মায়া ও স্নেহ করতেন; এ-জন্যই তাঁকে উম্মুল মাসাকীন তথা, অসহায়দের মা বলা হয়।'[২] *আল-ইসতীআব* ও *আল-ইসাবাহ* গ্রন্থে আছে—'দরিদ্র-অসহায়দেরকে তিনি খাবার ও সাদাকা দিতেন বলে তাঁকে উম্মুল মাসাকীন বলা হতো।'

এখানে একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি মনে করছি। শাইখ মুহাম্মাদ আল-মাদানী ০৪/০৩/১৯৬৫ তারিখে প্রকাশিত আর-রিসালাহ পত্রিকার ১১০৩ নম্বর সংখ্যায় লিখেছেন—'যাইনাব বিনতু জাহাশ ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীর মধ্যে এতীম ও মিসকীনদের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়াশীল; এ-কারণেই মানুষ তাঁকে উম্মুল মাসাকীন নামে চিনত।'

শাইখ এই তথ্য কোথায় পেয়েছেন, আমার জানা নেই; কারণ, সমস্ত সীরাত, তাবাকাতে সাহাবা ও ইসলামের ইতিহাসের শুরুর দিকের বইপত্রে এই উপাধিটি যাইনাব বিনতু খুযাইমার জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে!

তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, তিনি ৩০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। নবীগৃহে তাঁর খুবই অল্প সময়ের সংসার-জীবন সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারিনি। তাই, তাঁর ঘরোয়া বিষয়াদি, মিসকীনদের প্রতি বিশেষ দয়াদৃষ্টি, রাসূল ﷺ ও মুমিনদের কাছ থেকে পাওয়া সবকিছু নিয়ে সন্তুষ্টি, এবং কোনো লোভ, বা, ঈর্ষায় আক্রান্ত না-হওয়ার ব্যাপারগুলোতে নজর না-দিলেও, রাসূলের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন ও উম্মুল মুমিনীন উপাধি লাভের ফলে তিনি মর্যাদার যেই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তা দেখেই আমরা নজর জুড়াতে পারি।

---

[১] আর-রাসূলের আরবী অনুবাদ : ১৭৬।
[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/২৯৬।

অবশেষে, শান্ত জীবনের মতোই খুব নীরব ও শান্তভাবে চোখদুটোতে নেমে আসে চিরবিদায়ের ঘুম; তিনি রওয়ানা হন রবের মুলাকাতের উদ্দেশ্যে...

রাসূল ﷺ তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। এরপর, প্রথম উম্মুল মুমিনীন হিসেবে সমাধিস্থ করেন জান্নাতুল বাকী'তে। রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না।

রাসূলের জীবদ্দশায় প্রথম উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও সায়্যিদা যাইনাব বিনতু খুযাইমা ব্যতীত অন্য কোনো উম্মুল মুমিনীন ইন্তিকাল করেননি।

মদীনার প্রথম নারী-মুহাজির

উম্মু সালামা বিনতু যাদির রকব

‘আগ থেকেই উম্মু সালামার সৌন্দর্য সম্পর্কে জানার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা শুনে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি। এরপর অপেক্ষা করতে থাকি তাঁর আগমনের। যখন তিনি এলেন, দেখলাম—আগে যা বলা হয়েছিল, তিনি মূলত তারচেয়েও কয়েকগুণ বেশি সুন্দরী।’

—আয়িশা বিনতু আবী বকর ﵂।

[*তাবাকাতু ইবনি সাদ*।]

মর্যাদা ও কমনীয় সৌন্দর্য

উম্মুল মাসাকীন যাইনাব বিনতু খুযাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকালের পরে অল্প কিছু দিন তাঁর ঘরটি খালি ছিল। এরপরেই সেখানে বসবাসের জন্য আগমন ঘটে আরেক অনন্য নববধূ উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার। *তাবাকাতু ইবনি সাদে* উম্মু সালামার নিজের বর্ণনা আছে—‘...রাসূল ﷺ আমাকে বিয়ে করলেন; এরপর যাইনাব বিনতু খুযাইমার ঘরটিতে নিয়ে এলেন।’

উম্মু সালামার মূল নাম হিন্দ বিনতু আবী উমাইয়া ইবনুল মুগীরাহ আল-কুরাশিয়্যাহ আল-মাখযূমিয়্যাহ।[১] রাসূলের ঘরে তাঁর আগমন যেন একটা হৈচৈ

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/৩৪৫, ০৪/২৯৪; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১৭৭; *নাসাবু কুরাইশ* : ২১৬; *আল-মুহাব্বার* : ৮৩; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৯৩৯; *আস-সিমতুস সামীন* : ৮৬; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/২৪০; *উয়ূনুল আসার* : ০২/৮৬।

ফেলে দেয় সবখানে। দুই যুবতী নবীপত্নীর মনে তাঁকে নিয়ে শুরু হয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। সেই দুইজন তো আর কেউ নন—আবু বকর ও উমরের কন্যা আয়িশা ও হাফসা। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

এক নতুন অভিজাত সঙ্গিনীরূপে আয়িশা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সংসারে কদম রাখেন উম্মু সালামা। তিনি ছিলেন সুপ্রাচীন বংশগৌরবের অধিকারিণী। মেধা, সৌন্দর্য ও আত্মমর্যাদায় অনন্য। নবীগৃহে তাঁর আগমনের পেছনে কাজ করেছে সম্মান ও গৌরবের বিশাল ফিরিস্তি।

তাঁর বাবা ছিলেন কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম। প্রসিদ্ধ দানবীর। তৎকালীন লোকেরা তাঁকে 'যাদুর রকব' (কাফেলার রসদ ও পাথেয়) উপাধি দিয়েছিল; কারণ, সফরের সময়ে তিনি সঙ্গী কাউকে কোনো রসদপত্র নিতে দিতেন না; বরং তাঁর রসদপত্রই সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত।

তাঁর মা ছিলেন আতিকা বিনতু আমির ইবনু রাবীআ ইবনু মালিক আল-কিনানিয়্যাহ। প্রসিদ্ধ ঘোড়সওয়ার গোত্রের মেয়ে ছিলেন আতিকা।

উম্মু সালামার আগের স্বামীর নাম ছিল আবু সালামা আবদুল্লাহ ইবনি আবদিল আসাদ ইবনু হিলাল। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী, দুই হিজরতের মুহাজির, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাতো ও দুধ-ভাই। তাঁদের উভয়কেই আবু লাহাবের আযাদকৃত দাসী সুওয়াইবা দুধ পান করিয়েছিলেন।[১]

এসব বংশীয় গৌরব ছাড়াও ইসলামের বেলায় উম্মু সালামা ও তাঁর স্বামী আবু সালামার ছিল এক সোনালি অতীত। কারণ, তাঁরা ছিলেন প্রথম সারির মুসলিম। হাবশার প্রথম হিজরতে একেবারেই সামান্য কয়েকজন মুহাজির নারী-পুরুষের মধ্যে তাঁরা ছিলেন অন্যতম; এবং সেখানেই তাঁদের পুত্রসন্তান 'সালামা'র জন্ম হয়।[২]

মক্কায় রাসূলের বিরুদ্ধে জারিকৃত বয়কটের ঘোষণাপত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ার খবর শুনে তাঁরা ফিরে আসেন; কিন্তু ততদিনে মুসলিমদের ওপর কুরাইশের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে যায়। এরপর, আকাবায়ে কুবরার বাইআত হয়ে গেলে রাসূল

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/১০২; *আল-ইসতীআব* : ৬৩৯, ১৬৮২; *জামহারাতু আনসাবিল আরব* : ১৩৪; *নাসাবু কুরাইশ* : ৩৩৭।
[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/৩৪৫।

ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে ইয়াসরিবে হিজরত করার আদেশ করেন। তখন আবু সালামাও তাঁর পরিবার নিয়ে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর তাঁদের সঙ্গে যা ঘটেছে, যুগযুগান্তরের ইতিহাসে তা কেবলই নির্মম দুঃখবোধ ও বেদনাদায়ক কান্নার সুর বয়ে বেড়াবে।

উম্মু সালামা ﷺ নিজেই বর্ণনা করেন,[১] '...মদীনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আবু সালামা একটি উট প্রস্তুত করেন। আমাকে এবং আমার ছেলে সালামাকে উটে বসিয়ে লাগামটা হাতে নিয়ে তিনি রওয়ানা করেন। বনু মুগীরা (আমার বাবার গোত্র) গোত্রের কিছু লোক তাঁকে দেখে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, "তুমি নিজে হয়তো আমাদের মতের বিরুদ্ধে চলে যেতে পার; কিন্তু কী করে ভাবতে পারলে, যে, আমরা আমাদের মেয়েকে তোমার সাথে ছেড়ে দেব?" এ-কথা বলে তারা জোর করে উটের লাগাম নিজেদের হাতে নিয়ে নিল; এবং আমাকেও রেখে দিল। এই দেখে বনু আবদিল আসাদের (আমার শ্বশুরের গোত্র) লোকেরা ক্ষেপে গেল। তারা এসে আমার ছেলে সালামার দিকে ইশারা করে বলল, "আল্লাহর কসম, তোমরা আমাদের ছেলের কাছ থেকে তার স্ত্রীকে আটকে রেখে দিলে আমরাও এই বাচ্চাকে ছাড়ব না!" এরপর তারা সালামাকে টেনে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। আর, এদিকে বনু মুগীরা আমাকে আটকে রেখে দিল তাদের কাছে।

'কিচ্ছু করতে না-পেরে আমার স্বামী আবু সালামা মদীনায় চলে গেলেন। স্বামী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি পড়ে গেলাম অন্তহীন দুঃখের সাগরে। বিরহ-বিচ্ছেদ সইতে না-পেরে আমি প্রতিদিন উপত্যকার প্রান্তে নেমে এসে বসে থাকতাম। আমার চোখে ভেসে বেড়াত স্বামী-সন্তানের মায়াবী-করুণ মুখ। নিজেকে সামলাতে না-পেরে কাঁদতে থাকতাম। এভাবেই একসময় সন্ধ্যা নেমে আসত; যেন দিনের শেষ নয়; বরং আমার দুঃখ-আঁধারেই ঢেকে যেত আকাশ!

'এভাবে এক বছর, বা, তারচে কিছু কম সময় চলে যায়। একদিন আমার এক চাচা আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন মুগীরার পুত্র। আমার অবস্থা দেখে তাঁর দয়া হয়। তিনি আমার অন্য চাচাদের কাছ গিয়ে বলেন, "তোমরা কি এই মেয়েটিকে ছাড়বে না? আর কত কাল তাকে তার স্বামী-সন্তান থেকে দূরে

[১] *সীরাতু ইবনি ইসহাক* : ০২/১১২; *আস-সিমতুস সামীন* : ৮৭।

রাখবে?" তাঁর বারবার বলার কারণে তারা আমাকে স্বামীর কাছে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়। সে-সময়েই বনু আবদিল আসাদ আমার কাছে পুত্র সালামাকে ফেরত দেয়। আমি তখন একটি উটে আরোহণ করে, ছেলেকে কোলে বসিয়ে আল্লাহর নামে মদীনায় থাকা স্বামীর উদ্দেশে রওনা হই; আল্লাহর আর কোনো মাখলুক আমার সঙ্গে ছিল না!

'চলতে চলতে মক্কা থেকে দুই ফারসাখ[১] দূরত্বে আসার পর উসমান ইবনু তালহার[২] সঙ্গে দেখা হয়। সে বলে, "ও আবু উমাইয়ার কন্যা, কোথায় যাচ্ছেন?"

'আমি বলি, "মদীনায়, আমার স্বামীর কাছে।"

'সে বলে, "আপনার সাথে আর কেউ আছে?"

'আমি বলি, "না, আল্লাহ ও আমার এই ছেলে ব্যতীত আর কেউ নেই!"

'সে বলে, "আল্লাহর কসম, আপনার তো দূরত্ব সম্পর্কে কোনো খবর নেই!"

'এরপর সে উটের লাগাম ধরে চলতে শুরু করে। আল্লাহর কসম, তারচেয়ে সম্ভ্রান্ত কোনো আরব-পুরুষ আমি দেখিনি। চলতে চলতে যখন বিশ্রামের জায়গা আসত, সে আমাকে নামিয়ে একটু দূরে কোনো গাছের নিচে গিয়ে শুয়ে পড়ত। এরপর, আবার রওনার সময় হলে, উটকে প্রস্তুত করে আমার কাছে এনে দাঁড় করিয়ে বলত, "উঠুন।" আমি উঠে ঠিকঠাকভাবে বসে পড়লে সে লাগাম ধরে চলা শুরু করত।

'এভাবে চলতে চলতে মদীনার কাছাকাছি এসে যখন সে কুবা এলাকার বনু উমর ইবনু আউফ গোত্রের বসতি দেখে (এখানেই হিজরত করে-আসা আবু সালামা থাকতেন) তখন সে বলে, "আপনার স্বামী এই মহল্লায়ই আছেন। আল্লাহর নামে এবার আপনি সেখানে যান।" এই কথা বলে সে আবার মক্কার পথ ধরে...।'

---

[১] এক ফারাসাখ হলো তিন মাইল।

[২] উসমান তখন কাফির ছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কা-বিজয়ের আগেই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের সঙ্গে হিজরত করেন। মক্কা-বিজয়ের পরে নবীজি উসমান ইবনু তালহা ও তাঁর চাচাতো ভাই শাইবাহর কাছে কাবার চাবি অর্পণ করেন। হযরত উমরের খিলাফাতকালে আজনাদাইনের যুদ্ধে উসমান ইবনু তালহা শাহাদাত বরণ করেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম। উসমান ইবনু তালহার বিস্তারিত জীবনীর জন্য দেখুন—*তাবাকাতু ইবনি সাদ*, *আল-ইসাবাহ*, *আল-ইসতীআব*।

পাঠক, এভাবেই হাবশার প্রথম মুহাজিরদের তালিকায় থাকার মতো করে মদীনারও প্রথম নারী মুহাজির হয়ে যান উম্মু সালামা। একইভাবে, তাঁর স্বামী আবু সালামাও রাসূলের সাহাবীদের মধ্য থেকে মদীনার প্রথম মুহাজির পুরুষ হিসেবে নাম লেখান।[১]

মদীনায় বসে উম্মু সালামা ছোট বাচ্চাদের তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার কাজে মগ্ন হন। আর, স্বামীকে পাঠিয়ে দেন জিহাদে। তো, নবীজি দ্বিতীয় হিজরীর জুমাদাল উলায় গাযওয়ায়ে জিল-আশীরাহর জন্য বের হওয়ার সময় আবু সালামাকেই মদীনার ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে যান। সেই যুদ্ধে বনু মুদলিজ ও তাদের মিত্র বনু দমরাহর লোকেরা মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধি করে।[২]

বদরের বড় (প্রসিদ্ধ বদরযুদ্ধ) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আবু সালামা। তিনশ' তের/চৌদ্দজনের সেই মুবারক কাফেলার তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। তাওহীদ ও পৌত্তলিকতার এই প্রথম সম্মুখ সমরে তিন গুণ বেশি কাফিরদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করেন আবু সালামা ও তাঁর সঙ্গী মুসলিমগণ—যাঁদের কমান্ডিং করছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ।

এরপর উহুদযুদ্ধেও শরিক হন আবু সালামা। এই যুদ্ধে বাহুতে তীর খেয়ে মারাত্মক আহত হন তিনি। কিছুটা চিকিৎসার পর মনে হয়, যে, ক্ষতটি সেরে গেছে।

উহুদযুদ্ধের দুই মাস পরে রাসূল জানতে পারেন—বনু আসাদের লোকেরা মদীনায় হামলা করতে চাইছে; তখন তিনি আবু সালামার নেতৃত্বে দেড়শ' লোকের একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন; যাঁদের মধ্যে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ও সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাসের মতো বিশিষ্ট সাহাবীও ছিলেন।

রাসূলের কথামতো আবু সালামা ভোরের আলো পুরোপুরি ফোটার আগেই শত্রুর ওপর হামলা করেন। আলো-আঁধারির ধোঁয়াশার মধ্যে কোনো প্রকার প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই তাদেরকে ঘিরে ফেলেন এবং এক সফল অভিযান শেষে গনীমতের সম্পদ নিয়ে নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন তিনি ও তাঁর সাথীরা। এই অভিযানের ফলে কাফিরদের মধ্যে আগের সেই মুসলিম-ভীতি

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/৩৪৪; *উয়ূনুল আসার* : ১১৫১১।
[২] *তাবাকাতু ইবনি সাদ* : ০২/০৪; *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/২৪৮; *উয়ূনুল আসার* : ০১/২২৭।

ছেয়ে যায়, উহুদযুদ্ধে যা কিছুটা হালকা হয়ে গিয়েছিল।[১]

এই অভিযানে আবু সালামার সেই ক্ষতটি তাজা হয়ে যায়; এবং চতুর্থ হিজরীর জুমাদাল আখিরার আট তারিখে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত আর ভালো হয়নি তা।

মুমূর্ষু আবু সালামার শিয়রে রাসূল ﷺ হাজির হয়েছিলেন। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত রাসূল তাঁর জন্য কল্যাণের দুআ করেছেন; যখন তিনি নীরব হয়ে গেছেন চিরতরে, তখন রাসূল নিজের হাতে তাঁর চোখদুটো বুজিয়ে দিয়েছেন।

এরপর, তাঁর জানাযা পড়ানোর সময়ে রাসূল নয়টি তাকবীর দিয়েছেন। কেউ বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার ভুল হয়ে গেছে, নাকি ভুলে গেছেন?' রাসূল ﷺ বললেন, 'আরে, আমার ভুল হয়নি, আমি ভুলেও যাইনি, বরং আবু সালামার জন্য আমি এক হাজার তাকবীর দিলেও, তাঁর জন্য তা মানানসই-ই হবে!'[২]

ইবনু আবদিল বার[৩] বলেন, 'আবু সালামা তাঁর ইন্তিকালের সময়ে দুআ করেছিলেন, যে, "আল্লাহ, আপনি আমার পরিবারকে আমার উত্তম প্রতিনিধি দান করুন।" ফলে, দেখা গেল, সেই উত্তম প্রতিনিধি হয়ে রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রী উম্মু সালামাকে বিয়ে করলেন। তিনি হয়ে গেলেন উম্মুল মুমিনীন। আর, তাঁর সন্তানদের জন্যও রাসূল হয়েছেন তাঁর উত্তম প্রতিনিধি।

স্বামীর মৃত্যুর পর উম্মু সালামার যখন ইদ্দত শেষ হলো, তখন আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতো বিশিষ্ট সাহাবীগণ তাঁকে প্রস্তাব দেন। তিনি প্রত্যেকের প্রস্তাবই বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে দেন। এঁদের পরেই রাসূল ﷺ তাঁর কাছে প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠান। প্রস্তাব শুনে তো উম্মু সালামার চোখের তারায় সুখের রঙধনু ভেসে ওঠে; কিন্তু পরক্ষণেই বাস্তবতা উপলব্ধ হওয়ামাত্র তিনি হতাশ হয়ে পড়েন—হায়, যদি রাসূলের ঘরে থাকার সৌভাগ্য হতো! তিনি ভাবতে থাকেন—একে তো আমার এখন যৌবন নেই; দ্বিতীয়ত, আমার সঙ্গে কতগুলো ছোট ছোট বাচ্চা...নাহ, সম্ভব নয়; ওই সৌভাগ্য কপালে নেই! উম্মু সালামা রাসূলের কাছে অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, 'আমার গাইরত, অধিক

---

[১] *তাবাকাতু ইবনি সাদ* : ০২/৩৫; *উয়ূনুল আসার* : ০২/৩৮।

[২] *তারীখু তাবারী* : ০২/১৭৭।

[৩] *আল-ইসতীআব*, 'আবু সালামা আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল আসাদ আল-মাখযূমীর জীবনী অধ্যায়।'

বয়স ও সন্তানদের কারণে আপনার এই সৌভাগ্যপূর্ণ আহ্বানে সাড়া দিতে পারছি না!'

রাসূল ﷺ জবাব দিলেন, 'আরে, আমি নিজেও তো বয়স্ক; তোমার চেয়ে আমার বয়স বেশি; তোমার গাইরত ও অতি-আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ্ দূর করে দেবেন; আর, তোমাদের সন্তানদের নিয়ে কোনো চিন্তা নেই, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ওদের যিম্মাদার।'[১] এরপর, সে-মাসেই (চতুর্থ হিজরীর শাওয়ালে) বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।[২]

আয়িশা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যথাসম্ভব চেষ্টা করছিলেন, যে, নিজেদের মেয়েলি অভিমান চেপে রেখে নববধূকে সৌজন্যপূর্ণ ইস্তিকবাল ও অভ্যর্থনা জানাবেন; কিন্তু আয়িশা শেষপর্যন্ত তা পুরোপুরিভাবে পেরে উঠলেন না; বরং হাফসার কাছে গিয়ে নিজের ব্যথা ও গাইরতের কথা প্রকাশ করে দিলেন। *তাবাকাতু ইবনি সাদ*-এ আয়িশার সূত্রেই বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আগ থেকেই উম্মু সালামার সৌন্দর্য সম্পর্কে জানার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে উম্মু সালামার বিয়ের কথা শুনে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি। এরপর অপেক্ষা করতে থাকি তাঁর আগমনের। যখন তিনি এলেন, দেখলাম—আল্লাহর কসম—আগে যা বলা হয়েছিল, উম্মু সালামা মূলত তারচেয়েও কয়েকগুণ বেশি সুন্দরী। হাফসাকে এই কথা জানালাম। তিনি বললেন, "আরে নাহ, যেমন বলা হয়, উনি তেমন না।" হাফসা উম্মু সালামার অধিক বয়সের কথা বলে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন। হাফসার সঙ্গে আলাপের পরে আমি আবার উম্মু সালামাকে দেখতে গেলাম। দেখলাম—হাফসা ঠিকই বলেছেন, যে, তিনি বয়স্কা। তবু আমার গাইরত তাঁকে সইতে পারছিল না!'

সতীন হিসেবে আগমনে আয়িশার প্রতিক্রিয়া উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার চোখে পড়ার কথা। এবং তাঁর মতো নারী এমন অবস্থায় স্বভাবতই আনন্দিত হয়ে থাকবেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে, এ-জন্যই হয়তো নিজের ছোট

[১] *আস-সিমতুস সামীন* : ৮৯; *আল-মুহাব্বার* : ৮৫; *উয়ূনুল আসার* : ০২/৩০৪; এবং *আল-ইসতীআব* ও *আল-ইসাবাহ*।

[২] *আল-ইসাবাহ* ও *উয়ূনুল আসার*। কিন্তু ইবনু আবদিল বার লিখেছেন, দ্বিতীয় হিজরীতে বিয়েটি হয়েছে; তবে, এই তথ্য ভুল।

মেয়েটির প্রতিপালনে বেশি ব্যস্ত থাকতে চেয়েছেন তিনি,[১] যেন আয়িশা ﷺ প্রিয়তম স্বামীর সঙ্গ পেতে পারেন ঠিকঠাক।

বুখারী ও মুসলিমে উম্মু সালামার হাদীস আছে, যে—'আমি বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু সালামার সন্তানদের জন্য আমি সম্পদ ব্যয় করলে সওয়াব পাব তো? আমি ওদেরকে এভাবে এভাবে ছেড়ে যেতে চাই না। ওরা তো আমারই সন্তান!" রাসূল ﷺ তখন বললেন, "হ্যাঁ, ওদের জন্য ব্যয় করলে তুমি সওয়াব পাবে।"'[২]

এটা স্পষ্ট, যে, উম্মু সালামা ﷺ আত্মমর্যাদাবোধের বিষয়ে খুবই সংবেদনশীল ছিলেন। বংশীয়ভাবে এবং কীর্তিতে যেই মর্যাদা ও শ্রদ্ধার আসন তিনি লাভ করেছিলেন, সেই আসনের দিকে আয়িশা, বা, যে-কারও নজর তাঁর বরদাশত ছিল না। উম্মুল মুমিনীনদের থেকে রাসূল ﷺ কিছু দিন দূরে থাকার পর তাঁদের কাছে আবার তাঁর ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ওকালতিও পছন্দ করেননি উম্মু সালামা। কারণ, তাঁর মতে, উমরের সেই ওকালতিতে একটি 'ভুলচিন্তা'র প্রভাব ছিল। তাই, সেই বিষয়ে উমর যখন তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আলোচনা করতে এসেছেন, তখন তাঁকে বলেছেন—'খাত্তাবের বেটা, আপনাকে দেখে আশ্চর্য লাগে। সবকিছুতেই আপনি হাজির হয়ে যান! এমনকি, রাসূল ও তাঁর স্ত্রীদের মাঝেও ঢুকে পড়তে চাইছেন আপনি!'

এ-সম্পর্কে উমর বলেন, 'উম্মু সালামা আমাকে এমনভাবে কথার মারপ্যাঁচে আটকালেন, যে, এই বিষয় নিয়ে আমার রাগ-ক্ষোভ দূর হয়ে গেল।'[৩]

উম্মু সালামা ﷺ এই কথাগুলো বলেছেন মূলত রাসূল ও তাঁর ঘরে নিজের সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। কারণ, রাসূল ﷺ তো তাঁকে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। একদিন রাসূল ﷺ উম্মু সালামার কাছে ছিলেন। উম্মু সালামার মেয়ে যাইনাবও ছিল সেখানে। একটু পরে ফাতিমা ﷺ তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইনকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। রাসূল তখন ওঁদেরকে বুকে জড়িয়ে বললেন, 'আহলে বাইত, তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহম ও বারাকাহ

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/১৭১; *আস-সিমতুস সামীন* : ৯০।
[২] *আল-লু'লু ওয়াল মারজান* : ০১/২৩৪ (হাদীস-ক্রম : ৫৮৫)।
[৩] *সহীহ বুখারী* : ৪৯১৩; *মুসলিম* : ৩৫৮৪।

বর্ষিত হোক। আল্লাহ তো প্রশংসিত, মর্যাদাবান।' এ-সময়ে উম্মু সালামা কান্না শুরু করেন। রাসূল তাঁকে দরদী স্বরে বললেন, 'কাঁদছ কেন?' তিনি বললেন, 'আপনি আল্লাহর রহম ও বারাকাহ শুধু তাঁদের সঙ্গে বিশেষায়িত করে আমাকে ও আমার মেয়েটিকে বাদ দিয়ে দিলেন!' রাসূল বললেন, 'আরে, তুমি ও তোমার মেয়েও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।'[১]

রাসূলের তত্ত্বাবধানেই এই যাইনাব বড় হয়েছেন। ফলে, যুগের শ্রেষ্ঠ নারী-ফকীহগণের অন্যতম হয়েছিলেন তিনি। তাঁর ব্যাপারে বলা হয়—একবার তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে দেখেন—তিনি গোসল করছেন। রাসূল তাঁকে দেখে তাঁর চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেন। ফলে বয়স হয়ে একেবারে বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়ার পরেও তাঁর চেহারায় যৌবনের দীপ্তি পরিলক্ষিত হতো।[২] উম্মু সালামার পুত্র সালামাকেও বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন রাসূল। শহীদ চাচা হামযার মেয়ে উমামাকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেন তিনি।

বংশবিদ গবেষকগণ বলেন, সালামার সঙ্গে তাঁর মায়ের সম্মানার্থে উমামা বিনতু হামযাকে বিয়ে দেন রাসূল ﷺ। বিয়ের পর রাসূল সাহাবীদের কাছে এসে বলেন, 'দেখলে, তাদের দুজনের কী চমৎকার জুটি হয়েছে!'[৩]

একইভাবে ওঁদের ভাই উমর ও বোন দুররাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানেই বড় হয়েছেন। তাঁরাও সালামা ও যাইনাবের সঙ্গে নবীগৃহের সদস্য ও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

একটি ওহী, একটি পরামর্শ

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার আগমনের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঘরে নাযিল হওয়া ওহীগুলো সাধারণত আয়িশার ঘরে থাকাবস্থায়ই নাযিল হতো। এ-নিয়ে অন্য সতীনদের সঙ্গে গর্ব করতেন আয়িশা। উম্মু সালামা বিনতু যাদির রকব আসার পর তাঁর ঘরে থাকাবস্থায় বেশ কিছু ওহী

[১] *আস-সিমতুস সামীন* : ২০।

[২] *আল-ইসতীআব* ও *আল-ইসাবাহ* : 'যাইনাব বিনতু আবী সালামার জীবনী অধ্যায়'।

[৩] *আল-ইসতীআব* : 'সালামার জীবনী অধ্যায়'; 'উমর ইবনু আবী সালামাহ' ও 'দুররাহ বিনতু আবী সালামাহ' : *তাবাকাতুস সাহাবা*।

নাযিল হয়; এর মধ্যে একটি ছিল সূরা তাওবার ১০২ নম্বর আয়াতের ওহীটি।

এই আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট বয়ান করা হয়, যে, পঞ্চম হিজরীতে রাসূল ﷺ বনু কুরাইযার সঙ্গে যুদ্ধের একপর্যায়ে তাদেরকে অবরোধ করেন। অবরোধ কঠিন আকার ধারণ করলে আল্লাহর তরফ থেকে তাদের অন্তরে ভয় ঢুকে যায়। তারা রাসূলের কাছে আবেদন করে, যে, তাদের প্রতিবেশী আবু লুবাবা ইবনু আবদিল মুনযির আল-আনসারীকে তাদের কাছে পাঠানো হোক; তারা তার সঙ্গে এ-বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করবে। রাসূল ﷺ তাঁকে তাদের কাছে পাঠালেন। তাঁকে দেখামাত্র সেখানকার পুরুষেরা দাঁড়িয়ে গেল। নারী ও শিশুরা চিৎকার করে কান্না শুরু করে দিল। পুরুষেরা জিজ্ঞেস করল, 'আবু লুবাবা, আমাদের কি মুহাম্মাদের কথামতো আত্মসমর্পণ করতেই হবে? তুমি কী বলো?'

আবু লুবাবা বললেন, 'হ্যাঁ, তা তো করতেই হবে। যেহেতু তাঁর (রাসূলের) কথাটি হলো তোমাদের শিরশ্ছেদ!' এটা বলে হাত দিয়ে গলার দিকে ইশারা করলেন তিনি।

কিন্তু এর পরপরেই তাঁর বুঝে এসে গেল, যে, আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে খেয়ানত করে ফেলেছি! (কারণ, হত্যার বিষয়টি গোপন রাখার কথা ছিল)। তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে এলেন তিনি। মসজিদের চত্বরে এসে নিজেকে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেললেন এবং বললেন, যে, 'আল্লাহ আমার পাপের তাওবা কবুল না-করা পর্যন্ত আমি এই জায়গা থেকে যাব না।'

ইবনু হিশাম বলেন, 'আবু লুবাবা ছ'দিন যাবত খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছিলেন। শুধু প্রতি ওয়াক্ত সালাতের সময়ে তাঁর স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিতেন। সালাতের পরে আবার তিনি নিজেকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নিতেন...।'

ইবনু ইসহাক বলেন, 'খবরটা রাসূল ﷺ দেরিতে জানতে পেরেছেন। জানার পর বলেছেন, 'সে সরাসরি আমার কাছে এলে আমি তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতাম; কিন্তু এখন সে যা করে ফেলেছে, এথেকে আমি তাকে মুক্ত করতে পারব না—যতক্ষণ-না আল্লাহ তাকে তাওবা কবুলের মাধ্যমে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন।' এরপর ইবনু ইসহাক তাঁর নিজের সনদে বর্ণনা করেন, 'আবু লুবাবার তাওবা কবুলের ওহী যখন নাযিল হয়, তখন ভোর। নবীজি ﷺ উম্মু সালামার ঘরে। উম্মু সালামা দেখলেন—নবীজি হাসছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনার পবিত্র দাঁতগুলোকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন; কেন হাসছেন আপনি?" নবীজি বললেন, "আবু লুবাবার তাওবা কবুল হয়েছে।" উম্মু সালামা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাঁকে সুসংবাদ দেব না?" নবীজি বললেন, "কেন নয়?"

'অনুমতি পেয়ে উম্মু সালামা ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তখনও উম্মুল মুমিনীনদের ওপর পর্দা ফরয হয়নি। তিনি আওয়াজ করে বললেন, "আবু লুবাবা! সুসংবাদ গ্রহণ করুন! আল্লাহ আপনার তাওবা কবুল করেছেন!" আওয়াজ শুনে লোকেরা ছুটল আবু লুবাবাকে বাঁধনমুক্ত করতে; কিন্তু আবু লুবাবা বললেন, "আমি আল্লাহর রাসূলের হাতেই বাঁধনমুক্ত হতে চাই।" এরপর নবীজি ফজরের সালাতের জন্য যাওয়ার পথে তাঁকে মুক্ত করে দেন।'[১]

ষষ্ঠ হিজরীতে উম্মু সালামা ﷺ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে উমরার জন্য মক্কায় গমন করেন। এই সফরেই কুরাইশরা মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে পবিত্র শহরে প্রবেশে বাধা দেয় এবং পরিণতিতে হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হয়। সে-সময়ে উম্মু সালামা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁর সেই অবদানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়।

ব্যাপার হলো—সন্ধির কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম বড় বিব্রতি ও অস্বস্তিতে পড়ে যান। যুদ্ধ করে জয় লাভ করার অবস্থা থাকা সত্ত্বেও এমন সন্ধিকে নিজেদের জন্য অসম্মানজনক মনে করেন তাঁরা। অবস্থা বোঝার জন্য এইটুকু শোনাতে চাই, যে, যখন সন্ধির ধারাগুলোর ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত হয়ে যায়, এখন বাকি শুধু কাগজ-কলমে লেখাটা, তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রেগে যান। আবু বকরের কাছে গিয়ে বলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ কি আল্লাহর রাসূল নন? আমরা কি মুসলিম নই? ওরা কি মুশরিক নয়?'

প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাবে আবু বকর বললেন, 'অবশ্যই! কেন নয়!'

উমর বললেন, 'তাহলে, কেন আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হীনতর কোনো কিছু মেনে নেব?'

জবাবে উমরকে এমন কথা বলা থেকে সতর্ক করেন আবু বকর; এবং বলেন,

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/২৪৭; ইবনু হিশামের সূত্রে *তারীখু তাবারী*তেও (পঞ্চম হিজরী সন, ০৩/৫৪) এসেছে এই বর্ণনা। *আল-ইসতীআব* : 'আবু লুবাবা ইবনু আবদিল মুনযিরের জীবনী'।

'আমি সাক্ষ্য দিই, যে, তিনি আল্লাহর রাসূল।'

উমর বলেন, 'আমিও তো সাক্ষ্য দিই, যে, তিনি আল্লাহর রাসূল!'

এরপর উমর স্বয়ং রাসূলের কাছে এসে তাঁকেও আবু বকরের মতো প্রশ্ন করতে শুরু করেন। যখন তিনি বলেন, 'তাহলে, কেন আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হীনতর কোনো কিছু মেনে নেব?' তখন রাসূল ﷺ তাঁকে জবাব দেন, 'শোনো, আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি তাঁর আদেশের খেলাফ কিচ্ছু করি না, তিনিও আমাকে কক্ষণও অপমানিত করবেন না।'[১]

এভাবে অবস্থা খুবই গুরুতর হয়ে গেল। একপর্যায়ে নবীজি ﷺ সাহাবীদেরকে উমরার পশু জবাই করে মাথা মুণ্ডন করে ফেলতে বলেন। কিন্তু দেখা গেল—অবস্থার অস্বাভাবিকতায় তাঁরা কেউই তাঁর আদেশ পালনে তৎপর হচ্ছেন না! নবীজি তাঁদেরকে তিন বার একই আদেশ করলেন, তবু কেউ নড়লেন না।

শেষে তিনি স্ত্রী উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলেন। পুরো অবস্থা তাঁকে শোনালেন। উম্মু সালামা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি পছন্দ করলে আমি একটি কথা বলতে চাই। আপনি এখান থেকে বের হোন; এরপর কারও সাথে কোনো কথা না-বলে নিজের পশুটি জবাই করে ফেলুন। এবং একজনকে আপনার মাথা মুণ্ডন করে দিতে বলুন।'

নবীজি ﷺ মনযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনলেন। এরপর বের হয়ে ঠিক সেভাবেই কারও সাথে কোনো কথা না-বলে নিজের পশুটি জবাই করলেন; এবং মাথা মুণ্ডন করলেন। এটা দেখে সাহাবীরা সবাই উঠে নিজেদের পশু জবাই করলেন এবং পরস্পরের মাথা মুণ্ডন করে দিলেন। এ-সময়ে এতক্ষণের কৃতকর্মের অনুশোচনা ও পেরেশানিতে মাথা মুণ্ডন করতে গিয়ে কেউ কেউ তো অপর ভাইকে হত্যাই করে ফেলতে চাইছিলেন যেন!

আবেগের বশবর্তী হয়ে কিছু সময় ভুলের মধ্যে কেটে যাওয়ার পর মুসলিমদের হুঁশ ফিরল। তাঁরা বুঝতে পারলেন—নবীজি ﷺ কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তিটির গুরুত্ব। মূলত, হুদাইবিয়ার সন্ধিকে মুসলিমদের জন্য বিশাল বিজয় বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর অন্যতম কারণ এ-ও, যে, এর আগে ইসলামের কোনো

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/১৩১; *আল-লু'লু ওয়াল মারজান* : ০২/২৬৩।

বিজয়ই এত বেশি কার্যকর প্রমাণিত হয়নি; আর, এই সন্ধির আগে যত সংখ্যক লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে, এর পরেও ঠিক তত সংখ্যক, বরং তারচেয়েও বহু গুণ বেশি লোক ইসলামের সুমিষ্ট শরাব পান করেছে।

খাইবারযুদ্ধেও উম্মু সালামা ﷺ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। এরপর, মক্কাবিজয়, তায়েফ অবরোধ, হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের যুদ্ধ, এবং সবশেষে দশম হিজরীর বিদায় হজেও প্রিয়তম স্বামী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৌভাগ্যপূর্ণ সঙ্গ লাভ করেছিলেন উম্মু সালামা।

এই উম্মাহর পেছনে আছেন আল্লাহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর উম্মু সালামা ﷺ দৈনন্দিনের সাধারণ ব্যস্ততাপূর্ণ জীবন পরিহার করেন। এভাবে একসময়ে উম্মাহর মহাফিতনা দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করে। উম্মু সালামা তখন রাসূলের চাচাতো ভাই, জামাতা ও হাসান-হুসাইনের বাবা আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সমর্থন করে। তাঁর মন চাইছিল—যুদ্ধে গিয়ে আলীর সহায়তায় অবতীর্ণ হতে। কিন্তু 'উম্মুল মুমিনীন' হয়ে এমন কাজে লিপ্ত হওয়াকে তিনি পছন্দ করছিলেন না। তাই, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট হাজির হয়ে নিজের ছেলে উমরকে তাঁর হাতে পেশ করেন। এবং বলেন, 'আমীরুল মুমিনীন! আমি যদি আল্লাহর নাফরমানি না-করতাম, এবং আপনিও আমার সেই কাজকে সমর্থন না-করতেন, তাহলে, আমি সত্যিই আপনার সহায়তার জন্য যুদ্ধে বের হয়ে যেতাম! কিন্তু তা তো হচ্ছে না... আপনি বরং আমার ছেলে উমরকে গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম, ও আমার কাছে আমার নিজের চেয়েও অধিক প্রিয়। সে আপনার সঙ্গে গিয়ে যুদ্ধ করবে এবং আপনার সহযোগিতা করবে।'[১]

এরপর তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে যান এবং নিজের অপছন্দিদাহ প্রকাশ করে তাঁকে বলেন, 'এটা তোমার কোন ধরনের বের হওয়া! এই উম্মাহর পেছনে তো আল্লাহই আছেন! আমি যদি তোমার মতো এই কাজ করতাম, এরপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হতো, তাহলে, রাসূলের দিয়ে-

[১] উটের যুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সঙ্গে শরীক হয়েছিলেন এই উমর ইবনু আবী সালামা। আলী তাঁকে পারস্য ও বাহরাইনের গভর্নরও নিযুক্ত করেছিলেন।

যাওয়া পর্দার বিধান লঙ্ঘনকারী অবস্থায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আমি লজ্জিত হতাম!' কিন্তু পরিস্থিতির প্রয়োজনে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে সেই মুহূর্তে নিজের গৃহীত কর্মপন্থা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ ছিল না। তাই উম্মু সালামার পরামর্শ তিনি আমলে নিতে পারেননি।

বয়সের চাকা উম্মু সালামাকে নিয়ে যায় বহুদূর। এমন এক সময়ে গিয়ে তিনি উপস্থিত হন, যখন তাঁকে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়; বরং পুরো ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ তখন কারবালার অশুভ প্রান্তরে ইমাম হুসাইন ও আহলে বাইতের লড়াই-হত্যা নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন।

এই কঠিন পরিস্থিতির অব্যবহিত পরেই উম্মু সালামা রওনা হয়ে যান সেই রূপ ও মায়ার দেশে, যেখানে তাঁর জন্য জান্নাতের মহাসিংহাসনে প্রতীক্ষায় আছেন দোজাহানের সরদার নবী মুহাম্মাদ ﷺ।

সঠিক মতানুযায়ী, হযরত হুসাইনের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরে তাঁর ইন্তিকাল হয়। তবে, কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, উম্মু সালামার মৃত্যু হয়েছে ৫৯ হিজরীতে।[১]

হযরত আবু হুরাইরা ﷺ তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। মুসলিমরা জান্নাতুল বাকী'র দিকে শোকছায়াঘন পথে হাঁটতে থাকেন, প্রতিটি কদমে তাঁদের বুক ফেটে অস্ফুটে বেরিয়ে আসে—দুনিয়ার বুক থেকে আজ বুঝি শেষ উম্মুল মুমিনীনের চিরবিদায়...

আসলে কি বিদায়? কুতুবে সিত্তায় নবীজি থেকে বর্ণিত তাঁর হাদীসগুলো, তাঁর ছেলে সালামা ও মেয়ে যাইনাবের বর্ণনাগুলো[২] কি তাঁকে হারিয়ে যেতে দেবে জগতের নির্মল আলোর আঙিনা থেকে? না, কক্ষণও না!

---

[১] *আল-ইসাবাহ; তাহযীবুত তাহযীব* : ১২/৪৫৬ (হিন্দ বিনতু আবী উমাইয়া আল-মাখযূমিয়্যাহর জীবনী)। *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৯২৮।

[২] দেখুন—*তাহযীবুত তাহযীব*, *খুলাসাতুত তাহযীব* ও *আল-ইসাবাহ*'র 'হিন্দ বিনতু আবী উমাইয়া', 'উমর ইবনু আবী সালামা' ও 'যাইনাব বিনতু আবী সালামা'র জীবনী অধ্যায়।

শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র ও শ্রেষ্ঠ অভিভাবকে বিয়ে হল যাঁর

যাইনাব বিনতু জাহশ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কিন্তু আপনার অন্য স্ত্রীদের মতো নই; তাঁদেরকে তাঁদের বাবা, ভাই, কিবা, পরিবার আপনার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে; আর, আমাকে আপনার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন আসমান থেকে স্বয়ং মহান আল্লাহ।'

–যাইনাব বিনতু জাহশ ﵂।

[*আল-ইসাবাহ*]

এক অভিজাত রমণী ও এক আযাদকৃত গোলাম[১]

উম্মু সালামা ﵂ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে আগমন করেন, তখন তাঁর সৌন্দর্য নিয়ে আয়িশা ﵂ নিজের শঙ্কার কথা হাফসাকে জানান। হাফসা জবাব দেন, 'উম্মু সালামা সুন্দরী হলেও, বয়স্কা, সুতরাং তাঁর দিকে নজর দেওয়ার দরকার নেই; বরং তাঁরচেয়ে আরও উচ্চপর্যায়ের কেউ আগমন করে কিনা—দেখো।'

মনে হয় যেন হাফসা গায়িব জেনে কথা বলেছেন; কারণ, নবীজি উম্মু সালামাকে বিয়ে করার এক বছরের মাথায়, বা, তারও আগেই নবীগৃহে আগমন ঘটে এমন একজনের, যিনি উম্মুল মুমিনীনদের কাছে উম্মু সালামার চেয়ে আরও বেশি ঈর্ষার পাত্রী ছিলেন। আর তিনি হলেন যাইনাব বিনতু জাহশ ইবনি রিআব আল-

[১] আরবীতে গোলাম অর্থ দাস।

আসাদিয়্যাহ ﷺ।[১] অত্যন্ত সুন্দরী, অভিজাত ও চমৎকার এক নারী ছিলেন তিনি। ছিলেন বনু আসাদ ইবনু খুযাইমার মেয়ে, এবং আবদুল মুত্তালিবের নাতনী। তাঁর মা ছিলেন উমাইমা বিনতু আবদিল মুত্তালিব; রাসূলের ফুফু।

যাইনাব তাঁর যৌবন, সৌন্দর্য, বা, নবীর নিকটাত্মীয়া হওয়ার বৈশিষ্ট্য নিয়ে গর্ব করতে চাইলে, এ-ই তাঁর জন্য অনেক হয়ে যেত। তাঁর এসব বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটিই হলো এমন, যার কারণে নবীগৃহের পুরাতন বাসিন্দাদের ভেতরে জ্বলন সৃষ্টি হতে পারে। আর, এটা কেনই-বা হবে না? আল্লাহর আদেশেই তো তাঁর বিয়ে হয়েছে; কুরআনেও যার বর্ণনা আছে।

যাইনাব বিনতু জাহশের মতো অন্য কারও বিয়েতে পুরো মদীনা অতটা মেতে ওঠেনি; কারণ, এই বিয়ের প্রেক্ষাপট ও একে ঘিরে সংঘটিত নানান বিষয়াশয়; যেগুলোকে ওহীর মাধ্যমে পুরোপুরি খোলাসা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ।

পুরো ঘটনা ভালোভাবে বোঝার জন্য আমাদেরকে একটু পেছনে যেতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতেরও আগে একবার হাকীম ইবনু হিযাম ইবনি খুওয়াইলিদ আল-আসাদী একটি বাণিজ্যিক সফর থেকে ফিরেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিল যাইদ নামীয় একটি আট বছরের গোলাম শিশু।

মূলত এই শিশু যাইদ 'গোলাম' ছিলেন না; ছিলেন বনু যাইদুল লাতের কালব ইবনু ওয়াবরাহ আল-কুযায়ী আল-কাহতানীর অধস্তন পুরুষ—যাইদ ইবনু হারিসা ইবনি শুরাহীল ইবনি কা'ব আল-কালবী। একদিন যাইদ তাঁর মা সুদা বিনতু সা'লাবার সঙ্গে নানাবাড়ি বনু মা'ন ইবনি তাই গোত্রের এলাকায় যাচ্ছিলেন। পথে বনু কইন ইবনু জিসর গোত্রের এক অশ্বারোহী ডাকাতদল যাইদকে তাঁর মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। এরপর এক বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দেয়। সেখান থেকেই তাঁকে কিনে আনেন হাকীম ইবনু হিযাম।

হাকীম বাড়িতে আসার পর তাঁর বাড়িতে বেড়াতে আসেন তাঁর ফুফু খাদীজা; যিনি তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। হাকীম তাঁকে হাদিয়া স্বরূপ যেকোনো একটি শিশু গোলাম নিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করেন। বাধ্য হয়ে

[১] যাইনাবের জীবনী দেখুন—*তাবাকাতু ইবনি সাদ*, *আল-ইসতীআব*, *আল-ইসাবাহ*, *তাহযীবুত তাহযীব* ইত্যাদি গ্রন্থে; এ ছাড়াও দেখতে পারেন—*আল-মুহাব্বার* : ৮৫, *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/৩৯৮, *আস-সিমতুস সামীন* : ১০৭, *উয়ূনুল আসার* : ০২/৩০৪।

খাদীজা তখন যাইদকে নির্বাচন করে বাড়ি নিয়ে যান। নবীজি যাইদকে দেখে পছন্দ করে ফেলেন। খাদীজা ﵂ প্রিয়তম স্বামীকে তৎক্ষণাৎ উপহার স্বরূপ প্রদান করেন 'অভূতপূর্ব গুণধর গোলাম' যাইদ ইবনু হারিসাকে।[১]

এদিকে যাইদের বাবা হারিসা ইবনু শুরাহীল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতায় দিশাহারা। যাইদকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁর জান যায়-অবস্থা। বহু খোঁজাখুঁজির পরে তিনি যাইদের মক্কায় অবস্থানের কথা জানতে পারেন। এরপর ভাই কা'বকে নিয়ে ঠিকানা বের করে করে তিনি উপস্থিত হন কাবার কাছে মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহর সামনে। রাসূলকে তাঁরা বললেন, 'হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান, হে গোত্রপতির সন্তান, আপনারা তো আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী। আপনারা তো বন্দীদেরকে মুক্ত করেন। ক্ষুধার্তকে আহার দান করেন। আমরা আপনার কাছে আমাদের ছেলেটির জন্য এসেছি। অনুগ্রহ করে মুক্তিপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দেবেন কি?'

তিনি বললেন, 'এ-ছাড়া অন্য কোনো উপায় কি নেই?'

তাঁরা বললেন, 'কী সেই উপায়?'

তিনি বললেন, 'আমি তাকে ডেকে স্বাধীনতা দেব। আমাদের দুপক্ষের যাকে ইচ্ছা সে বেছে নেবে। এরপর সে আপনাদেরকে বেছে নিলে তা-ই হবে। আর, আমাকে বেছে নিলে, আল্লাহর কসম, যে আমাকে বেছে নিয়েছে, তার জায়গায় আমি অন্য কাউকে গ্রহণ করব না!'

তাঁরা উভয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, 'আরে, আপনি তো ইনসাফের চেয়েও বহু ঊর্ধ্বের কথা বলেছেন!'

যাইদকে ডাকা হলো। বাপ-চাচাকে তিনি চিনতেও পারলেন; এরপর রাসূল ﷺ তাঁকে স্বাধীনতা দিলেন—চাইলে তাঁদের সঙ্গে চলে যেতে পার; আবার, ভালো মনে হলে আমার কাছেও থাকতে পার।

---

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/২৬৪। তবে, *তারীখু তাবারী* (০২/২১৫) ও *আল-ইসতীআবে* (০২/৫৪৪) আরেকটি বর্ণনা আছে, যে, হাকীম তাঁর ফুফু খাদীজার জন্যই উকায বাজার থেকে চারশ' দিরহাম দিয়ে যাইদকে খরিদ করেছিলেন। এরপর নবীজির সঙ্গে খাদীজার বিয়ে হয়ে গেলে খাদীজা গোলামটি হাদিয়া করেন স্বামীকে। নবীজি গোলামকে আযাদ করে পুত্র বানিয়ে নেন। এটা ছিল নবুওয়াতের আগের ঘটনা। এর কাছাকাছি বর্ণনা আছে *আস-সিমতুস সামীনে* (১০৮)।

যাইদ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুনিবকে বেছে নিলেন!

বাবা তাঁকে বললেন, 'যাইদ, তুমি কি মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন ও নিজের এলাকার বদলে দাসত্ব গ্রহণ করবে?'

যাইদ বলতে চাচ্ছিলেন, 'আমি এই ব্যক্তির নিকট এমন কিছু দেখেছি ও পেয়েছি, যেটার কারণে আমি আর কক্ষণও তাঁকে ছেড়ে যেতে প্রস্তুত নই।' এর মধ্যেই নবীজি তাঁর হাত ধরে কুরাইশের একটি মজলিসের সামনে দাঁড়ালেন। এরপর তাদেরকে সাক্ষী রেখে যাইদকে নিজের ওয়ারিসী পুত্ররূপে ঘোষণা করেন।

এরপর থেকে তাঁকে 'যাইদ ইবনু মুহাম্মাদ' নামে ডাকতে শুরু করে লোকেরা। (তরুণ) আলী ইবনু আবী তালিবের পর যাইদই প্রথম শিশু হিসেবে ইসলামে দাখিল হন। হিজরতের পর নবীজি যখন মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে 'ভাই-ভাই সম্পর্ক' তৈরি করে দিয়েছিলেন, তখন যাইদকে হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিবের ভাই বানানো হয়। এরপর নবীজি তাঁর জন্য নিজের ফুফাতো বোন যাইনাব বিনতু জাহশকে নির্বাচন করেন।

এক আযাদকৃত গোলামের সঙ্গে এক স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত রমণীর বিয়েকে কোনোভাবেই মানতে পারছিলেন না যাইনাব ও তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনু জাহশ। তাঁরা উভয়ে মামাতো ভাই ও রাসূল মুহাম্মাদের কাছে আবেদন করলেন, যেন এমন একটি অপছন্দের বিষয় তিনি তাঁদের প্রতি চাপিয়ে না-দেন। এর আগেও তো সম্ভ্রান্ত ঘরের নারীরা কোনো গোলামকে বিয়ে করত না; সেই গোলাম আযাদকৃত হলেও না। আরেকদিন যাইনাব বললেন, 'আমি তাকে কক্ষণও বিয়ে করব না।'

নবীজি তখন তাঁদের সামনে ইসলাম ও ইসলামের নবীর কাছে যাইদের গুরুত্বের ব্যাপারটি তুলে ধরলেন। এবং এ-ও বললেন, 'যাইদ কিন্তু মূলত গোলাম নয়, বরং মা-বাবা উভয়ের দিক থেকেই সে খাঁটি আরব।'

তবু, রাসূলের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা এবং তাঁর আনুগত্যের পূর্ণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এই বিয়েকে মানতে পারছিলেন না। অবশেষে তাঁদের এই বিষয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۝

> *'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ইচ্ছা-স্বাধীনতা নেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।'*[১]

তখন, 'কেউ কারও ওপর কেবল তাকওয়ার মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠত্ব পেতে পারে'—ইসলামের এই মৌলিক নীতির আনুগত্য ঠিক রাখতে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালনার্থে যাইদকে বিয়ে করেন যাইনাব। রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।

আসমানী বিয়ে

যাইদ ও যাইনাবের বিয়ে হয়েছে ঠিক, কিন্তু তাঁদের যৌথ-জীবনকে আর যা-ই হোক—স্বামী-স্ত্রীর জীবন বলা যায় না। কারণ, যাইনাব বিনতু জাহশ তাঁর বংশগত আভিজাত্যের কথা ভুলতে পারছিলেন না। তাঁর স্বামী এমন ব্যক্তি—যিনি কি না এককালে গোলামরূপে এসেছিলেন তাঁরই পরিবারে—এ তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। ফলে দুজনের সংসারে একটা দূরত্ব লেগেই থাকত।

যাইনাবের এমন মনোভাব যাইদ ইবনু হারিসাও নিতে পারছিলেন না। তিনি একাধিকবার রাসূলের কাছে এ-নিয়ে অনুযোগ করেন। জবাবে রাসূল তাঁকে সবর ও সহনশীলতার উপদেশ দেন। তাঁকে বলেন, 'আল্লাহকে ভয় করো। স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীনে রাখো।'

এরপরের ঘটনা সুদ্দীর সূত্রে ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন, যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন—খুব শিগগির যাইনাব হতে যাচ্ছে আপনার স্ত্রী। ওহীর এই সংবাদে তিনি যেন বিব্রত হয়ে পড়লেন। পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে, মানুষ কত না কিছু বলবে এ নিয়ে! নবীজি সমাজের কটূ কথার ভয়ে, লজ্জায় আর যাইদকে বলতে পারেননি—'আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও, ওহীর সংবাদ এসেছে, যাইনাবের বিয়ে হবে আমার সঙ্গে।'

[১] সূরা আহযাব : ৩৬।

এইদিকে যাইদ আর যাইনাবের দিকে ক্রমশ ধেয়ে আসছিল ভাঙনের শব্দ। এরই মধ্যে একদিন যাইদ এসে এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেই ফেললেন, 'আমি কি তাঁকে তালাক দিয়ে দেব?' কিন্তু নবীজি বললেন, 'কেন? তাঁর কোনো ব্যাপার কি তোমার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে?' যাইদ বললেন, 'না, এমন কিছু নয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁর কোনো কিছুতেই আমার সন্দেহ জাগেনি। আমি তো তাঁকে ভালোই জানি। তবে, সে আমার ওপর নিজের আভিজাত্য নিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে। তার মধ্যে এ-নিয়ে অহঙ্কার কাজ করে। এবং এ-কারণেই সে তার কথাবার্তায় আমাকে কষ্ট দেয়।' নবীজি বললেন, 'তবু, তাকে তোমার বিবাহাধীনেই রাখো।'

যাইদ মেনে নিলেন। কিন্তু এতে তিনি মূলত নতুন করে আবারও কষ্ট, ব্যথা ও বেদনা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে এলেন। তিনি ঘরে এলেন ঠিকই, কিন্তু যাইনাব আগের মতোই থাকলেন। বংশীয় আভিজাত্য তিনি ভুলতে পারছিলেন না। এভাবে আরও কিছু দিন যাওয়ার পরে যাইদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। নিজেকে আর বোঝাতে পারলেন না তিনি। ফলে, তালাকের মাধ্যমে যাইনাবের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন।

চিরস্মরণীয় ওলীমা, এল পর্দার বিধান

যাইদ ইবনু হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার বিচ্ছেদের পরে একদিন নবীজি ﷺ আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে বসে কথা বলছিলেন। এই সময়ে তাঁর মধ্যে কিছুটা অচেতনতা ভর করল; খানিক বাদে সেই অবস্থা কেটে গেলে হাসতে হাসতে তিনি বললেন, 'যাইনাবকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য কে আছে?' তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন—

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ ۗ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝

> *'স্মরণ করুন, আল্লাহ যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি যখন তাকে বলছিলেন, 'তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো এবং আল্লাহকে ভয় করো'; তখন আপনি অন্তরে এমন বিষয় (যাইনাবের সাথে বিয়ের আসমানী ফায়সালা) গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ অচিরেই প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যাইদ যখন যাইনাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সঙ্গে বিয়ে দিলাম; যেন মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে, তাদেরকে বিয়ের ক্ষেত্রে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর আদেশ তো বাস্তবায়িত হয়ই।'*[১]

এমন অতুলনীয় আনন্দের খোশখবর দেওয়ার জন্য সুসংবাদদতা যেন হাওয়ায় উড়ে হাজির হলো যাইনাবের কাছে। কেউ বলেছেন, এই সুসংবাদবাহী ছিলেন রাসূলের সেবিকা সালমা; আবার কেউ বলেছেন, স্বয়ং যাইদ এই খবর নিয়ে গিয়েছিলেন। খবর শোনামাত্র যাইনাব যেন আনন্দের তুমুল ঢেউয়ে ভেসে গেলেন। সবকিছু ছেড়ে তক্ষুণি তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন রবের শোকর জানাতে—খুশি ও কৃতজ্ঞতার সালাতে।[২]

এই বিয়ের ওলীমা হয়েছিল অনেক জমজমাট। নবীজি ﷺ বকরি জবাই করেন। খাদিম আনাসকে মানুষের কাছে দাওয়াত দিয়ে পাঠান। দলে দলে মানুষ আসতে থাকে। একদল খেয়ে বের হয়, তো, আরেকদল প্রবেশ করে। আনাস ﷺ বলেন, 'এভাবে সবার খাওয়া শেষ হলে, নবীজি আমাকে বললেন, "আনাস, পাত্র উঠিয়ে নাও।"'

আগতদের কিছু লোক রাসূলের ঘরে বসেই আড্ডা-আলাপে মগ্ন হয়ে যায়। রাসূল তাদের কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকেন। তাঁর স্ত্রী বসে থাকেন দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে। তাদের এই অযথা অবস্থান রাসূলের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আরেক বর্ণনায় আছে—আনাস বলেন, 'সবাই চলে যাওয়ার পর দুজন লোক

[১] সূরা আহযাব : ৩৭। *তাবাকাতু ইবনি সাদ* ও সেটির সূত্রে *আল-ইসাবাহ*।
[২] *তারীখু তাবারী* : ০৩/৪৩।

বসে বসে আলাপ করছিল। বের হচ্ছিল না। অবস্থা দেখে নবীজি তাঁর স্ত্রীদের কাছে গেলেন। একে একে তাঁদের সবার সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময় করলেন। তাঁরাও রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার পরিবারের অবস্থা কেমন লাগল?" তিনি জবাব দিলেন, "ভালো।" স্ত্রীদের কাছ থেকে কথা সেরে রাসূল ফিরে এলেন। আমিও ফিরে এলাম তাঁর সঙ্গে। দরজার কাছে আসতেই দেখলেন—ওই দুই লোক এখনও কথা বলে চলেছে! কিছুক্ষণ পরে তারা বেরিয়ে গেল। আল্লাহর কসম, লোক দুজন বেরিয়ে যাওয়ার খবর আমি রাসূলকে দিয়েছিলাম, নাকি তাঁর নিকটে ওহী এসেছিল—আমার মনে নেই। এরপর আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। খানিক বাদেই আল্লাহ তাআলা সূরা আহযাবের পর্দার আয়াতটি নাযিল করেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ؕ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝

"হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে, তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ কোরো না। তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ কোরো; অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা-আপনি চলে যেয়ো; কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না; নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্যকথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর

> *ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।"'*[১]

সেদিন থেকেই নবীর স্ত্রীগণ ও সমস্ত মুমিন নারীর ওপর পর্দা ফরয হয়ে যায়। পর্দা হয়ে ওঠে তাঁদের মর্যাদা, সম্মান, আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও নিরাপত্তার প্রতীক।

পঞ্চম হিজরীতে বিয়ের সময়ে নবীগৃহের এই নববধূর বয়স (সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী) ছিল ৩৫ বছর।[২] তাঁর মূল নাম ছিল বাররাহ। নবীজি তা পরিবর্তন করে রাখেন 'যাইনাব'। সহীহ মুসলিমে রাসূলের পোষ্য যাইনাব বিনতু আবী সালামার বর্ণনা এসেছে, যে, 'আমার নাম ছিল বাররাহ, নবীজি তা পরিবর্তন করে রাখেন যাইনাব। এরপর যাইনাব বিনতু জাহশ আসেন তাঁর ঘরে; তখন যাইনাবের নামও ছিল বাররাহ; নবীজি তা পরিবর্তন করে যাইনাব রাখেন।'[৩]

শ্রেষ্ঠ দূত ও অভিভাবকের গৌরব তাঁর

এই বরকতময় বিয়ের মাধ্যমে যাইনাব বিনতু জাহশ ﵂ এমন এক বিরল বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হন, যা অন্য উম্মুল মুমিনীনদের ছিল না। আর তা হলো, স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তাঁর বিয়ের অভিভাবকত্ব করেছেন, নিজেই রাসূলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া সৌন্দর্য, বংশগৌরব, রাসূলের আত্মীয়তার মতো গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়গুলো তো তাঁর আছেই। ফলে অন্য উম্মুল মুমিনীনগণের কাছে তিনি যেমন ঈর্ষণীয় ছিলেন, তেমনি তাঁদের কাছে এই বিরল বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করে নিজেও গর্ব করতেন। নিজেদের একান্ত ঘরোয়া মজলিসগুলোতে তিনি প্রায়ই বলতেন, 'বিয়ের দূত ও অভিভাবকের বিবেচনায় আমি তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তোমাদেরকে বিয়ে দিয়েছে পরিবার; আর, আমাকে বিয়ে দিয়েছেন সপ্ত আসমানের ওপর থেকে স্বয়ং আল্লাহ।'[৪]

উম্মুল মুমিনীনদের নিজেদের মধ্যে নারীসুলভ একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। প্রায়ই

---

[১] সূরা আহযাব : ৫৩। সহীহ *বুখারী* ও *মুসলিমে* বিবাহ অধ্যায়ে নববধূর ওলিমী বিষয়ে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। *আল-লু'লু ওয়াল মারজান* : ০২/১০৮।

[২] *আল-ইসাবাহ* : ০৮/৯৩; *উয়ূনুল আসার* : ০২/৩০৪।

[৩] *মুসলিম* : ৫৫০১।

[৪] *তাবাকাতু ইবনি সাদ* : ০৮/৭৩; *আল-মুহাব্বার* : ৮৬; এ ছাড়াও দেখুন *আল-ইসতীআব*, *আল-ইসাবাহ* ও *উয়ূনুল আসার*।

ঘরোয়া মজলিসে তাঁরা মিষ্টি-মধুর তর্ক-বিতর্ক করতেন। সেখানে প্রধানত দুটি পক্ষ থাকত। একটি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার। আরেকটি উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার। এই দুজনকে কেন্দ্র করেই অন্য উম্মুল মুমিনীনগণ দুই দলে ভাগ হতেন। যাইনাব বিনতু জাহশ ﵂ আসার পর উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার দলে ভিড়লেন। এবং একসময় তিনিই হয়ে উঠলেন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিপরীত শিবিরের কেন্দ্রবিন্দু। আয়িশা তাই বলেছিলেন, 'নবীর স্ত্রীদের মধ্য থেকে শুধু যাইনাবই আমার প্রকৃত প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।' [১]

অনেকসময় রাসূলের উপস্থিতিতেই তাঁদের উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নানান কথাবার্তা শুরু হয়ে যেত। রাসূল তখন তাঁদেরকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে চলে যেতেন। কারণ, নবীজি হয়তো বুঝতেন—এই মিষ্টি-মধুর তর্ক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই তাঁরা নিজেদের একত্রবাসের সুখ খুঁজে নেন।

এমনই একবার আয়িশা ﵂ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন যাইনাবের ওপর জয় লাভ করতে। অবস্থা দেখে রাসূল ﷺ হেসে ফেললেন। বললেন, 'আরে, এ তো আবু বকরের কন্যা!' [২]

আরেকবার, রাসূল ﷺ আয়িশার ঘরে ছিলেন; এ-সময়ে রাসূলের কাছে কিছু হাদিয়া এল। সেখান থেকে তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে কিছু কিছু করে পাঠালেন। তো, যাইনাবের কাছে যেটুকু পাঠানো হয়েছিল যাইনাব তা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। আয়িশা এতে মনঃক্ষুণ্ণ হলেন, তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, 'উনি তো আপনার হাদিয়া ফেরত দিয়ে আপনাকে ছোট করলেন!'

নবীজি তখন খানিকটা রেগে উঠে বললেন, 'তোমরা আল্লাহর কাছে এতটা উচ্চতায় এখনও পৌঁছাওনি, যে, আমাকে ছোট করতে পারবে!' [৩]

রাসূল ﷺ দিনের বেলা যাইনাব বিনতু জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে গেলে তিনি রাসূলকে মধু দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। নবীজিও বেশ খানিক সময় বসতেন তাঁর ঘরে। নারীসুলভ চাঞ্চল্য থেকে আয়িশা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ভাবলেন—যাইনাব মধু দিয়ে আপ্যায়নের ছুতোয় বেশ খানিক সময় নবীজিকে

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/৩১১।

[২] *সহীহ বুখারী*, মানাকিবু আয়িশা অধ্যায়; আর, *মুসলিম*, ফাযাইলু আয়িশা অধ্যায়।

[৩] *আস-সিমতুস সামীন* : ৪০।

ধরে রাখবেন, আমাদের চেয়ে বেশি সান্নিধ্য তিনি গ্রহণ করবেন, এ হয় না! তাঁরা দুজনে মিলে কৌশল তৈরি করলেন—ওখান থেকে ফিরে রাসূল যাঁর কাছেই যাবেন, সে-ই রাসূলকে বলবে, 'আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে।' অন্য উম্মুল মুমিনীনদেরকে তাঁরা এই ফন্দির ওপর একমত করিয়ে নেন। পরের কাহিনী আমরা আয়িশা ও হাফসার জীবনী অধ্যায়ে আলোচনা করে এসেছি।[১]

সবার চেয়ে লম্বা হাত

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি যখন জঘন্যতম এক অপবাদ দেওয়া হয়, যাকে আমরা ইফকের ঘটনা নামে স্মরণ করি, তখন, নিজেদের ভেতরের এসব প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে একপাশে রেখে আয়িশার পক্ষে কথা বলতে সামান্য দ্বিধা বোধ করেননি আবদুল মুত্তালিবের দৌহিত্রী যাইনাব বিনতু জাহশ ﷺ। তাঁর এই মহান ভূমিকার প্রতি আয়িশাও নানাসময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। যুহরীর সূত্রে ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় আয়িশা বলেন, 'ওই ন্যাক্কারজনক অপবাদে সবচেয়ে বড় যিম্মাদার ছিল আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূল, মিসতাহ ও হামনাহ বিনতু জাহশ। হামনাহর বোন যাইনাব তো রাসূলের স্ত্রী ছিলেন; এবং রাসূলের কাছে আমার যেই অবস্থান, তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু তিনিই করতে পারতেন। ...তো, যাইনাবকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ভালো ব্যতীত কোনো কথা বলেননি। আল্লাহ তাঁকে তাঁর দ্বীনদারির উসীলায় কোনো ধরনের কাদা ছোঁড়া থেকে হেফাজত করেছেন। কিন্তু হামনাহ বিনতু জাহশ তো এমন কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছিল, যেগুলোর কারণে আমি তো কষ্ট পেতামই; তাঁর বোন যাইনাবের জন্যও তখন খারাপ লাগত আমার। অবশ্য, সেসব কথার কারণে হতভাগী তো সে নিজেই হয়েছে।'[২][৩]

---

[১] মধু ও মাগাফিরের হাদীসটি মুত্তাফাক আলাইহি (বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা)—*আল-লু'লু ওয়াল মারজান* ০২/১২৭।

[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/৩১২; এ ছাড়া সহীহাইনে যুহরী রহিমাহুল্লাহর বর্ণনায় ইফকের হাদীস তো আছেই।

[৩] উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যকার সম্পর্কের চিত্র কেমন ছিল, এই বর্ণনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিত্ব হিসেবে তো সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেনই, স্বামী হিসেবেও ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁর ভালোবাসা ও সান্নিধ্য প্রাপ্তিতে তাঁর পবিত্রতমা স্ত্রীদের মধ্যে নারীসুলভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু পারস্পরিক হৃদ্যতায় তাঁরা ছিলেন পৃথিবীর সকল সতীনের জন্য অনন্য উদাহরণ। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে দু-একবার তাঁরা সীমা অতিক্রমের পর্যায়ে চলে গিয়েছিলেন ঠিক,

সর্বোপরি যাইনাব বিনতু জাহশ ছিলেন সত্যনিষ্ঠ পরহেযগার এক নারী। তাঁর সাংসারিক প্রতিদ্বন্দ্বী আয়িশাই এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন। বলেছেন, 'যাইনাবের চেয়ে উত্তম কোনো দ্বীনদার, তাকওয়াবান, সত্যবাদী, দানশীলা, আত্মীয়-স্বজনের হাল-অবস্থার ব্যাপারে সচেতন ও আল্লাহর নৈকট্যলাভের পথে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেওয়ার মানসিকতা লালনকারী নারী আমি কখনো দেখিনি।'[১]

আরেক হাদীসে এসেছে—নবীজি ﷺ উমর ইবনুল খাত্তাবকে বলেছেন, 'যাইনাব বিনতু জাহশ হলো আওওয়াহ।' এক লোক জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আওওয়াহ কী?' নবীজি বললেন, 'নম্র ও সবিনয় প্রার্থনাকারী।' এরপর নবীজি তিলাওয়াত করলেন—

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۝

> *'নিশ্চয় ইবরাহীম সহনশীল, বিনয়-নম্র ও আল্লাহমুখী।'*[২]

যাইনাব ؓ একই সঙ্গে দানশীলা ও উদার নারী ছিলেন। যে-জিনিস হাতে ভালো করতে পারতেন, সেটা বানিয়ে দুস্থদের মাঝে বিতরণ করতেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর এমন পরিজন, যাঁকে আল্লাহ বিশেষ সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন; এবং তাঁকে ছাড়া সেই সম্মান আর কাউকেই দান করেননি।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল-পরবর্তী সময়ে তাঁর পবিত্রতমা অন্য সব স্ত্রীই যাইনাবের প্রশংসা করেছেন। বলেছেন—যাইনাব ছিলেন রাসূলের প্রিয় স্ত্রী, মুমিনদের দরদী মা ও রবের অনুগত এক বান্দী।

উম্মু সালামা ؓ যাইনাবের আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর প্রতি মায়াভরা কথা বলেছেন। আয়িশা ও তাঁর মধ্যকার উষ্ণ প্রতিযোগিতার প্রতিও ইশারা করেছেন। এরপর বলেছেন, 'যাইনাব ছিলেন রাসূলের মোহনপ্রেমী স্ত্রী; রাসূল তাঁর কাছে দীর্ঘ দীর্ঘ সময় যাপন করতেন। তিনি ছিলেন নেককার, সালাত ও

কিন্তু পরক্ষণেই ঐশী সতর্কবাণী কিংবা নবীজির নসীহত তাঁদেরকে সংশোধনের পথ বাতলে দিয়েছে এবং তাঁরাও সর্বান্তকরণে সে-পথ অবলম্বন করেছেন। —সম্পাদক।

[১] *আল-ইসতীআব, আল-ইসাবাহ, আস-সিমতুস সামীন* : ১১০।

[২] *আল-ইসতীআব, আল-ইসাবাহ*। সূরা হুদ : ৭৫।

সাওম পালনকারী। নিজের হাতে নানারকম জিনিস তৈরি করে অসহায়দেরকে দান করতেন।'

যাইনাবের ইন্তিকালের খবর পেয়ে আয়িশা ﵂ বলেছিলেন, 'এক সুপ্রশংসিত ইবাদাতগুজার নারী চলে গেলেন। যিনি ছিলেন বহু এতীম ও বিধবার আশ্রয়স্থল।' এরপর বললেন, 'নবীজি বলেছেন, "তোমাদের মধ্য থেকে যার হাত সবচেয়ে বেশি লম্বা, সে-ই অন্য সবার আগে আমার সঙ্গে মিলিত হবে পরপারে।" তো, রাসূলের ইন্তিকালের পর আমরা সবাই নিজেদেরই কারো ঘরে একত্র হলে, দেয়ালে হাত লাগিয়ে পরিমাপ করতাম। এভাবে, হঠাৎ দেখা গেল, যাইনাবের ইন্তিকাল হয়ে গেছে, অথচ তাঁর হাত অন্য সবার হাতের চেয়ে লম্বা ছিল না। তখন আমরা বুঝতে পারলাম, নবীজি 'লম্বা হাত' বলে বেশি বেশি সাদাকা করা বুঝিয়েছেন। আর, যাইনাব তো দুই হাতে নানান জিনিস বানাতেন, এরপর আল্লাহর নামে সাদাকা করে দিতেন।'[১]

একটি বর্ণনায় এসেছে—একবার আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ যাইনাবের কাছে ১২ হাজার দিরহাম পাঠালেন। তখন যাইনাব বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ, এই সম্পদ যেন আগামীতে আমার কাছে না-আসে; এসব তো নিশ্চিত ফিতনা'।[২] এরপর তিনি পরিচিত দুস্থ ও অভাবগ্রস্তদের মাঝে সেগুলো বণ্টন করে দিলেন। খবর শুনে উমর এলেন যাইনাবের দরজায়। সালাম দিয়ে বললেন, 'আপনি কী করেছেন, আমি শুনেছি। আমি আরও এক হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেগুলো নিজের খরচের জন্য রেখে দেবেন।' উমর পাঠালেন ঠিক, কিন্তু যাইনাব সেগুলো থেকে একটি দিরহামও নিজের জন্য জমিয়ে রাখলেন না; বরং সবগুলো সাদাকা করে দিলেন।

হিজরী ২০ সালে যখন তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যাশায়িত;[৩] তখন বললেন, 'আমি আমার কাফন প্রস্তুত করে রেখেছি। আমীরুল মুমিনীন উমর কাফনের জন্য কোনো কাপড় পাঠালে সেটা তোমরা সাদাকা করে দিয়ো। পারলে, আমার পরনের কাপড়ও সাদাকা করে দিয়ো।'[৪]

---

[১] *আস-সিমতুস সামীন* : ১১০; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৮৫১; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/৯৩।
[২] *আল-ইসতীআব* ও *আল-ইসাবাহ* : যাইনাবের জীবনী অধ্যায়।
[৩] *আস-সিমতুস সামীন* : ১১১।
[৪] অন্য বর্ণনায় আছে—তিনি ২১হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন; যে বছর আরবগণ আলেকজান্দ্রিয়া জয়

আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। এরপর জান্নাতুল বাকী গোরস্তানমুখী জনতার শোক-মাতমের সঙ্গে তিনি রওনা হন প্রিয়তমের মুলাকাতে, পরলোকগতা তাঁর প্রথম প্রেয়সী হিসেবে।

করেছে—আল-ইসতীআব : ০৪/১৮৫২; আল-ইসাবাহ : ০৮/৯৪; উয়ূনুল আসার : ০২/৩০৫।

বনুল মুস্তালিকের সরদার-কন্যা

জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস

খুব দ্রুতই সবার কানে কানে পৌঁছে গেল—হারিস ইবনু আবি দরারের কন্যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিয়ে করেছেন। শুনে সবাই সেই মহিমান্বিত নারীকে সম্মান জানাতে ছুটল; স্বয়ং রাসূল যাঁকে সম্মানিত করেছেন বিয়ে করে। সদ্য নবীগৃহে কদম রাখা উম্মুল মুমিনীনের সম্মানার্থে তাঁর সম্প্রদায়ের সব বন্দীকে সাহাবীরা মুক্ত করে দিলেন। বলতে লাগলেন—এঁরা তো রাসূলের শ্বশুরগোত্রের লোক! জুওয়াইরিয়া ﷺ নবীগৃহে কদম রাখলেন। নিজের সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর চেয়ে বরকতপূর্ণ নারী কে আছে, যাঁর বিয়ের উসীলায় সম্প্রদায়ের শ' শ' পরিবারের লোক দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে গেল!

—[*সীরাতু ইবনি হিশাম*][১]

অপরূপ সুন্দরী এক বন্দিনী

যাইনাব বিনতু জাহশ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার পর নবীজি ﷺ কয়েকটি বড় যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এ যুদ্ধগুলোর ব্যস্ততায় পঞ্চম হিজরী সনের দ্বিতীয়ার্ধ

[১] কোনো কোনো সীরাতকার উম্মুল মুমিনীনগণের ধারাবহিক বিন্যাসে উম্মু হাবীবা বিনতু আবী সুফিয়ানকে জুওয়াইরিয়ার আগে উল্লেখ করেছেন। কারণ, উম্মু হাবীবা হাবশায় থাকতেই তাঁকে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন রাসূল ﷺ। তো, প্রস্তাবের বিবেচনায় উম্মু হাবীবাই আগে উম্মুল মুমিনীন হয়েছেন। অপরদিকে, হাফিয ইবনু সায়্যিদিন নাস-এর মতো সীরাতকারগণ জুওয়াইরিয়াকে উম্মু হাবীবার আগে উল্লেখ করেছেন বাসরের বিবেচনায়। উম্মু হাবীবা তো খাইবারযুদ্ধের পরে হাবশা থেকে ফিরে এসে রাসূলের ঘরে উঠেছেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।—*সীরাতু ইবনি হিশাম*।

পার হয়ে যায়। শাওয়াল ও যীকা'দাহর[১] শুরু—এই সময়টার মধ্যেই খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহুদীরা পুরো আরবের মুশরিক-জোটকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল। ফলে, রাসূল ﷺ ও মুসলিমদেরকে তাদের হামলার মুখোমুখি হতে হয়।

মদীনার সীমানা-ঘেঁষে তৈরি খন্দক থেকে ভেতরের দিকে তিন হাজার সেনা নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন আল্লাহর রাসূল। অপরদিকে কুরাইশ নিজেদের, মিত্র গোত্র বনু কিনানা ও তিহামাবাসীর মোট ১০ হাজার সেনা নিয়ে হাজির হয়; সঙ্গে যোগ দেয় গাতফান ও তাদের মিত্র নজদবাসী।

ইহুদীরা এইরকম পরিস্থিতিতে যেমন অবস্থানে থাকবে বলে ওয়াদা ও চুক্তি করেছিল, তা তারা ভঙ্গ করে। ফলে, মুসলিমদের জন্য ভয় ও বিপদের মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে যায়। যেন ওপর থেকে, নিচ থেকে—সর্বদিক থেকে শত্রু আসছে। তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। আর, ভেতরে ঘাঁপটি মেরে থাকা মুনাফিকদের চেহারা এই সময়ে উন্মোচিত হয়ে যায়। তারা বলতে থাকে—'মুহাম্মাদ আমাদেরকে রোম ও পারস্যসম্রাটের ধনভাণ্ডার প্রাপ্তির কথা বলত; আর, এখন আমাদের কেউ নিরাপদে প্রাকৃতিক কর্মও সারতে পারছে না!' গনীমতের লোভে তারা প্রথমে অন্যদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। কিন্তু যখনই মনে হয়, যে, রাসূল ﷺ পরাজিত হতে পারেন, তখনই তারা ভোঁ-দৌড়ে সবার সামনে থেকে উধাও হয়ে যায়। নিজের ঘরের নিরাপদ কুঠরিতে পৌঁছে তবেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারা।

মুশরিকরা খন্দকের বাইরে থেকে দীর্ঘ ১৭ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে বসে থাকে। বড় ভোগান্তির ছিল এই অবরোধ। অবশেষে আল্লাহ্ তাদের ওপর তাঁর কুদরতের প্রকাশ ঘটান এবং রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গী মুসলিমদেরকে দান করেন মহাবিজয়।[২]

যুদ্ধের দৌড়-ঝাঁপ যেন মুসলিমদেরকে একেবারে কাহিল করে ফেলে। বিজয়ের-রাতের পরদিন সকালে তাঁরা নিজেদের ঘরে পা রাখেন। অস্ত্র-শস্ত্র খুলে তাঁরা নিজেদেরকে সঁপে দেন বিছানায়। সমস্ত শরীর ভেঙে নেমে আসে ঘুম। এক দীর্ঘ

---

[১] *সীরাতু ইবনি হিশামে* (০৩/২৪) আছে—খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে। একই তথ্য আছে *তারীখু তাবারীতেও* (০৩/৪৩)। আর, *তাবাকাতু ইবনি সাদে* (০২/৪৭) আছে—হিজরতের পঞ্চম বছরে যীকা'দাহ মাসে সংঘটিত হয়েছে খন্দকযুদ্ধ। যারকানীর একটি বর্ণনায় এসেছে—'মূসা ইবনু উকবা তাঁর মাগাযী গ্রন্থে বলেছেন, "খন্দকযুদ্ধ হিজরী চতুর্থ বছরে হয়েছে।"' এ ছাড়াও দেখতে পারেন—*উয়ূনুল আসার* : ০২/৬৮।

[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/২৩০; *তাবাকাতু ইবনি সাদ* : ০২/৪৭; *তারীখু তাবারী* : ০৩/৪৬।

বিশ্রামের আশায় চোখ মুদে আসে তাঁদের।

দিনের অর্ধপ্রহর না-যেতেই রাসূলের ঘোষকের উচ্চস্বরে তাঁদের ঘুম উড়ে যায়। কানে ভেসে আসে—'যারা রাসূলের আদেশকে শিরোধার্য মনে করে, তাদের সবাই যেন বনু কুরাইযা গোত্রের বাসভূমিতে গিয়েই আসরের সালাত আদায় করে।'

আরেক যুদ্ধ শুরু হয়। মুসলিমরা বনু কুরাইযার ইহুদীদেরকে অবরোধ করে রাখেন ১৫ দিন। এরপর যুকা'দাহর শেষ ও যুলহিজ্জাহর শুরুর সময়ে তারা আত্মসমর্পণ করলে মুসলিমরা অবরোধে ক্ষান্তি দেন।[১] এই যুদ্ধের পরেই বনু লাহইয়ানে যী-কারদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এবং যুদ্ধশেষে রাসূল ﷺ ফিরে আসেন মদীনায়।

এক মাস, বা, তারচেয়েও কম সময় শান্তিতে বসে থাকতে পারেননি তিনি। খবর আসে—বনু খুযাআর শাখাগোত্র বনুল মুস্তালিক নিজেদের সরদার হারিস ইবনু আবী দরারের[২] নেতৃত্বে যুদ্ধপ্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশাল বাহিনী নিয়ে তারা রাসূলের মুকাবিলায় নামতে চায়।

শুনে, রাসূল ﷺ নিজের জানোৎসর্গীদেরকে নিয়ে বের হন। মুরাইসী নামক একটি কূপ ছিল ওদের, সেখানেই ওদের সঙ্গে রাসূল-সেনাদের মুকাবিলা হয় এবং শেষমেশ বনুল মুস্তালিকের নিয়তি ফুটে ওঠে পরাজয় ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে। যুদ্ধে স্ত্রীদের মধ্য থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন আয়িশা ﵂।

বনুল মুস্তালিকের নারীদেরকে বন্দী করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন গোত্রপতি ও সেনাপ্রধান হারিস ইবনু আবী দরার ইবনি হাবীবের কন্যা বাররাহও (বা, জুওয়াইরিয়া)। সবাইকে নিয়ে মদীনায় ফেরেন রাসূল।

কদিন পর। রাসূল ﷺ ছিলেন আয়িশার ঘরে। হঠাৎ বাইরে এক নারীকণ্ঠ শোনা গেল। রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাইছে সে। আয়িশা উঠে দরজায় গেলেন। দেখলেন—অতি মায়াবী, লাবণ্যময়ী এক যুবতী। এত্ত সুন্দর মেয়ে—

---

[১] *তারীখু তাবারী* : ০৩/৫৩; *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/৩০১।
[২] *তারীখু তাবারী* : 'হিজরী ষষ্ঠ সনের ঘটনাবলি' অধ্যায়; জামহারাতু আনসাবিল আরব : ২২৮।

যার দৃষ্টিতেই পড়বে, তাকেই সে মায়ার জালে বন্দী করবে।[১] বয়স তার বিশের মতো। ভীত-কম্পিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। এই ভঙ্গিমায় দাঁড়ানোটা যেন তার সৌন্দর্যের আকাশে আরেক মুঠো রঙ ছিটিয়ে দিয়েছে। তাই, এখন তার চেহারায় খেলা করছে এক সর্বনাশী জাদু!

মেয়েটিকে আয়িশা চেনেন। ইতিপূর্বে দেখেছেন। জানেন তাঁর হতভাগ্য দুরবস্থার কথা। আয়িশার মনে তখন অন্য শঙ্কা। এই দুরবস্থা ও অসহায়ত্ব মেয়েটির জন্য সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দিতে পারে, অবশ্য এতে আয়িশার কোনো সমস্যা নেই, সমস্যা হলো—মেয়েটির এ সৌভাগ্য বাস্তবায়িত হলে আয়িশার সবচেয়ে সুখকর অনুভূতি ও ভালোবাসায় আরেকটি ভাগ বসে যাবে। তাই মেয়েটির এই আগমন তাঁকে ঈর্ষান্বিত করল। মেয়েটি বারবার অনুমতি চাইতে লাগল। না-পেরে তিনি অনুমতি দিলেন ঠিক, কিন্তু মনে তাঁর খচখচ করতে লাগল শঙ্কা।

মেয়েটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে খুবই বিনয় ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষায় বলল, 'ও আল্লাহর রাসূল! আমি গোত্রপতি হারিস ইবনু আবী দরারের কন্যা। আপনি তো জানেন, আমি কী বিপদে পড়েছি। সাবিত ইবনু কাইসের ভাগে পড়ে আমি তার সঙ্গে মুকাতাবা চুক্তি করেছি; এখন আপনার কাছে এসেছি, এই ব্যাপারে সাহায্য চাইতে।'

এক সম্ভ্রান্ত যুবতীর মুখে তাঁর লাঞ্ছনার কথা যেন রাসূলের মতো মহান আরবযোদ্ধার মনে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করল। এক জন্ম-স্বাধীন ও খাঁটি আরব-নারীর এমন আশ্রয়প্রার্থনা যেন তাঁর মহত্ত্ব ও উদারতার সাগরে ঢেউ উস্কে দিল; তিনিই তো ওর সম্প্রদায়কে পরাজিত করেছেন। কিন্তু ওর মতো নারীর এমন অভাবনীয় অপমান যেন রাসূলের বুকে আঘাত হানল এখন। তাঁর হৃদয় দুলে উঠল বনুল মুস্তালিকের গোত্রপতির অভিজাত কন্যাটির জন্য, তিনি ছাড়া যাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই এখন!

রাসূল ﷺ তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এরচেয়ে আরও উত্তম কোনো কথা তোমাকে বললে, মেনে নেবে?'

উৎকণ্ঠিত মেয়েটি বলল, 'সেটি কী?'

---

[১] *সীরাতু ইবনি ইসহাক* : ০৩/৩০৭; *তারীখু তাবারী* : ০৩/৬৬; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৮০৪; *আস-সিমতুস সামীন* : ১১৭।

রাসূল বললেন, 'আমি তোমাকে মুক্ত করে বিয়ে করে নেব!'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। আনন্দে চোখ বড় হয়ে গেল তার। অসহ্য সুখ যেন তার সবটা উলট-পালট করে দিল। কোনোমতে সে বলল, 'অবশ্যই মেনে নেব, ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তবে তা-ই হোক।'[১]

আল-ইসতীআব ও *আল-ইসাবাহ* গ্রন্থের আরেকটি বর্ণনায় এসেছে—নবীজি ﷺ জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বন্দী করলেন। অর্থাৎ, বিয়ে করলেন। এরপর তাঁর বাবা রাসূলের কাছে এসে বললেন, 'মুহাম্মাদ, আপনারা আমার মেয়েকে বন্দী করে এনেছেন। ওর মতো অভিজাত মেয়ে তো বন্দী থাকতে পারে না। এই নিন, ওর মুক্তিপণ দিচ্ছি—ওকে ছেড়ে দিন।' নবীজি বললেন, 'আমি যদি ওকে আপনার সঙ্গে যাওয়া-না-যাওয়ার ইচ্ছাধিকার দিই, তাহলে বেশি ভালো হয় না?' তিনি বললেন, 'অবশ্যই।' এরপর তিনি মেয়ের কাছে এসে পুরো অবস্থা বিবৃত করলেন। তখন জুওয়াইরিয়া বললেন, 'আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই গ্রহণ করছি।'

কেউ কেউ বলেছেন—জুওয়াইরিয়ার বাবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসার আগে মক্কার একটি পাহাড়ি গিরিপথে দুটি বকরি লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন। জুওয়াইরিয়ার মুক্তিপণ হিসেবে এগুলো এনেছিলেন তিনি। তো, রাসূলের কাছে আসার পর তিনি তাঁকে বকরিগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বলে উঠলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল।'[২] এরপরেই তিনি নিজের মেয়ের জন্য রাসূলকে প্রস্তাব দেন এবং রাসূলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের মহর ধরা হয়েছিল চারশ' দিরহাম।[৩]

নববধূর বারাকাহ

খুব দ্রুতই সবার কানে কানে পৌঁছে গেল—হারিস ইবনু আবি দরারের কন্যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিয়ে করেছেন। শুনে সবাই সেই মহিমান্বিত নারীকে সম্মান

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/৩০৭; ইবনু হিশামের সূত্রে *আল-মুহাব্বার* : ২৮৯; *তারীখু তাবারী* : ০৩/৬৬; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৮০৪; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/৪৩; *উয়ূনুল আসার* : ০২/৩০৫।
[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/৩০৮; *আস-সিমতুস সামীন* : ১১৭; *উয়ূনুল আসার* : ০২/৩০৫।
[৩] প্রাগুক্ত।

জানাতে ছুটল; স্বয়ং রাসূল যাঁকে সম্মানিত করেছেন বিয়ে করে। সদ্য নবীগৃহে কদম রাখা উম্মুল মুমিনীনের সম্মানার্থে তাঁর সম্প্রদায়ের সব বন্দীকে সাহাবীরা মুক্ত করে দিলেন। বলতে লাগলেন—এঁরা তো রাসূলের শ্বশুরগোত্রের লোক!

জুওয়াইরিয়া ﵂ নবীগৃহে কদম রাখলেন। নিজের সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর চেয়ে বরকতপূর্ণ নারী কে আছে, যাঁর বিয়ের উসীলায় সম্প্রদায়ের শ' শ' পরিবারের লোক দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে গেল![১] নবীজি ﷺ নববধূর মূল নাম 'বাররাহ্' পরিবর্তন করে 'জুওয়াইরিয়া' রাখেন; কারণ, যখন তিনি এই স্ত্রীর কাছ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবেন, তখন লোকেরা বলবে—'রাসূল তো বাররাহর (পুণ্যবতীর) কাছ থেকে বেরিয়ে এসেছেন';[২] অথচ, 'পুণ্যবতী' কারও কাছ থেকে বেরিয়ে তিনি অন্য কোথাও কী করে যেতে পারেন?! তাই, তিনি নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন; যেন কারও নিছক শব্দ-বাক্য থেকেও অমন অশুভ ও অসুন্দর কথা না-বোঝা যায়!

বাকি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে জুওয়াইরিয়া বড় আবেগ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে সেই বরকতপূর্ণ সময়কে স্মরণ করেছেন, যখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে প্রথমবারের মতো সাক্ষাত করতে এসেছিলেন এবং মুক্তি পেয়েছিলেন দাসত্বের লাঞ্ছনা থেকে; যখন তাঁর উসীলায় মুক্তি পেয়েছিল তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরাও; আর, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও রাসূলের বিবাহ-বন্ধনে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও সেই মুহূর্তের স্মৃতিচারণ করেছেন। বলেছেন, 'জুওয়াইরিয়া খুবই মিষ্টি ও লাবণ্যময়ী এক মেয়ে ছিলেন। তাঁকে যে-ই দেখত, সে-ই মুগ্ধ হয়ে যেত। তিনি রাসূলের কাছে এলেন তাঁর মুকাতাবা চুক্তিপূরণে সাহায্য চাইতে। আল্লাহর কসম! ঘরের দরজায় তাঁকে দেখেই আমার ভালো লাগেনি; আমি বুঝতে পেরেছি, নবীজিও তাঁর মধ্যে সেই বিষয়টি দেখতে পাবেন, যেটি দেখে আমি তাঁকে এই মুহূর্তে অপছন্দ করছি!'[৩]

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ে কিছু কথা বলে রাখা ভালো মনে করছি। সেটি

---

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/৩০৭; *তারীখু তাবারী* : ০৩/৬৬; *আস-সিমতুস সামীন* : ১১৬।
[২] *আল-ইসতীআব* ও *আল-ইসাবাহ* : 'জুওয়াইরিয়ার জীবনী' অধ্যায়।
[৩] *সীরাতু ইবনি ইসহাক, আল-ইসতীআব, আল-ইসাবাহ।*

হলো—জুওয়াইরিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত কি রাসূলের জন্য অবৈধ, বা, অপছন্দনীয় কিছু ছিল?

*সীরাতু ইবনি হিশাম*রে ব্যাখ্যাকার সুহাইলী বলেন, ‘জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিপাত ও তাঁর সৌন্দর্য অনুভবের বিষয়ে কথা এই যে, জুওয়াইরিয়া তখন দাসী ছিলেন। স্বাধীন নারী হলে, তাঁর প্রতি রাসূল দৃষ্টি দিতেন না। ...আরেকটি কথা হলো, বিয়ের উদ্দেশ্যে পাত্রী দেখা বৈধ। রাসূলের যবানে এই বৈধতার কথা এসেছে। এটা প্রমাণিত। মুগীরা ﷺ যখন এক নারীকে বিয়ের ব্যাপারে রাসূলের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, তখন রাসূল বললেন, “তুমি ওকে ভালো করে দেখে নিলে, তোমাদের সম্পর্কের স্থায়িত্বের জন্য সবচেয়ে ভালো হতো।” মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ যখন সায়্যিনাহ বিনতু দহহাককে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, তখনও রাসূল তাঁকে মুগীরার অনুরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন।’[১]

মুসলমানদের হাতে বন্দিত্ব বরণ ও উম্মুল মুমিনীন হিসেবে বরিত হবার আগে জুয়াইরিয়া ﷺ নিজগোত্রের মুসাফি’ ইবনু সাফওয়ান নামক এক লোকের বিবাহাধীন ছিলেন।[২]

হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু’র শাসনকাল অবধি বেঁচে ছিলেন জুওয়াইরিয়া। হিজরী প্রথম শতকের অর্ধ কাল পেরিয়ে যাওয়ার পর ৫৬ হিজরী সনে মদীনায় তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ৭০ বছর। কেউ কেউ বলেছেন, ৫০ হিজরীতে ৫৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন।

[১] আর-রওদুল উনফ : ০৩/১৯।

[২] আল-মুহাব্বার : ৮৯; আল-ইসতীআব : ০৪/১৮০৪; আল-ইসাবাহ : ০৮/৪৩; আস-সিমতুস সামীন : ১১৬। তারীখু তাবারীতে (০৩/১৭৭) এসেছে, জুওয়াইরিয়ার সেই স্বামীর নাম ছিল মালিক ইবনু সফওয়ান।

বনু নাযীরের অভিজাত কন্যা

সাফিয়্যাহ বিনতু হুয়াই

‘আরে, তুমি ওদেরকে বললে না কেন, যে, আমার স্বামী মুহাম্মাদ, আমার পিতা (ঊর্ধতন পুরুষ) হারূন, আর, আমার চাচা হচ্ছেন হযরত মূসা–আলাইহিমুস সালাম–; এরপরেও তোমরা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হও কী করে!”

–[*আল-ইসাবাহ*]

পতন হলো খাইবারের

হিজরী ষষ্ঠ সনের সমাপ্তি হয়েছে; ঘটনাবহুল একটি বছরের সমাপ্তিতে একটু কি বিশ্রামের ফুরসত হবে রাসূলের? সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পেছনে ফেলে আসা বছরটির দিকে কি আবার একটু তাকাতে পারবেন মায়ার চোখে? এই বছরটিতেই তো তিনি জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেছেন, নিজের সবচেয়ে প্রিয় ও সম্মানিতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে মহাঅপবাদের পরীক্ষায় পড়েছেন, এরপর হুদাইবিয়ার সন্ধিও এ-বছরেই সম্পাদিত হয়েছে।

না, তাঁর কোনো ফুরসত নেই। সপ্তম হিজরীর মুহাররামের চাঁদ উঠেছে। তিনি তখন ব্যস্ত ধুরন্ধর, মহাফেরেববাজ ইহুদীদের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতিতে; খন্দকের যুদ্ধের সময়েই ইসলামের বিরুদ্ধে যাদের লুকিয়ে রাখা ভয়ানক বিদ্বেষ, অনিষ্টচিন্তা ও গাদ্দারি নগ্ন হয়ে পড়েছিল।

মুহাররামের শেষার্ধে[১] তিনি শত্রুঘাঁটি খাইবারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে পৌঁছুনোর পর উচ্চস্বরে বলে ওঠেন—'আল্লাহু আকবার! খারিবাত (পতন হয়েছে) খাইবার। নিশ্চয় আমরা কোনো সম্প্রদায়ের ভূমিতে হাজির হলে, পরবর্তী সকালটি তাদের বড় অশুভ হয়। কারণ, ইতিপূর্বেই আখিরাত ও শরীয়তের আনুগত্যের বিষয়ে তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে।'

সত্যি সত্যিই খাইবারের পতনদৃশ্য হয়েছে এমন—সবগুলো দুর্গের পতন, যুদ্ধেসক্ষম পুরুষদের হত্যা, নারীদের বন্দিত্ব। এই নারীদের মধ্যেই ছিলেন ইহুদীগোত্র বনু নাযীরের অভিজাত কন্যা সাফিয়্যাহ বিনতু হুয়াই ইবনি আখতাব, যিনি ছিলেন হযরত মূসার ভাই হযরত হারূনের (আলাইহিমাস সালাম) বংশধর। তাঁর মায়ের নাম ছিল বাররাহ বিনতু শামওয়াল, বা, সামওয়াল।

সাফিয়্যাহর বয়স তখনও ১৭ পেরোয়নি; কিন্তু এই বয়সেই তাঁর দুই দুটি বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে নিজবংশের বিশিষ্ট যোদ্ধা ও কবি সালাম ইবনু মিশকামের সঙ্গে, এরপর খাইবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ 'কামূস'-এর অধিকর্তা কিনানা ইবনুর রবী'র সঙ্গে।[২] মুসলিমরা ঘোরতর লড়াই করে এই দুর্গটি আয়ত্তে নিয়ে নেন এবং কিনানাকে ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে আসেন। বনু নাযীরের ধনভাণ্ডার তার কাছেই রক্ষিত ছিল। তো, রাসূল ﷺ তাকে সে-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে অস্বীকার করে। রাসূল তখন তাকে বলেন, 'আমরা সেটা তোমার কাছে পেলে তোমাকে হত্যা করে ফেলব, রাজি?' সে বলল, 'রাজি।'...

ঠিকই যখন তার ঘরে লুকায়িত ধনভাণ্ডার পাওয়া গেল, তখন রাসূল ﷺ তাকে মুহাম্মাদ ইবনু সালামার হাতে দিয়ে দিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু সালামা তাকে নিজের ভাই মাহমূদ ইবনু সালামার হত্যার বদলায় হত্যা করে ফেললেন। যুদ্ধে ইহুদীরা মাহমূদকে হত্যা করেছিল।[৩]

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/৩৪২; *তারীখু তাবারী*; উয়ূনুল আসার : ০২/১৩০। আর, তাবাকাতু ইবনি সাদে বলা হয়েছে, খাইবারযুদ্ধের সময়টি ছিল জুমাদাল উলা।

[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/৩৫১; *তারীখু তাবারী* : ০৩/৯৫, ১৭৮; *আল-মুহাব্বার* : ৯০; উয়ূনুল আসার : ০২/৩০৭। আর, তাবাকাতু ইবনি সাদ (০২/৭৭), আল-ইসতীআব (০৪/১৮৭১) ও আল-ইসাবাহ'র (০৮/১২৬) তথ্যানুযায়ী সেই ব্যক্তির নাম ছিল কিনানা ইবনু আবিল হাকীক। তবে, মনে হচ্ছে, এইভাবে নামোল্লেখটা মূলত তাকে তার দাদার সাথে সম্পৃক্ত করার ফল।

[৩] তারীখু তাবারী : ০৩/৯৫; *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/৩৫১; তাবাকাতু ইবনি সাদ : ০২/৮১।

'কামূস' দুর্গের নারীদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়। এদের সামনের সারিতে ছিলেন দুর্গপতির স্ত্রী সাফিয়্যা ও তাঁর এক চাচাতো বোন। রাসূলের মুয়াযযিন বিলাল ﷺ এদেরকে নিয়ে আসেন। তিনি তাদেরকে এমন একটি ময়দানের মধ্য দিয়ে নিয়ে আসেন, যেখানে ইহুদীদের বহু পুরুষের লাশ পড়ে ছিল। অবস্থা দেখে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে মন চাইছিল সাফিয়্যার, কিন্তু তামাম শব্দ ও ধ্বনি যেন আটকে গেছে গলায়। বন্ধ হয়ে গেছে স্বর। অপরদিকে, সাফিয়্যার চাচাতো বোন নিজেকে ঠিক রাখতে না-পেরে আর্তনাদ করে ওঠে। চেহারা ও বুক চাপড়াতে থাকে। মাটি নিক্ষেপ করতে শুরু করে মাথায়...

অবশেষে তাদেরকে রাসূলের নিকটে নিয়ে আসা হয়। চাপা কষ্ট ও ক্ষোভ নিয়ে বসে থাকেন সাফিয়্যা। নিজের ভাবমর্যাদা বজায় রাখতে চেষ্টা করেন তিনি। কেউ ছিল না, যে বুঝতে পারবে সাফিয়্যার মাথায় তখন কী খেলছে। বাহ্যত শুধু এটুকুই বোঝা যাচ্ছিল, যে, নিজের মর্যাদা ও মহত্তের শেষটুকুর দোহাই দিয়ে হলেও তিনি বিজয়ী সেনাপতির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। আর, তাঁর সঙ্গী মেয়েটি? এলোকেশ, ধুলিমলিন চেহারা, শতছিন্ন কাপড় নিয়ে নিরন্তর চিৎকার ও এই-সেই বলে বকে যাচ্ছে—এক মুহূর্তের জন্যও থামছে না!

মেয়েটির এমন কাণ্ড দেখে রাসূল ﷺ বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বললেন, 'এই শয়তানের কর্মকারিণীকে আমার কাছ থেকে দূরে সরাও।'[১] এরপর তিনি সাফিয়্যার প্রতি মনোযোগী হলেন। দেখলেন—তাঁর চেহারায় রাসূলের সামান্য করুণাপ্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। তিনি সবকিছু বুঝতে পারলেন এবং দয়া ও মায়াবশত তাঁর দিকে তাকিয়ে বিলালকে বললেন, 'বিলাল, তোমার ভেতর থেকে দয়া-মায়া সব কি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে? দুজন মহিলাকে কী করে তুমি তাদের পুরুষদের বধ্যভূমির মাঝ দিয়ে আনতে পারলে?'[২]

সাফিয়্যার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ বিশেষ আদেশ জারি করলেন। তাঁকে রাসূলের পেছনে বিশেষ হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁর ওপর রাসূলের চাদর টানিয়ে দেওয়া হলো। এতে লোকেরা বুঝতে পারল—রাসূল তাঁকে নিজের জন্য নির্বাচন করেছেন।

[১] *তারীখু তাবারী* : ০৩/৯৪; *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/৩৫০; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/১২৬।
[২] *তারীখু তাবারী* : ০৩/৯৪; *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/৩৫১; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/১২৬; *আস-সিমতুস সামীন* : ১২০।

মুসলিমরা বলাবলি করতেন—সাফিয়্যাকে রাসূল ﷺ বিয়ে করেছেন, নাকি উম্মুল ওয়ালাদ (দাসী) হিসেবে গ্রহণ করেছেন—আমরা জানি না। পরবর্তী সময়ে রাসূল তাঁকে পর্দার অধীনে নিয়ে গেলে সবাই বুঝতে পারে, যে, তিনি তাঁকে বিয়ে করেছেন।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র হাদীসে এসেছে—রাসূল ﷺ যখন সাফিয়্যা বিনতু হুয়াইকে বন্দী করে আনলেন তখন তাঁকে বললেন, 'আমার ব্যাপারে তোমার আগ্রহ আছে?' তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো শিরকে লিপ্ত অবস্থাতেই আপনাকে চাইতাম। এখন ইসলামে এসে আপনাকে পেয়ে গেলে, কেন এই মহাসৌভাগ্যকে বরণ করে নেব না?' এই শুনে রাসূল ﷺ তাঁকে আযাদ করে বিয়ে করে নিলেন। বিয়ের মহর ছিল ওই 'আযাদী'ই।[১]

স্বপ্ন ও স্মৃতির দোলাচল

নারীদের বিলাপ ও আর্তনাদ শেষ হওয়া অবধি রাসূল ﷺ খাইবারে অবস্থান করলেন। যখন মনে হলো, সাফিয়্যার ভয়-পেরেশানি দূর হয়ে গেছে, বা, অনেকটাই চলে গেছে, তখন তিনি তাঁকে পেছনে নিয়ে ছ'মাইল দূরে খাইবারের সীমান্তবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি বাসর করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু সাফিয়্যাহ তাতে অসম্মতি জানালেন।[২]

তাঁর এই আচরণের হেতু বুঝতে না পেরে রাসূল ﷺ মনে মনে কিছুটা আহত হলেন। তবু, সবকিছু চেপে রেখে তিনি বাহিনী নিয়ে আবার চলা শুরু করলেন মদীনা অভিমুখে। চলতে চলতে খাইবার থেকে বহুদূরে সহবা নামক জায়গায় পৌঁছুনোর পর বিশ্রামের জন্য আবারও যাত্রাবিরতি করলেন। আর, তখন তাঁর মনে হলো—সাফিয়্যা হয়তো এখন বাসর ঘরের জন্য প্রস্তুত।

একজন মহিলা এলেন সফিয়্যার কাছে। ইবনু ইসহাকের বর্ণনামতে, তিনি ছিলেন আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মা উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান।[৩] তো, তিনি সাফিয়্যার চুল আঁচড়ে দিলেন। সাজিয়ে পরিপাটি করে সুগন্ধি মেখে

[১] *তাবাকাতু ইবনি সাদ* : ০২/৮৪; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৮৭২; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/১২৬; *আস-সিমতুস সামীন* : ১২০; উয়ূনুল আসার : ০২/৩০৭। সহীহ মুসলিম : 'নিকাহ' অধ্যায়।

[২] *আস-সিমতুস সামীন* : ১২০; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/১২৬।

[৩] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/৩৫৪।

দিলেন। তখন মনে হতে লাগল—এক মিহি কোমল শুভ্র-স্বচ্ছ বধূ বসে আছে; যার জাদুমাখা সৌন্দর্যে চোখেও আরামের আবেশ লাগে! এ-কারণেই উম্মু সিনান আল-আসলামিয়্যাহ বলেছেন—'সাফিয়্যার চেয়ে শুভ্র-সুন্দর কোনো নারী আমি দেখিনি।'[১]

আসন্ন আনন্দের ঢেউয়ে সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহার দুঃখ-বিষাদ যেন মুছে গেল। তিনি যেন ভুলে গেলেন সেই ভয়ানক হত্যাযজ্ঞের কথা, তাঁর পরিবারের লোকদেরকে যা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে; আর, লাঞ্ছিত ও বন্দী করে তাঁকে বের করে দিয়েছে কামূস দুর্গ থেকে।

সেখানেই বিপুল আয়োজনে ওলীমা অনুষ্ঠিত হয়। খাইবার থেকে প্রাপ্ত গনীমতের খাবার তৃপ্তিভরে খান সাহাবীরা।[২] এরপর, সব মেহমানদারি শেষ করে রাসূল ﷺ গিয়ে উপস্থিত হন সাফিয়্যার কাছে। তখনও তাঁর মন সাফিয়্যার প্রথম প্রত্যাখ্যানের ব্যথায় ব্যথিত...

নববধূ রাসূলের সঙ্গে খুব উচ্ছ্বাস নিয়ে সাক্ষাত করেন। এরপর তাঁকে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা শোনান। তিনি বলেন, 'কিনানা ইবনুর রবী'র সঙ্গে বাসররাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নটি এমন—আমার কোলে একটি চাঁদ এসে পড়েছে। ঘুম ভাঙার পরে আমি কিনানাকে স্বপ্নটি শোনালাম। সে তো সঙ্গে সঙ্গে রেগে গেল। বলল, "এর ব্যাখ্যা তো এ-ই, যে, তুমি হিজাযের বাদশাহ মুহাম্মাদকে মনে মনে কামনা করো!"[৩] এই বলে সে আমার চেহারায় প্রচণ্ড জোরে এক থাপ্পড় মারে। এখন অবধি সেটার দাগ রয়ে গেছে।'

রাসূল ﷺ তাকিয়ে দেখলেন—সত্যিই তাঁর চোখে সবুজ দাগ স্পষ্ট হয়ে আছে। মোটকথা, তাঁর এই কথাগুলো শুনে রাসূলের মন খুশি হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটি তিনি খোলাসা করে নিতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রথমবার তুমি বাধা দিয়েছিলে কেন?' অথবা, বললেন, 'প্রথম মঞ্জিলে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলে কেন?'

---

[১] *আল-ইসাবাহ* : ০৮/১২৬।

[২] *সহীহ মুসলিম* : 'নিকাহ' অধ্যায়।

[৩] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/৩৫০; *তারীখু তাবারী* : ০৩/৯৪; *আস-সিমতুস সামীন* : ১২০। *আল-ইসাবাহ* গ্রন্থের একটি বর্ণনায় এসেছে—সাফিয়্যা তাঁর এই স্বপ্নটি নিজের মায়ের কাছে বর্ণনা করেছিলেন। উয়ূনুল আসারের আরেক বর্ণনায় এসেছে—স্বপ্নটি তিনি বাবার কাছে বলেছিলেন।

সাফিয়্যা ﷺ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'কাছেই ইহুদীরা ছিল। ওদের তরফ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা করছিলাম, তাই।'[১] এই কথা শুনে রাসূলের মনের ব্যথা দূর হয়ে গেল। পবিত্র চেহারায় ভেসে উঠল সন্তোষ ও খুশির ঝলমলে আভা।

সাফিয়্যা ﷺ তাঁর বহু স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলেন। তাঁর সম্প্রদায়ের ইহুদীরা প্রতীক্ষিত নবীর ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করত। নিজেদের আসমানী পুস্তিকাগুলোর মাধ্যমে তারা তাঁকে চিনতে পারত। কিন্তু নবী যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখনই মুহাজির নবীর বিরুদ্ধে তারা জ্বলে উঠল ক্ষোভ ও হিংসার আগুনে। অথচ তারাই তাঁর অনতিবিলম্বে আগমনের খোশখবর দিত মানুষকে। মূলত, ইয়াসরিবে সংরক্ষিত নিজেদের সম্পদগুলো সবরকমের যোদ্ধা ও লোভী মানুষের চোখ থেকে বাঁচানোর জন্যই তারা এমন করত; কিবা, নিরক্ষর আরবদের সঙ্গে তারা যেমন নিজেদের কিতাব পড়তে পারা নিয়ে গর্ব করত, তেমনই নবীর আগমনের খবরেও তারা আরবদের সঙ্গে গর্বের একটা উপায় বের করতে চাইছিল।

সাফিয়্যা ﷺ নিজেই বলেছেন, 'আমার বাবা ও চাচা আবু ইয়াসিরের কাছে আমি ছিলাম সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। বাবা ও চাচার সামনে পড়লে, আমার অন্য ভাই-বোনকে ছেড়ে তাঁরা আমাকেই কাছে টেনে নিতেন। রাসূল ﷺ মদীনায় আসার পরে আমার বাবা ও চাচা একদিন ভোরের অন্ধকারে তাঁর কাছে যান। আর, একেবারে সূর্যাস্তের সময়ে ফিরে আসেন। ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিধ্বস্ত তাঁদেরকে দেখে অভ্যাসমতো খুশি মনে আমি দেখা করতে যাই। কিন্তু আল্লাহর শপথ! উভয়ের একজনও আমার দিকে ফিরে তাকাননি। চিন্তাক্লিষ্ট তাঁরা দুজনে নিজেদের মধ্যেই ব্যস্ত থাকেন।

'আমি তাঁদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম—চাচা আবু ইয়াসির আমার বাবাকে বলছেন, "এ-ই কি সে?"

'বাবা বললেন, "অবশ্যই, আল্লাহর কসম!"

"তুমি তাকে ঠিকঠাক চিনতে পেরেছ?"—চাচার পুনরায় জিজ্ঞাসা। বাবা বললেন, "অবশ্যই।"

"তার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত তোমার?"

---

[১] আল-ইসাবাহ : ০১/১২৬।

'বাবা এবার শক্ত কণ্ঠে বললেন, "খোদার কসম, জীবনের শেষ পর্যন্ত আমি তার বিরুদ্ধে শত্রুতা চালিয়েই যাব।"'[১]

রাসূল ﷺ যেখানে সাফিয়্যার সঙ্গে বাসর করেছেন, সেখানেই তাঁবুর বাইরে আবু আইয়ূব খালিদ ইবনু যাইদ নামক প্রসিদ্ধ আনসারী সাহাবী তরবারি সঙ্গে নিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন। রাসূলের অজান্তেই তিনি তাঁবুর চারপাশে সর্বক্ষণ টহল দিয়েছেন। সকালে রাসূল তাঁর শব্দ শুনতে পেয়ে তাকালেন, দেখলেন অদূরেই তিনি অবস্থান করছেন। ডেকে বললেন, 'আবু আইয়ূব! কী হয়েছে?'

তিনি জবাব দিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এই নারীর পক্ষ থেকে আপনার অনিষ্টের আশঙ্কা করছিলাম। আপনি তো তাঁর বাবা, স্বামী ও সম্প্রদায়ের লোকদেরকে হত্যা করেছেন। আবার, তাঁর বয়সও কম। চিন্তা-ভাবনার চেয়ে তাঁর মধ্যে আবেগ কাজ করবে বেশি। তাই, আমি আপনার জন্য পাহারা দিয়েছি।'

রাসূল ﷺ তখন তাঁর জন্য এই বলে দুআ করলেন, 'আল্লাহ! আবু আইয়ূব যেভাবে আমার নিরাপত্তার জন্য রাত জেগেছে, আপনি তাকেও অমন নিরাপদে রাখুন।' অথবা, রাসূল দুইবার বলেছেন, 'আবু আইয়ূব! আল্লাহ তোমাকে রহম করুন।'[২]

মুসলিমরা আসলে তখনও খাইবারেরই এক ইহুদী নারীর ভয়ানক কর্মের কথা ভুলতে পারেনি। তার নাম ছিল যাইনাব বিনতুল হারিস। ইহুদীনেতা সাল্লাম ইবনু মিশকামের স্ত্রী সে। ঘটনা হলো—ইহুদীরা তখন আত্মসমর্পণ করে ফেলেছে। বিজয়ী মহান নেতার সঙ্গে তারা সন্ধি করতে চাচ্ছে। রাসূল ﷺ বসে আছেন শান্ত-স্থির। এমতাবস্থায় ওই নারী তাঁর কাছে এল। বিষমিশ্রিত একটা বকরি হাদিয়া পেশ করল। এর আগেই কোনো সাহাবীর কাছ থেকে সে জেনে নিয়েছিল, যে, বকরির পায়ের অংশ খেতে ভারি পছন্দ করেন রাসূল; তাই ওই অংশেই বেশি পরিমাণে বিষ দিয়েছিল সে। কিন্তু সেটা থেকে সবটার মধ্যেই বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল।

বকরিটা সে রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গী বিশর ইবনুল বারার সামনে পেশ করল। রাসূল পায়ের অংশ নিলেন; আর, ইবনুল বারাকে দিলেন আরেকটি অংশ।

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/১৬৫; *ওয়াফাউল ওয়াফা* : ০১/২৭০।
[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৩/২৫৪; *তাবাকাতু ইবনি সাদ* : ০২/৮৪।

ইবনুল বারা কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই খেয়ে ফেললেন। কিন্তু রাসূল বকরির পায়ের অংশটি মুখে দেওয়ার আগেই বলে উঠলেন, 'এই হাড়টি আমাকে সংবাদ দিচ্ছে, যে, এটি বিষমিশ্রিত।' তিনি সেই নারীকে ডাকলেন। বিষ মেশানোর কথা সে স্বীকার করল। রাসূল ﷺ তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে, সে জবাব দিল—'আপনি আমার সম্প্রদায়ের কী ক্ষতিসাধন করেছেন, তা তো স্পষ্ট। আমি তাই ভেবেছি, যে, আপনি সত্যিই নবী হয়ে থাকলে এই বিষের খবর আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। আর, নিছক কোনো বাদশাহ হয়ে থাকলে এই বিষ আমাদেরকে আপনার হাত থেকে মুক্তি এনে দেবে।' এই বক্তব্য শুনে রাসূল তাকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বিশর ইবনুল বারা ওই এক টুকরোর জন্যই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।[১]

সম্ভবত রাসূল ﷺ যেই তাঁবুতে সাফিয়্যার সঙ্গে বাসর করেছেন, সেটার পাশে টহলরত আবু আইয়ূব আনসারীর মনে সেই ইহুদী নারীর কর্মকাণ্ডই ভেসে বেড়াচ্ছিল।

কাফেলা মদীনায় পৌঁছে গেল। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র হাদীসে এসেছে—মদীনায় এসে সাফিয়্যাকে বহনকারী উটনীটি হোঁচট খেল। এতে সাফিয়্যার পর্দা কিছুটা সরে গেলে রাসূল ﷺ নিজে উঠে তাঁর পর্দা ঠিক করে দিলেন। মদীনার মহিলারা তখন উঁকি দিয়ে দেখতে থাকে, আর বলতে থাকে, 'ইহুদী মেয়েকে আল্লাহ তাঁর রহম থেকে বঞ্চিত করুন।'[২]

স্ত্রীদের কাছে প্রথমেই নববধূকে নিয়ে যাওয়া পছন্দ করেননি রাসূল। তাঁকে হারিসা ইবনু নুমানের ঘরে নিয়ে যান। পবিত্রতমা উম্মুল মুমিনীনগণ একে অপরকে ডেকে সাফিয়্যাকে দেখাতে থাকেন।[৩] তাঁকে নিয়ে বলাবলি করতে থাকেন। অন্য আনসারী নারীরাও একের পর এক এসে এসে দেখে যান তাঁর অপূর্ব সৌন্দর্যের বাহার। এদিকে, রাসূল ﷺ দেখেন—তাঁর স্ত্রী আয়িশা ؓ চুপিসারে

---

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* ০৩/৩৫২; *তারীখু তাবারী* ০৩/৯৫; *সহীহ মুসলিমে* 'সাম' অধ্যায়ে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনু সাদ (০২/৮৪) এই বিষমিশ্রিত বকরীর হাদীসটি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, বকরীটিতে বিষ মিশিয়ে হাদিয়া দিয়েছে মূলত ইহুদীরা।

[২] *মুসলিম* : ৩৩৯৩।

[৩] প্রাগুক্ত।

খুব সতর্কভাবে ঘর থেকে বের হয়েছেন। এই দেখে তিনি নিজেও উঠলেন। দূর থেকে তাঁকে অনুসরণ করলেন। দেখলেন—আয়িশা হারিসা ইবনু নুমানের ঘরে যাচ্ছেন। রাসূল অপেক্ষা করতে থাকলেন। আয়িশা যখন ওই ঘর থেকে বের হলেন, রাসূলুল্লাহ তাঁর কাপড় টেনে ধরলেন। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলে?' আয়িশা তো প্রথমটায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, পরে, রাসূলের খোশমেজাজ দেখে ভরসা পেলেন এবং খানিক অভিমানভরা স্বরে বললেন, 'এক ইহুদী মেয়েকে দেখে এসেছি!' রাসূল বললেন, 'এমন বোলো না। সে তো বড় সুন্দরভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে।'[১]

আমার স্বামী মুহাম্মাদ, পিতা হারূন, আর চাচা হলেন মূসা

এরপর রাসূলের ঘরে স্থানান্তরিত হন সাফিয়্যা। এখানে এসে তিনি বেশ অপ্রস্তুত হয়ে যান। দেখেন—এই ঘরে আছেন আয়িশার মতো বুদ্ধিমতী চপলপ্রাণ ও নবীজির অতি প্রিয়তমা স্ত্রী, আছেন হাফসার মতো অভিজাত ও মর্যাদাবান নারী, সাওদার মতো গুণবতী মহিলা, আর, নানাবিধ গুণ, গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী অন্যান্য স্ত্রীর সঙ্গে আছেন আবার ফাতিমার মতো অত্যুচ্চ সম্মান ও ভালোবাসার পাত্রী। রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না।

এঁদের পাশে সমমর্যাদা নিয়ে দাঁড়ানোর মতো নিজের কোনো কিছু খুঁজে পান না সাফিয়্যা। বিষয়টি বড় জটিল হয়ে দাঁড়ায় তাঁর জন্য। অবশেষে স্বভাবজাত বুদ্ধিমত্তা ও বংশীয় বিচক্ষণতার উসীলায় তাঁর সামনে একটি পথ খুলে যায়। তিনি ঠিক করেন—আয়িশা, হাফসা ও ফাতিমা—সবার সঙ্গেই তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈয়ার করবেন।

আয়িশা ও হাফসার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তৈরির উদ্দেশ্য তো হলো—তাঁদের সমমর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা; কিন্তু ফাতিমার প্রতি তাঁর মনে ছিল নিখাদ ভালোবাসা ও দ্বন্দ্বমুক্ত সম্পর্কের আগ্রহ। এই বিষয়টি প্রকাশ করার জন্যই নিজের একটি স্বর্ণের অলঙ্কার তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন তিনি।[২]

[১] *আস-সিমতুস সামীন* : ৮০; এ ছাড়াও দেখুন—*তাবাকাতু ইবনি সাদ* ও *আল-ইসাবাহ্*।
[২] *আল-ইসাবাহ* : ০৮/১২৭।

ইহুদী জাতি ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে চরম শত্রুতা করেছে এবং করে চলেছে, তিনি সেই ইহুদীঘরেরই মেয়ে, তাও ইহুদীদের নেতৃস্থানীয় একটি পরিবারের! তাই সবসময় তিনি সংকোচবোধ করতেন। আবার এই শঙ্কায়ও থাকতেন, যে, তাঁকে কেউ এই প্রসঙ্গ তুলে কোনো খোঁচা দেয় কি না।

উম্মুল মুমিনীনগণ বিভিন্ন অবসরে মাঝে মাঝে একত্রে বসতেন। কখনো সকলেই, কখনো কয়েকজন। খোশগল্পের আসর জমত তাঁদের মধ্যে। সাফিয়্যাও বসতেন মাঝে মাঝে। এসব আসরে উম্মুল মুমিনীনগণ নিজেদেরকে নবীজির অধিক উপযুক্ত প্রমাণ করতে যাঁর যাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানান দিতেন। এমনই এক প্রসঙ্গে একদিন সাফিয়্যা ﵂ উম্মুল মুমিনীন কারও কারও তরফ থেকে কষ্ট পেয়ে যান। মূলত, ইহুদীকন্যা হিসেবে বংশমর্যাদা নিয়ে কিছু কটাক্ষের শিকার হন তিনি।

বিষয়টা তিনি নিতে পারলেন না। তাঁর শান্ত-কোমল হৃদয়ে কথাগুলো কাঁটার মতো বিঁধল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতেই তিনি চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। নবীজি তাঁর কাছ থেকে বিস্তারিত শুনলেন। তারপর সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আরে, তুমি ওদেরকে বললে না কেন, যে, আমার স্বামী মুহাম্মাদ, আমার পিতা (ঊর্ধতন পুরুষ) হারূন, আর, আমার চাচা হচ্ছেন হযরত মূসা—আলাইহিমুস সালাম—; এরপরেও তোমরা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হও কী করে!" [১]

রাসূলের এই কথা যেন দুঃখ-ওড়ানো সুখ-বাতাস হয়ে বয়ে যায় সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহার মন-যমীনে। আনন্দের বৃষ্টি নেমে আসে তাঁর কষ্ট-আঙিনায়। নিজের ঘরে শান্ত মনে ফিরে যান তিনি।

এমনই আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র সঙ্গে।

এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তিনি ও সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন। পথিমধ্যে সাফিয়্যার উটটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। যাইনাবের উট-বহরে অতিরিক্ত উট ছিল। নবীজি যাইনাবকে বললেন, 'সাফিয়্যার উটটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তুমি কি তাকে একটি উট দিতে পার?' যাইনাব জবাব দিলেন, 'আমি ওই ইহুদী মেয়েকে উট দেব?' তাঁর এই জবাবে নবীজি রাগ করে

[১] *আল-ইসাবাহ* : ০৮/১২৭; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৮৭২; *আস-সিমতুস সামীন* : ১২১।

মুখ ফিরিয়ে নেন। এবং এ ধরনের কথা থেকে তাঁকে সংশোধন করার লক্ষ্যে দুই, বা, তিন মাস পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ বর্জন করেন। অন্য বর্ণনায় আছে—'নবীজি তাঁর সঙ্গ বর্জন করেন যুলহিজ্জা, মুহাররাম, আর, সফর মাসের কিছু দিন পর্যন্ত। এরপর তাঁর সঙ্গে আগের মতো স্বাভাবিক সম্পর্কে ফিরে আসেন।'[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ সময় তক সাফিয়্যা ﵂ রাসূলের কাছ থেকে এমন সমর্থন ও আশ্রয় পেয়েছেন। বর্ণিত আছে—নবীজি শেষ অসুস্থতার সময়ে একদিন সব উম্মুল মুমিনীন তাঁর শয্যাপাশে একত্র হন। সাফিয়্যা তখন নবীজিকে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, কসম আল্লাহর! আমার মনে চায়—আপনার অসুখ যদি আমার শরীরে এসে যেত! (এবং এর বিনিময়ে হলেও আপনি সুস্থতা লাভ করতেন!)' তাঁর কথা শুনে অন্য সবাই চোখ-চাওয়াচাওয়ি করতে থাকেন। নবীজি তাঁদের এই অবস্থা দেখে বললেন, 'তোমরা সবাই কুলি করে নাও।' তাঁরা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কেন?' নবীজি বললেন, 'সাফিয়্যার প্রতি ওইভাবে চোখ-ইশারার কারণে। (যেহেতু ওইভাবে চোখ-ইশারাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত)। আল্লাহর শপথ! সে তো সত্যই বলেছে।'[২]

উম্মুল মুমিনীনগণ নারীসুলভ মানসিকতা থেকে নিজেদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন, এ ঘটনাগুলো ছিল সেসবেরই অন্তর্ভুক্ত। নবীজি তাঁদের এ প্রতিযোগিতাকে যেমন উপভোগ করতেন, তেমনি যেসব স্থানে তাঁরা পদস্খলনের শিকার হতেন সঙ্গে সঙ্গে শুধরে দিতেন। যেমন উল্লিখিত দুটো ঘটনায় শুধরে দিয়েছেন।

মূলত সাফিয়্যা ﵂ অন্য উম্মুল মুমিনীনদের মতোই একজন পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার, পরহেযগার, বিদূষী ও খোদাভীরু রমণী ছিলেন। পূর্ব ধর্মের কোনো চিহ্নও তিনি নিজের মধ্যে অবশিষ্ট রাখেননি। নবীজির মুগ্ধতায় যখন তিনি ইসলাম কবুল করেন, সর্বান্তকরণেই করেছিলেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফাতকালে সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহার এক দাসী উমরের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল, 'আমীরুল মুমিনীন, সাফিয়্যা তো শনিবারকে বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং ইহুদীদের সঙ্গে সম্পর্ক

[১] তাবাকাতু ইবনি সাদ ও আল-ইসাবাহ।

[২] তাবাকাতু ইবনি সাদ ও আল-ইসাবাহ।

রাখেন!' উমর ﷺ তখনই একজন লোক পাঠালেন সাফিয়্যাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে। সাফিয়্যা বললেন, 'আল্লাহ যখন থেকে আমাকে জুমুআর দিন দান করেছেন, তখন থেকে আমি শনিবারকে পছন্দও করি না, গুরুত্বও দিই না। তবে, ইহুদীদের মধ্যে আমার নিকটাত্মীয় আছে, আমি তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করি!' এরপর সাফিয়্যা নিজের দাসীকে এই অপবাদের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, 'এটা শয়তান আমাকে দিয়ে করিয়েছে।' সাফিয়্যা বললেন, 'চলে যাও—তুমি স্বাধীন।'[১]

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফাত-কালে হঠাৎ শুরু হওয়া রাজনৈতিক সঙ্কট থেকে উত্তরণে অবস্থার বিচারে সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহাকেও কিছু পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। তাঁর কিনানা নামক এক গোলাম বর্ণনা করেছে, 'সাফিয়্যা পর্দাবৃতা হয়ে একটি খচ্চরে আরোহণ করলেন। এরপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পক্ষে কথা বলতে এলেন। পথিমধ্যে আশতার নাখয়ী সামনে পড়ল। সে আরোহীকে না-চিনেই খচ্চরের মুখে আঘাত করে বসল। সাফিয়্যা বললেন, "আমাকে যেতে দাও। অপমান করতে এসো না।" শেষে, তিনি নিজের ও আমীরুল মুমিনীনের ঘরের মাঝে একটি সাঁকো নির্মাণ করান। এর মধ্য দিয়ে অবরোধের পুরো সময়ে তিনি আমীরুল মুমিনীনের কাছে খাবার ও পানীয় পৌঁছে দেন।'[২]

হিজরী ৫০ সনের আগ-পরের সময়েই তিনি ইন্তিকাল করেন। খিলাফাতের দায়িত্ব তখন হযরত মুআবিয়ার হাতে ন্যাস্ত হয়েছে। জগদ্বাসীর হৃদয়-অন্দরে শোকের সুর বাজিয়ে সাফিয়্যা রওনা হয়ে যান এক অবিনশ্বর জগতের পানে; যেখানে তাঁর প্রতীক্ষায় আছেন প্রিয়তম মুহাম্মাদ—যৌবনের প্রারম্ভে স্বপ্নে-আসা চাঁদ; দাম্পত্যজীবনের সর্বমুহূর্তের প্রেমিক সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক।

অন্য উম্মুল মুমিনীনদের সঙ্গেই জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। মুমিনদেরকে এতীম করে মাটির নিচের আলোক-জগতে পাড়ি জমান তাঁদের মা সাফিয়্যা বিনতু হুয়াই ইবনি আখতাব। রাদিয়াল্লাহু আনহা।

---

[১] *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৮৭২; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/১২৭; *আস-সিমতুস সামীন* : ১১২।
[২] *তাবাকাতু ইবনি সাদ* ও *আল-ইসাবাহ*।

তাঁর বর্ণিত রাসূলের হাদীসগুলো কিয়ামত তক অগুনতি গ্রন্থে জ্বলজ্বল করবে তাঁর স্বপ্নে-আসা পূর্ণিমা-চাঁদের মতোই।

কুরাইশনেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা

উম্মু হাবীবা রমলা বিনতু আবী সুফিয়ান

'আবু সুফিয়ান মক্কা থেকে রওনা হয়ে মদীনায় তাঁর মেয়ে উম্মু হাবীবার কাছে পৌঁছুলেন।...তিনি যখন মেয়ের ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য পাতা বিছানায় বসতে গেলেন, তখন তাঁর মেয়ে সেটি গুটিয়ে ফেললেন! আবু সুফিয়ান অবাক বিস্ময়ে বললেন, "কী হলো! তুমি এই বিছানাটিকে আমার জন্য পছন্দ করছ না, নাকি, আমাকে এই বিছানার জন্য উপযুক্ত মনে করছ না?" মেয়ে বললেন, "এটা তো আল্লাহর রাসূলের বিছানা। আর, আপনি একজন মুশরিক। তাই, এতে আপনার বসাটা আমার অপছন্দ হচ্ছে।"'

–[*আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ—ইবনু ইসহাক।*]

মুহাজির নারীর তীর্থে ফেরা

খাইবার-বিজয় শেষে নবীজি ﷺ মদীনার পথ ধরলেন। সঙ্গে বনু নাযীরের সরদার-কন্যা ও তাঁর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী সাফিয়্যা ﷺ। আর, তাঁর বাহিনীর জন্তুগুলো পিঠে বয়ে চলল ইহুদীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত গনীমতের সম্পদ। তাঁর মুলাকাতের জন্য মদীনা তখন প্রস্তুত এক অপূর্ব সংবর্ধনার আয়োজন করে। ঘটনা হলো—নবীজি ﷺ আমর ইবনু উমাইয়া আদ-দমীরীকে হাবশার বাদশাহ

নাজাশীর কাছে পাঠিয়েছিলেন সেখানে রয়ে যাওয়া মুহাজিরদের ফিরিয়ে আনতে।[১] আমর তাঁদেরকে দুটি নৌকায় নিয়ে জলপথ পাড়ি দেন। এরপর দুঃখের কালো রাত পেরিয়ে তাঁরা পৌঁছে যান স্বপ্ন-সুখের মদীনায়; যেখানে ইসলাম প্রতিনিয়ত মানুষের হৃদয়-অন্দরে উচ্চকিত হয়ে চলেছে হাবশা-বংশোদ্ভূত বিলালের সুমধুর আযানের মোহন-ধ্বনিতে।

তাঁদের মদীনায় পৌঁছুনোর আগের সময়টিতে খাইবারে চলছিল ঘোরতর লড়াই। তাঁদের আসার পরপরই খাইবার বিজয় ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সুস্পষ্ট সাহায্যপ্রাপ্তির খোশখবর ঘোষিত হলো। বিজয়ী বাহিনীকে অভ্যার্থনা জানাতে লোকেরা সবাই ছুটল মদীনার প্রান্তসীমায়। উপত্যকায় যেন বিশাল জনসমাগমের জায়গা সংকুলান হচ্ছিল না। তাঁদের তাকবীর ও আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল আকাশ-বাতাস।

অবশেষে নবীজি এসে পৌঁছুলেন। উচ্ছ্বসিত জনতার উষ্ণ মুবারকবাদ গ্রহণ করলেন। এর মধ্যেই তিনি লক্ষ করলেন—এখানে সেই লোকদেরকেও দেখা যাচ্ছে, মক্কার দুঃখ-মুসীবতের সময়ে যাঁরা ছিলেন তাঁর একান্ত সঙ্গী; যাঁদেরকে সেই কঠিন বিপদের দিনে শুধু আল্লাহর জন্য নিজেদের ভিটে-মাটি ও সব আপনজন ছেড়ে দূর দেশে পাড়ি জমানোর সময়ে এক মহা-ওয়াদা দিয়েছিলেন তিনি, যে, দেশত্যাগ করেও মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ও ইসলামের ওপর অটল থাকলে অবশ্যই তোমরা জান্নাতের হকদার হবে; পরকালে দেখা হবে—এই কথাই নিজেরা একে-অপরকে বুঝিয়েছিলেন; আর, আজ খাইবার বিজয় উদযাপনের দিনে তাঁদের সঙ্গে আবার মুলাকাত হচ্ছে! আরব উপদ্বীপে আজ ইসলামের জয়জয়কার। সর্বত্র উড়তে শুরু করেছে ইসলামের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের হিলালী নিশান।

নবীজি ﷺ মুহূর্তের মধ্যে সওয়ারি থেকে নেমে গেলেন। আগে বেড়ে চাচাতো ভাই জাফর ইবনু আবী তালিবকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মুআনাকা করলেন। তাঁর দুচোখে চুমু খেলেন। এরপর আবেগাপ্লুত স্বরে বললেন, 'খাইবার বিজয়, নাকি জাফরের আগমন—কোনটাতে আমার বেশি আনন্দ হচ্ছে, বুঝতে পারছি

[১] *তারীখু তাবারী* : ০৩/৮৯।

না!'[১] এরপর বাকি মুহাজিরদের সঙ্গেও তিনি মুলাকাত করলেন। সীরাতকার ইবনু ইসহাকের গণনায় তাঁদের সংখ্যা বলা হয়েছে ১৬ জন।[২]

এই মুহাজিরদের মধ্যেই ছিলেন উম্মু হাবীবা বিনতু আবী সুফিয়ান ইবনিল হারব। তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন—কখন তাঁকে নবীজি নিজের ঘরে নিয়ে যাবেন। হাবশায় থাকতেই যে রাসূলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, তারপরে তো কয়েক বছর কেটে গেছে; এখন অবধি হয়নি কোনো দেখা-সাক্ষাত, একান্ত মুলাকাত।

পরদেশে পরীক্ষা

বেশ কবছর আগের কথা। মুশরিকনেতা ও মক্কার সরদার আবু সুফিয়ানের মেয়ে রমলা বিনতু আবী সুফিয়ান তখন রাসূলের ফুফাতো ভাই উবাইদুল্লাহ ইবনু জাহশের স্ত্রী। উবাইদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিল; সঙ্গে রমলাও মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাবা আবু সুফিয়ান তখন পর্যন্ত কাফির থাকায় তাঁর তরফ থেকে যে কোনো বিপদের আশঙ্কা করছিলেন রমলা। তাই, দ্বিতীয় দফায় মুসলিমদের হাবশামুখী হিজরতের সময়ে নিজের দ্বীন রক্ষার্থে স্বামীর সঙ্গে তিনিও বেরিয়ে পড়েন মাতৃভূমি ছেড়ে। আর, মক্কায় বসে আবু সুফিয়ান ফেটে পড়েন রাগে। মেয়ে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে, অথচ তিনি কিছুই করতে পারছেন না!

হাবশা দেশেই রমলা তাঁর মেয়ে হাবীবাকে প্রসব করেন। যাঁর নাম যুক্ত করে তাঁকে বলা হতে থাকে 'উম্মু হাবীবা' (হাবীবার মা)। পরিবার-পরিজনের বিরহে বিষণ্ণ হয়ে পড়লে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা পেতে চাইতেন রমলা। এক রাতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। স্বপ্নে স্বামী উবাইদুল্লাহকে মারাত্মক বিকৃত রূপে দেখে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। সকালে তিনি জানতে পারেন—তাঁর স্বামী সেই মহান দ্বীন ত্যাগ করেছে, যেই দ্বীনের জন্য সে পরিবার-পরিজন ও মাতৃভূমি ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছিল এই সুদূর হাবশায়! শুধু কি তাই? বরং উবাইদুল্লাহ রমলাকেও ধর্মত্যাগী বানাতে চেষ্টা করে; কিন্তু রমলা তাঁর সত্য ধর্মে অটল থাকেন।[৩]

---

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/০৩, ০৫; *তারীখু তাবারী* : ০৩/৯০।
[২] প্রাগুক্ত।
[৩] *আল-ইসাবাহ* : ০৮/৮৪; *আস-সিমতুস সামীন* : ৯৬ ও *তাবাকাতু ইবনি সাদ*।

চিন্তা, পেরেশানি, দুঃখ, আর, আফসোসে রমলার যেন মরণদশা! ধর্ম যদি ত্যাগই করবে উবাইদুল্লাহ, তাহলে কীসের জন্য হিজরত করেছিল সে? কীসের জন্য শত নির্যাতন-নিপীড়ন ও দুঃখ-দুর্দশার মুখোমুখি হয়েছিল? বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে কোন স্বার্থে পরদেশে পাড়ি জমিয়েছিল তারা? এই যে উবাইদুল্লাহ ইসলাম ত্যাগ করেছে, এর মুখের দিকে চেয়েই তো সবকিছু সয়ে নিয়েছিল রমলা। প্রিয় বাবাকে দুঃখ ও ক্ষোভের আগুনে জ্বালিয়ে এসেছে এর কারণেই তো!

ইসলাম যদি ত্যাগ করারই নিয়ত ছিল, তবে তার জন্য এটাই তো উত্তম ছিল, যে, বাপ-দাদার ধর্মে অটল থেকে পরিবার ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে সেই ধর্মের পক্ষে লড়াই করত। সংগ্রাম চালিয়ে যেত জীবনের শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু তা না করে, ওই সবকিছু বর্জন করে, ইসলামকে দ্বীনরূপে গ্রহণের পর হাবশায় এসে কোনো ধরনের সমস্যা-সঙ্কট ছাড়াই আরেক অচেনা সম্প্রদায়ের ধর্মে দাখিল হয়ে যাওয়ার মতো তামাশা, অর্থহীন ও লজ্জাজনক কাজ আর কী হতে পারে!

এই যে সদ্যজাত শিশু মেয়ে হাবীবা, কী অপরাধে সে একজন মুরতাদ বাবা পেল? কেন এক অজানা-অচেনা পরিবেশে তাকে জন্ম নিতে হলো? তার মা-বাবার মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, পরিবারের বন্ধন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, নিকটজনেরা নানাধর্মে বিভক্ত হয়ে পড়েছে—বাবা এখন খ্রিষ্টান, মা মুসলিম, আর, প্রভাবশালী দাদা ইসলামের দুশমনরূপে হয়ে আছেন মুশরিক!

যে-লোকটিকে রমলা নিজের স্বামী বানিয়েছিলেন, যাকে নিজের শিশু মেয়েটির বাবার আসনে বসিয়েছিলেন, সেই লোকটির এহেন কর্মে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যায় তাঁর। লজ্জা ও সঙ্কোচের তীব্রতায় তিনি ঘরবন্দী হয়ে যান। মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার মাধ্যমে হলেও ওই লজ্জার হাত থেকে বাঁচার কী করুণ আকুতি তাঁর!

কিন্তু একে তো প্রবাস, তার ওপর স্বামীহীনা হয়ে মানুষের কাছ থেকেও দূরে থাকতে বাধ্য হওয়াটা সদ্য প্রসূতি মায়ের জন্য কতটা নির্মম! নিজের মাতৃভূমিতেও এখন তিনি ফিরতে পারছেন না—বাবা সেখানে ওই নবীর বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধের ঘোষণা করে রেখেছেন, যেই নবীর প্রতি ঈমানের কারণেই আজকে রমলা

প্রবাসী!

এ ছাড়াও ফিরে গেলে, মক্কার আর কোথাও কি তাঁর থাকার জায়গা হবে? বাবা-মার কাছে তো কল্পনাও করা যায় না—ইসলাম গ্রহণের পরেই তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। অথবা, জাহশ-পরিবারের বাড়িতে? সেটা তো তাঁর স্বামীর পরিবারের ঘর। নাহ, সেখানেও যাওয়া যাবে না। সেখানকার বাসিন্দারা সবাই হিজরত করে চলে গেছেন। ঘরগুলো পড়ে আছে শূন্য, বিরান!

এ-নিয়ে একটি খবরও তাঁর কানে এসেছে—একদিন নাকি উতবা ইবনু আবী রবীআ, আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব ও আবু জাহল ইবনু হিশাম বনু জাহশের বাসস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তো, উতবা সেই ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল—দরজা খোলা পড়ে আছে, ভেতরে নেই কোনো লোক! দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে তখন আবৃত্তি করল—

'যত কালই কেউ থাকুক-না সুখে-শান্তিতে

দুর্যোগ-দুর্ঘটনা একদিন পাবেই তাকে...

হায়, বনু জাহশের ঘর আজ শূন্য, পরিত্যাক্ত হয়ে পড়ে আছে!'

আবু জাহল তখন বলল, 'তো, এতে তোমার খারাপ লাগছে কেন?'

সে বলল, 'এটা তো আসলে আমাদের ভাতিজার দুষ্কর্মের ফল। সে আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে। আমাদের ধর্ম বিভক্ত করে দিয়েছে। আর, আমাদের সম্পর্কগুলো টুকরো টুকরো করে দিয়েছে চিরতরে...!' [১]

এসব মনে পড়লে, রমলা বুঝতে পারেন—মক্কায় ফিরে যাওয়ার কোনো পথ নেই তাঁর জন্য। সেখানে তাঁর নবী ও বাবার মাঝে চলছে ঘোরতর লড়াই। আর, শ্বশুরালয় হয়ে গেছে জনশূন্য, বিরান!

এল হিজাযের চিঠি

আরও কিছুদিন বিষাদ, বিষণ্ণতায় মলিন হয়ে থাকল। রমলা তাঁর দুঃখ-সাগরে ভাসতে থাকলেন ভাবনার নৌকায়...

হঠাৎ একদিন তাঁর বদ্ধ দুয়ারের কাছে কারও পায়ের আওয়াজ শোনা গেল।

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/১১৫।

কাছে যেতেই তিনি বুঝতে পারলেন—বাইরে থেকে বাদশাহ নাজাশীর কোনো দাসী ভেতরে আসার অনুমতি চাচ্ছে। রমলা ওরফে উম্মু হাবীবা দরজা খুললেন। দাসীটি ঘরে প্রবেশ করেই বলতে লাগল, 'বাদশাহ আপনাকে বলেছেন, যে, আরবের নবী আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এখন আপনি যেন তাঁর সঙ্গে নিজের বিয়ের জন্য কাউকে ওকীল নিযুক্ত করেন!'

উম্মু হাবীবা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। দাসীর কথা যেন তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছে না। দাসীর কাছ থেকে বার্তাটি তিনি আবার শুনলেন। আবার শুনলেন। এরপর আবার শুনলেন। অবশেষে এই মহাখোশখবরের প্রতি যখন কোনো সন্দেহ রইল না, তখন তিনি আনন্দের আতিশয্যে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হাতের দুটি বালা খুলে দাসীকে দিয়ে দিলেন।[১] এরপর তাঁর সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুহাজির খালিদ ইবনু সায়ীদ ইবনিল আস ইবনি উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে খবর পাঠিয়ে তাঁকে নিজের ওকীল নিযুক্ত করলেন।

সেদিন সন্ধ্যায়ই হাবশায় অবস্থানরত সব মুসলিমকে বাদশাহ নাজাশী ডেকে পাঠান। মুসলিমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই জাফর ইবনু আবী তালিব ও উম্মু হাবীবা রমলার ওকীল খালিদ ইবনু সায়ীদের নেতৃত্বে বাদশার দরবারে গিয়ে হাজির হন। সবাই আসন গ্রহণের পর বাদশাহ কথা বলতে শুরু করেন। দোভাষী তাঁর কথা ভাষান্তর করে মেহমানদেরকে বুঝিয়ে দিতে থাকেন। তিনি বলেন, 'মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন উম্মু হাবীবা বিনতু আবী সুফিয়ানকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য। তো, আপনাদের মধ্যে উম্মু হাবীবার বেশি নিকটবর্তী স্বজন কে?' লোকেরা বললেন, 'খালিদ ইবনু সায়ীদ। তাঁকেই উম্মু হাবীবা ওকীল বানিয়েছেন।'

নাজাশী এবার খালিদের দিকে ফিরে বলেন, 'তাহলে তো ভালোই। এবার তাঁকে আপনাদের নবীর সঙ্গে বিয়ে দিন। নবীর পক্ষ থেকে আমি তাঁর মহর হিসেবে দিচ্ছি চারশ' (কোনো বর্ণনায় আছে, চার হাজার) দিনার।'

এবার খালিদ উঠে বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রস্তাব কবুল করলাম এবং তাঁর সঙ্গে উম্মু হাবীবাকে বিয়ে দিলাম।'

---

[১] *আল-ইসাবাহ : ০৮/৮৪; আস-সিমতুস সামীন* (৬৭) ও *তাবাকাতু ইবনি সাদ।*

এরপর তিনি উম্মু হাবীবার পক্ষ থেকে মহর গ্রহণ করেন। এরপরেই নাজাশী ওলীমার ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'আপনারা সবাই বসুন। নবীগণের সুন্নাহ হলো—তাঁরা বিয়ে করলে ভোজের আয়োজন করেন।'[১]

ওলীমাপর্ব শেষ হলে মুসলিমরা উম্মু হাবীবাকে শুভেচ্ছা জানাতে হাজির হন তাঁর ঘরে। আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মু হাবীবা হয়ে যান মহাগৌরবের অধিকারিণী 'উম্মুল মুমিনীন'!

পরদিন সকালে নাজাশীর সেই দাসী উম্মু হাবীবার ঘরে আসে। এবার সে তাঁর জন্য নিয়ে আসে বাদশার স্ত্রীদের তরফ থেকে নানারকম উপহার-উপঢৌকন—উদ, আম্বর, বিশেষ রকমের সুগন্ধি ইত্যাদি। উম্মু হাবীবা তখন নিজের মহরের ৫০টি দিনার হাদিয়া হিসেবে পেশ করেন দাসীকে। বলেন, 'কাল আমার হাতে ওই বালা দুটি ছাড়া কিছুই ছিল না, তাই, ওগুলোই তোমাকে দিয়েছি। আজ তো আল্লাহ আমাকে অনেক দিয়েছেন, তাই, তোমাকেও কিছুটা শরীক করলাম।'

কিন্তু দাসীটি দিনারগুলো ছুঁয়ে দেখতেও অস্বীকৃতি জানায়; বালাগুলোও ফেরত দিয়ে সে বলে, 'বাদশাহ আমাকে অনেক উপহার দিয়েছেন। তিনি আমাকে আপনার কাছ থেকে কিছু নিতে বারণ করেছেন। তিনিই স্ত্রীদেরকে বলেছেন আপনার কাছে সুগন্ধি দ্রব্য হাদিয়া পাঠাতে।'

আবেগ, আনন্দ, আর, কৃতজ্ঞতায় যেন গলে গলে মিশে যাচ্ছিলেন উম্মু হাবীবা! বিয়ের সবগুলো উপহার খুব যত্নসহকারে রেখে দেন তিনি। অবশেষে প্রিয়তমের ঘরে এসব সহই পৌঁছান। প্রিয়তম স্বামী ও নবী তাঁর কাছে হাবশার উপহার-সামগ্রী দেখে অপছন্দ করেননি, খুশিই হয়েছেন খুব।

একদিকে বাবা, আরেক দিকে স্বামী

নবীগৃহে আবু সুফিয়ান-কন্যার আগমনের ফলে মদীনাবাসীর হৃদয়-আকাশে আরেকবার উড়তে শুরু করে আনন্দের ফানুস। উম্মু হাবীবার মামা উসমান ইবনু

[১] *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৯৩০; *আল-মুহাব্বার* : ৮৮; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/৮৪। শেষোক্ত দুটি গ্রন্থে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে, উম্মু হাবীবাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন উসমান ইবনু আফফান ইবনি আবিল আস ইবনি উমাইয়া। তিনি ছিলেন রমলা ওরফে উম্মু হাবীবার মামা। এবং সম্ভবত তিনিই উম্মু হাবীবাকে হিজরতের পর মদীনায় ফিরে রাসূলের ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

আফফান আরেকটি ওলীমার আয়োজন করেন। অনেকগুলো পশু জবাই করে মানুষের মেহমানদারী করেন তিনি। ওদিকে, মক্কাবাসীর ঘুম যেন উড়ে যায়। তাদের নেতা আবু সুফিয়ান মেয়ের বিয়ের সংবাদে বলে ওঠেন—'এমন স্বামীর নাক কাটা যায় না কেন!'[১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বনু নাযীরের কন্যা সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের কেবল কয়েকদিন হয়েছে মাত্র, এর মধ্যেই উম্মু হাবীবার আগমনে ঘরের অন্য স্ত্রীরা তাঁকেও স্বাগত জানান। নিজেদের স্বর্ণাসনে আরেকটু জায়গা ছেড়ে দেন তাঁরা আরেকটি মানুষের জন্য।

উম্মু হাবীবা সর্বদা একটা মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতেন। কারণ, তাঁর বাবা তখনও মূর্তিপূজায় ডুবে থাকায়, তাঁর স্বামী ও বাবার মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। কেউ একজন নিহত হলো মানে, তাঁর বাবার পক্ষের একজন মানুষ শেষ হয়ে গেল; কিবা, কেউ একজন শহীদ হলো মানে, স্বামীর কোনো সাহাবীর চিরবিদায়! যাঁদের প্রতি সম্বন্ধ করেই তাঁকে ডাকা হয় 'উম্মুল মুমিনীন'।

একদিন উম্মু হাবীবা খবর পেলেন—কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করেছে। শোনার পরেই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বুঝে এসে গেল তাঁর। কারণ, স্বামীর আচরণ ও মেজায সম্পর্কে তিনি ভালোই জানেন। কোনো অন্যায়, গাদ্দারি, বা চুক্তিভঙ্গের মতো বিষয় সহ্য করবেন না তিনি। তিনি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন—প্রিয়তম নবী মক্কায় হামলা করে মুশরিকদের সামনেই গুড়িয়ে দিচ্ছেন ওদের বাতিল প্রভুদের অস্তিত্ব। আর, সেই মুশরিকদের মধ্যেই আছেন তাঁর বাবা, ভাই ও পরিবার-স্বজনদের সবাই!

মক্কার প্রকৃত অবস্থাও তাঁর কানে পৌঁছে গেল। মক্কার ভীত, শঙ্কিত নেতৃবর্গ উদ্ভ্রান্তের মতো পরামর্শে বসেছে নবী মুহাম্মাদের ব্যাপারে। সেই মুহাম্মাদ, যাঁকে ও যাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে একসময় তারা ঠাট্টা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত, চালাত নানাবিধ স্বেচ্ছাচার ও অমানবিক নির্যাতন। আর, আজ তিনি পুরো আরবে শক্তি, সম্মান ও ক্ষমতার শীর্ষচূড়ায় আসীন, আজও কি তারা তাঁকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারবে?

---

[১] *তারীখু তাবারী* : ০৩/৯০; *আস-সিমতুস সামীন* : ৯৯; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৮৪৫; *নাসাবু কুরাইশ* : ১২২।

বহু কথাবার্তার পর তারা সিদ্ধান্ত নেয়, যে, নিজেদের পক্ষ থেকে মদীনায় একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে চুক্তি নবায়ন করবে; এবং চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১০ বছরে উন্নীত করবে। কিন্তু সেই প্রতিনিধি হবে কে? দেখা গেল—আবু সুফিয়ান ইবনুল হারব ছাড়া আর কেউ এই পদের যোগ্য নয়!

আবু সুফিয়ান যেন অসহায়ভাবে বন্দী হলেন তাদের সিদ্ধান্তে। এতদিন যেই যুদ্ধ ও অস্থিরতার মূল হোতা ছিলেন তিনি, চিরশত্রু মুহাম্মাদের কাছে সেই ব্যাপারে গিয়েই অনুনয়-বিনয় করতে হবে! ভালো সম্পর্ক ও সন্ধির আবেদন করতে হবে মুহাম্মাদের সামনে! লাঞ্ছনাগ্রস্ত মনে মদীনার উদ্দেশে মক্কা থেকে বের হলেন আবু সুফিয়ান। গন্তব্যে পৌঁছে প্রথমেই মুহাম্মাদের সাক্ষাতে যেতে অপ্রস্তত ও বিব্রতবোধ করলেন তিনি। তাই, দুশমনেরই ঘরে-থাকা নিজের মেয়ের কাছে সাহায্য চাইতে গেলেন।

হঠাৎ নিজের ঘরের সামনে বাবাকে দেখে উম্মু হাবীবা ভয় পেয়ে গেলেন। হাবশায় হিজরতের পরে আর তো দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে; তাই, উৎকণ্ঠিত মনে দরজায় এসে দাঁড়ালেন উম্মু হাবীবা—জানেন না, বাবা কী বলবেন, বা, কী করবেন...

মেয়ের চেহারা দেখে তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন আবু সুফিয়ান। তাই, তাঁর অনুমতির অপেক্ষা না-করে নিজেই ঘরে ঢুকে বিছানায় বসতে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পারামাত্র মেয়ে উম্মু হাবীবা সঙ্গে সঙ্গে বিছানাটি সরিয়ে নিয়ে গুটিয়ে ফেললেন। এরপর দাঁড়ালেন স্থির হয়ে। মেয়ের সব কর্মকাণ্ড চুপচাপ দেখলেন আবু সুফিয়ান। তারপর বললেন, 'কী হলো? তুমি এই বিছানাটিকে আমার জন্য পছন্দ করছ না, নাকি, আমাকে এই বিছানার জন্য উপযুক্ত মনে করছ না?'

মেয়ের জবাব তাঁর কানে এল—'এটা তো আল্লাহর রাসূলের বিছানা। আর, আপনি একজন মুশরিক, তাই, এতে আপনার বসা আমার পছন্দ নয়।'

মেয়ের কথা শুনে আবু সুফিয়ানের যেন বুক ভেঙে যাচ্ছিল কষ্টে। তিনি শুধু বলতে পারলেন—'মেয়ে, আমার কাছ থেকে দূরে যাওয়ার পরে তোমাকে

অশুভ ও অনিষ্টে পেয়ে বসেছে।'[১] এই কথা বলে রাগান্বিত ভঙ্গিতে চলে গেলেন তিনি। অপরদিকে উম্মু হাবীবা অশ্রুসিক্ত, বিবশ অনুভূতি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দেয়ালে হেলান দিয়ে।

শেষপর্যন্ত আবু সুফিয়ান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে হাজির হলেন। এই হাজিরির ফলও জানতে পারলেন উম্মু হাবীবা। আবু সুফিয়ান চুক্তি নবায়নের ব্যাপারে নানাভাবে আবদার করেছেন; কিন্তু রাসূল কোনো জবাবই দেননি।[২] এরপর আবু বকরকে ভায়া ধরতে চেয়েছেন তিনি; কিন্তু আবু বকর তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরপর তিনি গেছেন উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে; রাগত স্বরে উমর জবাব দিয়েছেন, 'রাসূলের কাছে তোমাদের জন্য আমি সুপারিশ করব? আল্লাহর কসম! অণুপরিমাণ বস্তুও আমার হাতে থাকলে, সেটা দিয়েই আমি তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব!'[৩]

উপায় না-পেয়ে আবু সুফিয়ান গেলেন আলী ইবনু আবী তালিবের ঘরে। সেখানে তখন রাসূলের মেয়ে ও আলীর স্ত্রী ফাতিমাও বসে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ফাতিমার ছেলে হাসান। মায়ের সামনে খেলাধুলা করছিলেন তিনি। আবু সুফিয়ান গিয়ে বললেন, 'আলী! মনে হচ্ছে তুমি আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়া দেখাতে পারবে। দেখো, আমি একটি প্রয়োজনে এসেছি। তুমি সেই ব্যাপারে একটু মুহাম্মাদের কাছে সুপারিশ করে দাও।'

আলী বললেন, 'আবু সুফিয়ান, তোমরা নিপাত যাও। আল্লাহর কসম! রাসূল ﷺ তো এমন একটি বিষয়ের দৃঢ় ইচ্ছা করে ফেলেছেন, যে-বিষয়ে কোনো কথা বলার অধিকার আমরা রাখি না।'

আবু সুফিয়ান এবার কাকুতি-মিনতি করে ফাতিমাকে বললেন, 'ও মুহাম্মাদের মেয়ে, তুমি কি তোমার এই ছেলেটিকে মানুষের মাঝে নিরাপত্তা ঘোষণা করতে বলতে পার, এতে করে বড় হওয়ার পরে একসময়ে সে হবে পুরো আরবের সরদার।'

ফাতিমা বললেন, 'আরে, আমার ছেলের তো অমন ঘোষণা দেওয়ার মতো

---

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/৩৮; *তাবাকাতু ইবনি সাদ* ও *আল-ইসাবাহ*।
[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/৩৮; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১১২; *আস-সিমতুস সামীন* : ১০০।
[৩] *তারীখু তাবারী* : ০৩/১১২।

বয়সই হয়নি; আর, আল্লাহর রাসূলের সামনে আলাদা কেউ নিরাপত্তা ঘোষণা করতে পারবে না।'

সব দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। আশার ক্ষীণ আলোও নিভে গেল। আবু সুফিয়ানের চোখে আঁধার নেমে এল। এমন সময়ে আলী বলে উঠলেন, 'তোমার উপকার হতে পারে, এমন কোনো কিছুই আমার জানা নেই। কিন্তু তুমি তো বনু কিনানার সরদার; তাই, একটা উপায় বলে দিই, দেখো, কী হয়! তুমি গিয়ে নিজেই মানুষের মাঝে নিরাপত্তার ঘোষণা দাও। এরপর নিজের এলাকায় চলে যাও। এই পন্থাও তোমার কোনো উপকারে আসবে বলে মনে হয় না আমার। কিন্তু এ-ছাড়া বলার, বা, করার মতো আর কিছু নেই।' [১]

আলীর কথামতো আবু সুফিয়ান মসজিদে গিয়ে মানুষের সামনে নিরাপত্তার ঘোষণা দিলেন। এরপরেই তিনি সওয়ারি নিয়ে মক্কার পথে এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন যেন কেউ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছে!

বাবার এই পুরো অবস্থাই জানতে পারলেন উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবা। তিনি শুধু প্রিয়তম স্বামী ও রাসূলের জন্য দুআ করতে থাকলেন; স্বামী তখন হারামের ভূমিতে এক মহাসমর পরিচালনার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

ওদিকে পুরো মক্কা অস্থির, উৎকণ্ঠিত। সিদ্ধান্তবিহীন ব্যর্থ ফিরে আসা প্রতিনিধি আবু সুফিয়ানের বক্তব্য শুনছে তারা। আবু সুফিয়ান বলছেন—'আমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়েছি, সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরপর আবু কুহাফার ছেলের (আবু বকর) কাছে গিয়েছি, তার কাছেও ভালো কিছু পাইনি। এরপর গিয়েছি খাত্তাবের বেটার (উমর) কাছে, সে তো দেখি আমাদের ঘোর দুশমন!' [২]

এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হলেন উম্মু হাবীবা। একদিকে স্বামী ও নবী মুহাম্মাদের বিজয়ের জন্য দুআ করতে হবে। অপরদিকে নিজের সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। কিন্তু নিজেরই বাপ-ভাই ও আত্মীয়-স্বজনের রক্তসম্পর্ক কী করে তিনি অস্বীকার করবেন? নিজের মন থেকে কী করে তিনি মুছে ফেলবেন সম্প্রদায়ের অপরিহার্য দুর্গতির বেদনা? না, তিনি এটা পারবেন না; তাঁর কাছে রাসূলের পরাজয় যেমন কষ্টের, তাদের

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/৩৮; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১১২।
[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/৩৯; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১১৩।

দুর্গতিও তেমন বেদনার!

এই মনোবেদনায় পিষ্ট হতে হতেই তাঁর মনে হঠাৎ একটু আশার আলো জ্বলে উঠল—'আচ্ছা, আমার ভাই মুআবিয়ার মতো করে, উমর, খালিদ ও রাসূলের জামাতা আবুল আসের মতো করে বাবাও কি ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারেন না?' কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো—নাহ, এটা খুবই অসার এক কল্পনা; বাবা হয়তো কোনো দিনই ইসলামের সামনে মাথা নোয়াবেন না!

আশার আলো জ্বলতে-না-জ্বলতেই নিভে যেতে চায়; কিন্তু মন যে মানে না! যেন এই আলোটুকুই মনের আঁধার বেদনায় স্নিগ্ধ পরশ বোলায়। তাই, সব উপায় হারিয়ে তাঁর অভিমুখী হলো উম্মু হাবীবা, সব উপায়েরও যিনি উৎসমূল!

বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে আবেগাপ্লুত উম্মু হাবীবার অশ্রুতে জোয়ার আসে। ঝরঝর করে বর্ষণ শুরু হয় মুক্তাদানার। তিনি দুআ করেন—'মালিক, তুমি তো সবই পার—বাবাকে তাহলে দাও না তোমার মায়ার হিদায়াত!'

দুআর পর উম্মু হাবীবার মনে শান্তি নামে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তাঁর বিয়ের সময়ে নাযিলকৃত আয়াত তিলাওয়াত করেন তিনি—

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

> *'যারা তোমাদের শত্রু, আল্লাহ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবত বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সবই করতে পারেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।'*[১]

নিজের বাবা ও সম্প্রদায়ের জন্য এই দুআর বাইরে আর কী করার ছিল তাঁর!

এই সময়েই একজন বদরী সাহাবীর একটি কাজে আবার এক সঙ্কটের মতো অবস্থা তৈরি হলো। তিনি সারা নামের এক নারীর কাছে একটি চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, 'এটা কুরাইশের কাছে পৌঁছে দিলে, তোমাকে মোটা অংকের প্রতিদান দেওয়া হবে।' চিঠিটিতে কুরাইশকে তাদের আসন্ন দুর্গতি সম্পর্কে

[১] সূরা মুমতাহিনাহ : ০৭। *আস-সিমতুস সামীন* : ১১০।

সতর্ক করা হয়েছিল।[১]

এই খবর নবীজি ﷺ ওহীর মাধ্যমে জেনে ফেলেন। চিঠিপ্রেরক ছিলেন হাতিব ইবনু আবী বালতাআ। নবীজি তক্ষুণি আলী ইবনু আবী তালিব ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে পাঠিয়ে সেই নারীর কাছ থেকে চিঠি উদ্ধার করে আনলেন। এরপর তিনি হাতিবকে ডেকে তাঁর এই কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, কসম! আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানদার। আমার ঈমানে কোনো পরিবর্তন আসেনি; কিন্তু ওদের কাছে আমার পরিবার ও সন্তানাদি রয়ে গেছে; তাই, এই কাজ করেছি আমি!'

উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু তিনি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বলে রাসূল ﷺ তাঁকে ক্ষমা করে দেন।[২]

হযরত হাতিব একজন বদরী সাহাবী হয়েও এতবড় কর্ম করে ফেলেছিলেন নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্য! তাহলে, উম্মু হাবীবার তখন কী অবস্থা? নিজের স্বামীকে ১০ হাজার যোদ্ধা নিয়ে মক্কার পানে রওনা হতে দেখে কতটা তীব্র কষ্ট-কান্না বুকে চেপে অসহায় বসে ছিলেন তিনি? তাঁর তো বাপ, ভাই, আত্মীয়-স্বজন—সবাই ওখানে; বরং ওরাই তাঁর রক্তের পূর্বসূরি!

অবশেষে কী হলো? যা হবার তা-ই হলো! উম্মু হাবীবার স্বামী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ﷺ বিজয় লাভ করলেন। খোশখবরের সুখ-বাতাস মদীনায় পৌঁছে গেল। সেই সাথে পৌঁছে গেল উম্মু হাবীবার জন্য শান্তির যমযম হয়ে আসা ওই খবরও, যাতে বিবৃত হয়েছে—মক্কার অদূরে শহরমুখী যোদ্ধাদের জ্বালানো আগুন দেখে তাঁদেরকে পরখ করতে চুপিসারে এগিয়ে আসেন কুরাইশ-প্রতিনিধি আবু সুফিয়ান। অবশেষে আবারও রাসূলের মুখোমুখি হন তিনি।

প্রথমে আব্বাস ﷺ তাঁকে দেখতে পান। ডেকে বলেন, 'ও আবু হানযালা! দেখছ তো মানুষের মধ্যে অবস্থান করছেন আল্লাহর রাসূল। আগামী সকালে তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করবেন, তখন সময়টা কুরাইশের জন্য বড় অশুভ হবে। তুমি ও তোমার আত্মীয়-স্বজন দুর্ভাগা হওয়ার আগেই মুসলিম হয়ে যাও!'[৩]

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/৪০; *আল-ইসাবাহ* : 'হাতিব ইবনু আবি বালতাআর জীবনী'।
[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/১০।
[৩] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/৪৫; *তারীখু তাবারী* : ০৩/৪০; *তাবাকাতু ইবনি সাদ* : ০২/৯৮।

আবু সুফিয়ান বললেন, 'আপনার প্রতি আমার মা-বাবা কুরবান হোন! অন্য কোনো উপায় কি বলতে পারেন?'

আব্বাস তখন আবু সুফিয়ানকে নিজের সওয়ারির পেছনে বসিয়ে সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে রওনা হলেন। উভয় পাশে ১০ হাজার সেনা আগুন জ্বালিয়ে বসে আছেন মুশরিকদের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে উমর আবু সুফিয়ানকে চিনে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাসূলের কাছে গেলেন আবু সুফিয়ানের গর্দান ফেলে দেওয়ার অনুমতি চাইতে।

তাঁর পরপরই এলেন আব্বাস। তাঁবুতে প্রবেশ করেই বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একে নিরাপত্তা দিয়েছি।' এরই মধ্যে আশপাশে যাঁরা জড়ো হয়েছিলেন, তাঁরা রুদ্ধশ্বাসে শুনলেন রাসূলের বক্তব্য—'আব্বাস! তাকে এখন আপনার তাঁবুতেই নিয়ে যান। সকালে নিয়ে আসবেন।'

সারারাত নির্ঘুম কাটল আবু সুফিয়ানের। এক মুহূর্তের ঘুমও তাঁর চোখের পাতা ছোঁয়নি। তাঁর মতো কুরাইশনেতার ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ কী সিদ্ধান্ত দেবেন—তা ভাবতে ভাবতেই রাত ফুরিয়ে গেল তাঁর। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবু সুফিয়ানকে রাসূলের দরবারে নিয়ে আসা হলো। সেখানে এরই মধ্যে হাজির হয়েছেন বিশিষ্ট আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ।[১] শুরুতেই রাসূল ﷺ বললেন, 'আবু সুফিয়ান! আফসোস, এখনও কি আপনি বুঝতে পারেননি, যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই?'

আবু সুফিয়ান বললেন, 'আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি কুরবান হোন! কী ধৈর্য, দয়া ও আত্মীয়পরায়ণ আপনি! কসম খোদার, আমি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি, যে, আল্লাহর সঙ্গে কোনো ইলাহ থাকলে সে আমাকে এতক্ষণে কোনো সাহায্য করতই!'

রাসূল বললেন, 'আফসোস! আপনি কি এখনও বুঝতে পারেননি, যে, আমি আল্লাহর রাসূল?'

উম্মু হাবীবার বাবা বললেন, 'এ-ব্যাপারে আমার মনে এখনও কিছুটা দ্বিধা আছে!'

---

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/৪৫; *তারীখু তাবারী* : ০৩/৪০।

তবে, একটু পরেই আবু সুফিয়ান ইসলামের ঘোষণা দেন। তখন আব্বাস ﷺ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবদার করেন, যে, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে আবু সুফিয়ানের প্রতি কোনো বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করলে ভালো হয়। নবীজি জবাব দেন, 'হ্যাঁ, মক্কার যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে, তারা নিরাপদ থাকবে; যারা নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে অবস্থান করবে, কিবা, মসজিদে হারামে আশ্রয় নেবে, তারাও নিরাপত্তা পাবে।'[১]

তখনই মক্কায় ঘোষণা করা হলো—'যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে, তারা নিরাপদ থাকবে...।'

আরবের দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল এই খোশখবর। এমনকি সুদূর মদীনায় বসে উম্মু হাবীবাও শুনলেন। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি—'আহ, আমার বাবার ঘরে আশ্রয়গ্রহণকারীরা নিরাপদ!' ওহ, কত মহানুভব তাঁর স্বামী রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ! কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল তাঁর; সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

তারপর অতিবাহিত হয়েছে আরও দীর্ঘ সময়। কিছু দিনের মধ্যে রাসূল ﷺ ইহধাম ত্যাগ করেন। রাসূলের সবচেয়ে প্রিয় চারজন ব্যক্তিত্বের খিলাফাত-কাল অতিবাহিত হয়। তাঁর ভাই মুআবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ানের শাসনকাল আসে। অবশেষে একদিন সেই মুহূর্ত হাজির হয়, যার পরের সময়টুকুর সঙ্গে পার্থিব সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

মুমূর্ষু উম্মু হাবীবা ডেকে পাঠান আয়িশাকে; তারপর বলেন, 'সতীনদের মধ্যে সাধারণত যেসব ঘটে, তেমন অনেক কিছুই আমাদের মধ্যে ঘটেছে। এখন তুমি সেটা মাফ করে দাও।'

আয়িশা অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, 'অবশ্যই! আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন।'

এই কথা শুনে তাঁর চেহারায় খুশির আভা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষীণ স্বরে তিনি বলে ওঠেন—'তুমি আমাকে খুশি করেছ, আল্লাহ তোমাকে খুশি করুন।'

উম্মু সালামা বিনতু যাদির রাকব রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গেও একই কথা হয়

---

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/৪৬; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১১৭; *তাবাকাতু ইবনি সাদ* : ০২/৯৮।

তাঁর।[১] এরপর শান্ত, স্থির হয়ে রবের রহম-চাদর মুড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েন উম্মু হাবীবা। হিজরী ৪৪ সনের সেই শোক-ছেয়ে-যাওয়া দিনটিতে মদীনার মাটিতে তিনি নিজেকে সঁপে দেন। যেন তাঁকে নয়—নিজেদের অসহনীয় শোককেই জান্নাতুল বাকীতে দাফন করে আসে লোকেরা।

কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণিত ৬৫টি হাদীস[২] আজও তাঁর খোশবু ছড়ায়। তাঁর মেয়ে হাবীবা, ভাতিজা আবদুল্লাহ ও ভাগ্নে আবু সুফিয়ানসহ অনেকেই তাঁর সেই নববী মীরাসের খোশবু ছড়িয়েছেন মানুষের কাছে। মুসলিমদের কাছে বয়ান করেছেন রাসূলের সঙ্গে তাঁর সুহবতে প্রাপ্ত মণিমুক্তার সুর।

---

[১] *আস-সিমতুস সামীন* : ১০১; এ ছাড়াও দেখুন—*তাবাকাতু ইবনি সাদ* ও *আল-ইসাবাহ*।
[২] *আল-ইসাবাহ* : ০৮/৮৫; *তাহযীবুত তাহযীব* : ১২/৪১৯; *খুলাসাতুত তাহযীব* : ৪২৩।

উম্মু ইবরাহীম

মারিয়া আল-কিবতিয়া

> ‘তোমরা কিবতীদের সঙ্গে সদাচার কোরো। কারণ, তোমাদের ওপর তাদের যিম্মাদারী ও আত্মীয়তার হক আছে।’
>
> —[*সহীহ মুসলিম*]

মিশরী উপহার

নবীগৃহের খুব কাছেই আলাদা একটি ঘরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন উপপত্নী বাস করতেন, যাঁকে ‘উম্মুল মুমিনীন’ উপাধি দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু (খাদীজা ব্যতীত) অন্য সবার চেয়ে আলাদাভাবে তিনি এক বিশেষ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। রাসূলের পুত্র ইবরাহীমের মা হওয়ার গৌরব অর্জন করে[১] এই ক্ষেত্রে অন্য সবাইকে পেছনে ফেলেছেন। ফলে, মসজিদ-সংশ্লিষ্ট নবীগৃহে তিনি বাস না-করলেও, সেখানে ও সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে তাঁর প্রতি বিশেষ প্রতিক্রিয়া বিরাজমান থাকত সবসময়।

কে এই উপপত্নী? কীভাবে তিনি রাসূলের জীবন-উদ্যানে আগমন করেন? এবং রাসূলের কাছে তাঁর মর্যাদা কেমন ছিল?

নীলনদের পূর্ব তীরবর্তী মিশরের ‘আনসানা’[২] শহরের কাছে ‘হিফন’ নামক গ্রামে মারিয়া বিনতু শামউনের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন একজন কিবতী, মা

[১] *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৯১২; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/১৮৫।

[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/০৭। এ ছাড়াও দেখতে পারেন—উস্তায হিফনী নাসিফের প্রবন্ধ ‘*মাওতিনু মারিয়া আল-কিবতিয়্যাহ মিনাদ-দিয়ারিল মিসরিয়্যাহ*’।

একজন রোমান। যৌবনের বহু আগে কোমল কৈশোরেই বোন সীরীনের সঙ্গে কিবতি বাদশাহ মুকাওকিসের হেরেমের বাসিন্দা হয়ে যান মারিয়া। সেখানে থেকেই তাঁরা শুনতে পান—আরব উপদ্বীপে এক নবীর আগমন ঘটেছে। তিনি নতুন এক আসমানী ধর্মের প্রতি মানুষকে আহ্বান করছেন। একদিন তাঁর পক্ষ থেকে দূত হাতিব ইবনু আবী বালতাআ একটি পত্র নিয়ে হজির হন বাদশাহ মুকাওকিসের দরবারে। মারিয়া তখন প্রাসাদেই ছিলেন।

বাদশার অনুমতি পেয়ে দূত প্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং পত্রটি তাঁর হাতে অর্পণ করেন। পত্রে লেখা ছিল—

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

'মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহর পক্ষ থেকে কিবতী বাদশাহ মুকাওকিসের প্রতি; হিদায়াত ও সরল পথের অনুসারীদের প্রতি সালাম। পরকথা এই যে, আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছি। এই প্রস্তাব কবুল করলে আপনি ভালো থাকবেন; আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুন প্রতিদান দেবেন; আর, এথেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, পুরো কিবতী জাতির পাপের ভাগী আপনি হবেন।

'হে আহলে কিতাব (পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের ধারকগণ), আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যে-কথাটি বরাবর, সেটির প্রতি এগিয়ে আসো, যে, 'আমরা এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারও ইবাদাত করব না; তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার বানাব না; আল্লাহকে ছেড়ে নিজেরা একে অপরকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না।' (আল্লাহ বলেন—) ওরা এই প্রস্তাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমরা (মুসলিমরা) বলো, সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম।'[১]

পাঠের পর মুকাওকিস পত্রটি খুব যত্ন ও মর্যাদার সঙ্গে একটি পাত্রে রাখেন। এক দাসী এসে ভেতরে নিয়ে যায় সেটি।

এরপর দূত হাতিবের দিকে তাকিয়ে বাদশাহ বলেন, 'আপনাদের নবী সম্পর্কে কিছু বলুন আমাকে।' তাঁর কথামতো হাতিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা দেন। মুকাওকিস কিছু সময় চিন্তা-ভাবনা করে বলেন, 'আমি

[১] *তারীখু তাবারী* : ০৩/৮৫; *আল-মুহাব্বার* : ৯৮; *উয়ূনুল আসার* : ০২/২৬৬ ও *আল-ইসাবাহ*।

আগ থেকেই জানতাম, যে, আর মাত্র একজন নবীর আগমন হবে দুনিয়ায়। ধারণা করেছিলাম, তিনি শাম দেশের হবেন। কারণ, ইতিপূর্বে বহু নবীর আগমনস্থল ছিল সেই মাটি। কিন্তু এখন তো দেখছি, তিনি আরব-বংশোদ্ভূত। কিবতীরা তো এই ব্যাপারে আমার কথা শুনবে না।' এই কথা বলে তিনি যেন পাশ কাটিয়ে যেতে চান। এরপর কেরানিকে ডেকে পত্রে জবাব লেখান—

> *'...পরকথা এই, যে, আমি আপনার পত্রটি পড়ে দেখেছি। সেখানে আপনি যা বলেছেন, যার প্রতি আহ্বান করেছেন, সেসবও আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার জানামতে যেই একজন নবীর আগমন অবশিষ্ট আছে, তিনি শামের হবেন...*
>
> *'অবশ্য, আমি আপনার দূতকে সম্মান করেছি; এবং আপনার জন্য এমন দুজন দাসী উপহার পাঠাচ্ছি, যারা কিবতীদের কাছে মহামূল্যবান। সাথে কিছু পোষাক ও সফরের জন্য একটি বাহনজন্তুও দিয়েছি। ভালো থাকবেন। আপনার প্রতি সালাম।'*[১]

লেখার পর মুকাওকিস পত্রটি হাতিবের হাতে দিয়ে বলেন, 'কিবতীরা তাদের ধর্মবিষয়ে অত্যন্ত কট্টর। তাই, আশা করি, আপনারা আমার অপারগতা বুঝতে পারবেন। আর, আমাদের মধ্যে যা-ই কথাবার্তা হয়েছে, বাইরের কোনো কিবতীর কাছেই তা এক হরফও বলবেন না।'

রাসূলের দূত হাতিব মিশর থেকে ফিরে চলেন মদীনার উদ্দেশ্যে। সঙ্গে নিয়ে চলেন মারিয়া ও তাঁর বোন সীরীনকে। সাথে আরও ছিল একটি অণ্ডকোষহীন দাস, এক হাজার মিসকাল স্বর্ণ, মিসরের তৈরি ২০টি মিহি কাপড়, ধূসর বর্ণের একটি খচ্চর (যার নাম ছিল দুলদুল), বিশেষ এক প্রকারের মধু, কিছু ধূপ, উদ ও মিশক আম্বর।

মাতৃভূমির বিচ্ছেদ-বেদনা যেন দুবোনকে জাপটে ধরল। বারবার তাঁরা পেছন ফিরে দেখতে লাগলেন। তাঁদের অশ্রুধোয়া দৃষ্টিতে বড় ধূসর হয়ে দেখা দিল নিজেদের পরিচিত মাঠ-ঘাট, ফসলি যমীন, মানুষজন ও শৈশব, কৈশোর, আর যৌবনের অগুনতি স্মৃতির আকর ছোট-বড় নানানরকমের ঘরগুলো।

---

[১] প্রাগুক্ত।

হাতিবও তাঁদের অবস্থা বুঝতে পেরে, ধীরে ধীরে তাঁদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। নিজের মাতৃভূমি ও পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূখণ্ড মক্কা-হিজায সম্পর্কে নানা কল্পকাহিনী, লোককথা ও গল্পকেচ্ছা শোনাতে লাগলেন তাঁদেরকে। এরপরেই তিনি তাঁদের কাছে বর্ণনা করতে শুরু করলেন প্রিয়তম নবীর অলৌকিক শোভামণ্ডিত চরিত্র ও তাঁর আসমানী আলো বিচ্ছুরণরত চেতনার কথা। তাঁর বয়ানে ফুটে উঠল এক সাচ্চা মুমিনের হৃদয়, সত্য প্রেমিকের অনুভব, নির্দ্বিধ অনুসারীর আবেগ ও অকৃত্রিম সহচরের পরিচয়। মারিয়া ও সীরীন মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়ে গেলেন। হৃদয় তাঁদের উথাল-পাথাল করতে শুরু করল ইসলাম ও ইসলামের নবীর প্রতি এক অভূতপূর্ব আকর্ষণে।

খুব শিগগির জীবনের নতুন যেই আঙিনায় কদম রাখতে হবে, হাতিবের ফেরার প্রতীক্ষায় মদীনায় বসে থাকা যেই নবীর মুলাকাতে নিজেদেরকে হাজির করতে হবে, সেই আঙিনা ও নবীর চিন্তায় ডুবে গেলেন মারিয়া ও তাঁর বোন।

আল-ইসাবাহ গ্রন্থে ইবনু সাদের সূত্রে আছে—মারিয়া ও তাঁর বোনকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতও দিয়েছিলেন হাতিব ﵁; তাঁরা তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

অবশেষে হাতিবের নেতৃত্বাধীন এই ছোট্ট কাফেলাটি সপ্তম হিজরীর কোনো এক দিনে মদীনায় গিয়ে হাজির হয়। নবীজি ﷺ তখন কুরাইশের সঙ্গে হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করে মদীনায় ফিরেছেন। হাতিবের কাছ থেকে তিনি মুকাওকিসের পত্র গ্রহণ করলেন। সঙ্গে গ্রহণ করলেন মিসরের অমূল্য 'উপহার'।

দুজনের মধ্যে মারিয়াকেই বেশি পছন্দ করেন রাসূল। আর, সীরীনকে পাঠিয়ে দেন নিজের ব্যক্তিগত কবি হাসসান ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ঘরে।

মুহূর্তের মধ্যেই সবার কানে কানে খবর পৌঁছে যায়, এমনকি নবীগৃহের বাসিন্দারাও জানতে পারেন, যে, ভারি মিষ্টি, মনকাড়া রূপের অধিকারিণী, কোঁকড়া চুলের এক মিশরী মেয়ে নীলনদের দেশ থেকে নবীর জন্য হাদিয়া এসেছে। তিনি তাকে মসজিদে নববীর কাছেই হারিসা ইবনু নুমানের ঘরে নিয়ে গেছেন।

আশা ও জলছায়া

এক বছর, বা, তার কাছাকাছি সময় চলে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য-সৌরভে খোশনসীব সময় যাপিত হচ্ছে মারিয়ার। এমনকি, একজন দাসী হিসেবে আগমন করা সত্ত্বেও উম্মুল মুমিনীনদের মতো তাঁর জন্যও পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে—এরচেয়ে সম্মানের কী আছে আর!

নিজের অস্তিত্বে মিশরী জাদুমাখা রূপের বাহার নিয়েও সব স্বপ্ন ও ভয় প্রায় হারিয়ে গেছে মারিয়ার। তাঁর তাবৎ ভাবনা-চিন্তা শুধু এখন সেই মহান মানুষটিকে ঘিরে, অপ্রত্যাশিতভাবে যাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তাঁর জীবনের সুতো; যেই মানুষটি এখন তাঁর মনিব, সঙ্গী, পরিবার ও দেশ—সব; যাঁর সঙ্গ ও সান্নিধ্যে জীবনের অবশিষ্ট সময়গুলো কাটিয়ে দিতে পারার চিন্তাতেই অহোরাত্রি মগ্ন থাকেন তিনি!

সর্বদা এক অমোঘ আকর্ষণ যেন তাঁকে গল্পে মাতিয়ে তোলে। অতীত ইতিহাসের নানান বিষয়াশয়ে মজে থাকেন তিনি। প্রায়ই তাঁর মনে জেগে ওঠে আরেক মিশরী নারীর জীবনকথা; যাঁর নাম ছিল হাজেরা। নীলনদের দেশ থেকে-আসা সেই নারীও মনিব ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তান ধারণ করেছিলেন গর্ভে। যার ফলে, মনিবের স্ত্রী সারার ঈর্ষানলে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। একপর্যায়ে মনিব তাঁকে ও পুত্র ইসমাঈলকে আল্লাহর সুপ্রাচীন ঘরটির কাছে নিয়ে আসেন। এখানেই তাঁদেরকে তিনি রেখে যান একলা-নিঃসঙ্গ করে। জনশূন্য, ফুল-ফসলহীন ভূমিতে, আল্লাহর সম্মানিত ঘরের প্রতিবেশীরূপে তাঁদেরকে রেখে দিয়ে ইবরাহীম বিদায় নেন।

মারিয়ার প্রায়ই ওই গল্পগুলো শুনতে মনে চায়, যে, আসমানী কোন সাহায্যে মিশরী নারী হাজেরা দিশা পেয়েছিলেন যমযম কূপের! কীভাবে সেই চিরপ্রাণোচ্ছল প্রস্রবণকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল আরব উপদ্বীপ! কী আশ্চর্য মুগ্ধকরভাবে মহামহিম রব হাজেরার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন যুগযুগান্তর ধরে! সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে হাজেরার যেই উদ্বেগাকুল ছোটাছুটির দৃশ্য, তার অনুকরণকে হাজীদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় বলা হয়েছে ইসলামপূর্ব মূর্খতার যুগে, আবার, ইসলামপরবর্তী সভ্য সময়েও।

একলা হলেই মারিয়া ভাবতে থাকেন হাজেরার কথা। হাজেরার মিশরী হওয়া, হযরত ইসমাঈল ও সমস্ত আরবের মা হওয়া—ইত্যাদি বিষয় তাঁর ভাবনার জগতকে আচ্ছাদিত করে রাখে। তাঁর মনে উদয় হয়—'হাজেরাও তো আমার মতো দাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন নবী হযরত ইবরাহীমের জন্য স্ত্রী সারার তরফ থেকে হাদিয়া; আর, আমি বাদশাহ মুকাওকিসের তরফ থেকে নবী মুহাম্মাদের জন্য তোহফা। (সাল্লাল্লাহু আলাইহিমা ওয়া সাল্লাম)। আবার, উভয়ের প্রতিই মনিবদের স্ত্রীগণ হয়েছেন রুষ্ট।' কিন্তু একটি বিষয়ে নিজেকে হাজেরার সঙ্গে দাঁড় করাতে পারেন না মারিয়া। হাজেরা তো ছিলেন হযরত ইবরাহীমের সন্তানের জননী; অপরদিকে, তিনি কি হযরত মুহাম্মাদের সন্তানের জননী হতে পারবেন? নাহ, এটা তাঁর জন্য উচ্চাভিলাষ হবে; বামন হয়ে চাঁদ ছোঁয়ার বাসনা অবাস্তব কল্পনা বৈ কী!

উপরন্তু খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকালের পর এযাবৎ দশজন নারীকে বিয়ে করেছেন হযরত মুহাম্মাদ; এঁদের মধ্যে কেউ তো নবযৌবনা, কেউ সুপরিণতা; এমনকি, অনেকের তো আগের সংসারের সন্তানও আছে; কিন্তু নবীগৃহে আসার পরে কেউই নতুন সন্তানের মুখ দেখেননি; নবীজিরও বয়স বেড়ে হয়েছে প্রায় ষাট; এতজন স্ত্রীর সঙ্গে বাস করেও এতগুলো বছর নিঃসন্তান তিনি; মনে হচ্ছে, আর কোনো সন্তানলাভের স্বপ্ন নেই তাঁর... [১]

এমতাবস্থায় মারিয়া কীভাবে নবীজির সন্তান ধারণ করে ইসমাঈলের মা হাজেরার সমকক্ষ হবেন? হায়, এসব অলীক কল্পনা কোত্থেকে আসে মাথায়! মরিচিকার মতো এসব অবাস্তব কল্পনা কেন মনের মধ্যে বাজায় বিষণ্ণ সুর...!

চারদিকে সুখের সুবাস

নবী-সান্নিধ্যের দ্বিতীয় বছরে কদম রাখলেন মারিয়া। এখন তাঁর রাত-দিনের ভাবনায় ক্ষণে ক্ষণেই উঁকি দেন হাজেরা, ইসমাঈল ও ইবরাহীম। হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হলো—গর্ভে বুঝি কেউ আছে! নিজেই আবার নিজেকে শাসালেন—এমনটা হতেই পারে না! এ-আমার দিবাস্বপ্ন! তিনি ভাবতে লাগলেন—সম্ভবত, সারাদিন মা হওয়ার চিন্তায় ডুবে থাকার ফলে এমন ভ্রম হচ্ছে। সর্বক্ষণ ইসমাঈল,

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০১/০৭।

হাজেরা—এঁদেরকে নিয়ে কল্পনা-জল্পনার পরিণামে অবচেতনে এখন নিজেকে গর্ভবতী বলে মনে হচ্ছে।

নিজের মনের এই দ্বিধা ও দোলাচল মাস কয়েক নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখলেন মারিয়া। তিনি নিজেই তো সন্দিহান—এটা কি আসলেই কিছু, না, মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনা? কিন্তু অল্প কদিন পরেই গর্ভের আলামত স্পষ্টভাবে ধরা দিল। তাঁর মনে হলো—এখন বিষয়টি কারও কাছে প্রকাশ করলে, তাঁকে কেউ পাগল, বা, মিথ্যুক ঠাওরাবে না। সেদিনই তিনি ছুটে গেলেন বোন সীরীনের কাছে। সীরীন তাঁকে নিশ্চিত করলেন, যে, তাঁর গর্ভে সত্যিই সন্তান আছে; এতে কোনো অস্পষ্টতা, বা, সন্দেহের অবকাশ নেই। সত্যি সত্যিই তিনি নিজের মধ্যে বয়ে চলেছেন এক জান্নাতী ভ্রূণের জীবন।

মারিয়ার তো আনন্দ যেন ধরে না আর। তিনি তো কল্পনাও করতে পারেননি, যে, আকাশের অধিপতি এত দ্রুত, এত চমৎকারভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন! একসময় যেই স্বপ্নকে মনে হয়েছে মরীচিকার মতো অসার, অনর্থক, তা আজ সৌন্দর্যে, সুবাসে জগত মোহিত করার দ্বারপ্রান্তে...

এক রঙিন স্বপ্নের ঘোরে হারিয়ে গেলেন মারিয়া। সুখের হাওয়ায় চড়ে তিনি উড়ে চললেন এক অচেনা অপূর্ব দেশে...

এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছে হলো মারিয়ার ঘরে যেতে। তিনি তাঁর ঘরে হাজির হলেন। দেখলেন—মারিয়া ডুবে আছেন কোনো গভীর ভাবনায়। রাসূলকে দেখেই তিনি সচকিত হলেন। এরপর, নিজের ভেতরে আটকে রাখা উচ্ছ্বাস উন্মুক্ত করে দিলেন তাঁর সামনে; যেন রাসূলকেও তিনি ভাসিয়ে দিলেন সুখ-সমুদ্রে। রাসূলের স্মরণ হতে লাগল—মারিয়ার অসুস্থতা, অস্থিরতা, খাবার খেতে কষ্ট হওয়া—ইত্যাদি। এইসব উপসর্গ তিনি পূর্বে খাদীজার বেলায়ও দেখেছেন। প্রতিটি গর্ভের শুরুর দিকে এমন অবস্থা হতো। মারিয়ার বেলায় তিনি হয়তো মনে করেছিলেন—এগুলো স্বাভাবিক অসুখ। দ্রুতই সেরে যাবে। এখন তাঁর বুঝে আসছে—আসলে সেগুলো কী ছিল...

শোকর ও কৃতজ্ঞতায় আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। চেহারা মুবারকে তখন খুশির আভা। পরপর তিন তিনটি মেয়ে—উন্মু কুলসুম, রুকাইয়া ও যাইনাব এবং দুটি ছেলে—আবদুল্লাহ ও কাসিমকে হারানোর পর যেই করুণার আধার

তাঁকে এই মহানিয়ামাতে সম্মানিত করতে চলেছেন, তাঁর প্রতি অজস্র শোকরের চিহ্ন হয়ে যেন চোখের কোণে কফোঁটা অশ্রু জমল রাসূলের।

কত মহান সেই মহাশক্তিধর সত্তা, যাঁর দয়ার চাদরে আচ্ছাদিত হয়েছেন রাসূল মুহাম্মাদ; যিনি ইতিপূর্বে এমনই রহম-চাদরে ঢেকে নিয়েছিলেন তাঁর আরও দুই বান্দা—ইবরাহীম ও যাকারিয়্যাকে। তিনি ইরশাদ করেছেন—

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ۝ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۝ فَرَاغَ اِلٰۤى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ۝ فَقَرَّبَهٗۤ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۝ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝ فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ۝ قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝

> *'আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তাঁরা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম; তখন সে বলল, সালাম; এরা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর সে পরিবারের কাছ গেল এবং একটি ঘিয়েভাজা মোটা গোবৎস নিয়ে হাজির হলো। সে গোবৎসটি তাদের সামনে রেখে বলল, তোমরা আহার করছ না কেন? অতঃপর তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হলো; তারা বলল, ভীত হবেন না। তারা তাকে একটি জ্ঞানীগুণী পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিল। অতঃপর তাঁর স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এল; এবং মুখ চাপড়িয়ে বলল, আমি তো বৃদ্ধা, বন্ধ্যা। তারা বলল, তোমার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন; নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।'*[১]

হযরত যাকারিয়্যা ও তাঁর সুসংবাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেছেন—

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝

[১] সূরা আয-যারিয়াত : ২৪-৩০।

قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ﴿٩﴾

> *'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, কেমন করে আমার পুত্র হবে; অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর, আমিও যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত? তিনি বললেন, এমনিতেই হবে; তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন, এটা আমার পক্ষে সহজ; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি; তখন (সৃষ্টির আগে) তুমি কিছুই ছিলে না।'*[১]

কিন্তু মারিয়া তো বন্ধ্যা নন; রাসূলও নন অতি বার্ধক্যে অক্ষম হয়ে যাওয়া কোনো বৃদ্ধ; ফলে, আনন্দ, উচ্ছ্বাসে ভরে যায় মারিয়ার মন। খবর যেন বেশি সময় ঘরোয়া হয়ে থাকতে পারল না। মদীনার প্রতিটি ঘরে যেন স্বয়ং বাতাসই পৌঁছে দিয়েছে মারিয়ার ঘরের উচ্ছ্বাসী সুবাস! স্বাভাবিকভাবেই নবীগৃহের সদস্যদেরও জানতে বাকি রয়নি এই কথা। যেহেতু তাঁরাও মানুষ ও নারীমনের অধিকারী, তাই, রাসূলের স্ত্রী হিসেবে কয়েক বছর তাঁর সান্নিধ্যে থেকেও তাঁর সন্তান ধারণ করতে না-পারায় মারিয়ার প্রতি একধরনের ঈর্ষাকাতরতা অনুভব করলেন তাঁরা। কী সৌভাগ্য মারিয়ার!

রাসূল ﷺ ভাবলেন মারিয়া এখন যে ঘরে আছেন, সেখানে তাঁর সেবাযত্নে ঘাটতি হতে পারে। তাই, তাঁকে মদীনার উপকণ্ঠে শহুরে ঝঞ্ঝাটমুক্ত, নিরিবিলি একটি বাড়িতে নিয়ে রাখলেন। সেখানে তাঁর সবরকমের আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা ও মা-শিশু উভয়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষার পুরোপুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। নিবিড় পরিচর্যার ওই বাড়িতে রাসূল নিজে রাত জেগে মারিয়ার সেবা করতেন। তাঁর অবর্তমানে মারিয়ার বোন সীরীন দেখাশোনা করতেন সবকিছু।

অষ্টম হিজরীর যিলহজ মাস। দিন গড়িয়ে গড়িয়ে বাচ্চাপ্রসবের সময় ঘনিয়ে এল। একরাতে জগত যেন আরেকটি খুশির ঝলকে উদ্ভাসিত হওয়ার প্রতীক্ষার শেষ প্রান্তে উপনীত হলো। আবু রাফে'র স্ত্রী সালমাকে ধাত্রী হিসেবে ডেকে আনলেন রাসূল। আর, তিনি চলে গেলেন ঘরের আরেক কোণে। নিমগ্ন হয়ে গেলেন সালাত ও দুআয়...

---

[১] সূরা মারইয়াম : ০৮-০৯।

কিছুক্ষণ পরেই ধাত্রী এসে তাঁকে খোশখবর শোনালেন।[১] তিনি তাঁকে বেশ কিছু তোহফা দিয়ে সম্মান করলেন। এরপর ধীরে ধীরে গেলেন সদ্য মা-হওয়া মারিয়ার কাছে। যেই শিশুটি জন্মলাভ করেই মায়ের কপাল থেকে চিরতরে মুছে দিয়েছে দাসত্বের দাগ,[২] সেই শিশুটির জন্য তাঁকে তিনি মুবারকবাদ জানালেন। এরপর আবেগাপ্লুত, উৎফুল্ল মনে নবাগত শিশুটিকে কোলে নিলেন বহু বছর পরে আবারও পিতৃত্বের সুখ-পাওয়া রাসূল মুহাম্মাদ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রবের শোকর, আর, মুহাব্বাতে যেন হৃদয় নতুন করে প্লাবিত হলো তাঁর। তিনি শিশুর নাম রাখলেন তাঁর ও বহু নবীর দাদা ইবরাহীমের নামে। আলাইহিমুস সালাম।

শিশুর চুলের সমপরিমাণ ওজনে মদীনার দুস্থ, অসহায়দের মধ্যে রৌপ্যমুদ্রা সাদাকা করেন রাসূল। আনসারী মহিলারা এই শিশুকে দুগ্ধদানের দায়িত্ব নিতে একরকম কাড়াকাড়িতে লেগে যান। শেষে রাসূলের ইচ্ছা বুঝতে পারেন তাঁরা। ফলে, নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পরিহার করে তাঁরা তাঁর ফয়সালার প্রতি মনোনিবেশ করেন। রাসূল ﷺ মারিয়ার কাছে সাতটি বকরি দেন। বলেন, বুকের দুধ না-থাকলে যেন বাচ্চাকে এই বকরিগুলোর দুধ পান করানো হয়।[৩]

শিশুর প্রতিপালনে মনোযোগী হন রাসূল। ধীরে ধীরে তাঁর যত্ন-পরিচর্যায় বড় হতে থাকে ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ। ওকে দেখলে, কোলে নিলেই তাঁর কেমন মায়া লাগে। আনন্দ, আর, ভালোবাসায় ভরে ওঠে মন। হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগে—সারা দুনিয়াকে যদি এই সুখের অংশীদার বানাতে পারতেন!

একদিন তিনি ওকে কোলে নিয়ে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সামনে গেলেন। হাসিমুখে বললেন, 'দেখো, কী মায়াবী রূপ দিয়েছেন আল্লাহ ওকে!' মারিয়া ﷺ দাসী হয়েও নবীজির সন্তান জন্ম দিয়েছেন, এই ভেবে অন্য উম্মুল মুমিনীনদের মতো আয়িশাও বেশ ঈর্ষাকাতর ছিলেন। তাঁর মনের কোণে জমে থাকা সেই

[১] আরেকটি বর্ণনায় এসেছে—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন সালমার স্বামী আবু রাফে—*আস-সিমতুস সামীন* : ১৪০; *আল-ইসতীআব* : ০১/৫৪।

[২] *আস-সিমতুস সামীন* : ১৪২; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৯১৩।

[৩] *আল-ইসাবাহ*, প্রথম খণ্ড; *আল-ইসতীআব* : ০১/৫৫। *ওয়াফাউল ওয়াফা*'র (০১/৩১৬) একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ তাঁর ছেলেটির সপ্তম দিনে চুল মুণ্ডিয়ে দিয়েছেন। চুলের ওজন-পরিমাণে রৌপ্য সাদাকা করেছেন এবং দুটি ভেড়া জবাই করেছেন।

ঈর্ষার প্রকাশ ঘটে গেল যেন তাঁর কথায়। নবীজিকে তিনি বললেন, 'আমি তো আপনার সঙ্গে ওর কোনো মিলই দেখতে পাচ্ছি না!'

উম্মুল মুমিনীনদের নারীসুলভ এ ধরনের কিছু আচরণ দেখে মারিয়ার মনে হতো—'আমি সম্ভবত যথাস্থানে পৌঁছে গেছি। হাজেরা যেমন হযরত ইবরাহীমের সন্তান ধারণ করে ঈর্ষার শিকার হয়েছিলেন, আমিও তেমনই হযরত মুহাম্মাদের সন্তান জন্ম দিয়ে সেই অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছি। ইনশাআল্লাহ, হাজেরার মতো আমার জন্যও এই ঈর্ষার পরিণাম ভালোই হবে।' মারিয়ার কাছে তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুখ ও আনন্দের বিষয়টি তখন এ-ই মনে হতো, যে, দীর্ঘ দিন ধরে নতুন কোনো সন্তানপ্রাপ্তির প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাসূলকে তিনি একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিতে পেরেছেন। ওকে দেখে এখন তাঁর চোখ জুড়ায়। প্রথম স্ত্রী খাদীজার গর্ভের সন্তানগুলোকে হারিয়ে যেই মনোবেদনায় ভুগছিলেন রাসূল, নবাগত শিশুটিকে কোলে নিয়ে তিনি সেই বেদনার কিছুটা উপশম করতে পারবেন।

মারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার এই মহাসৌভাগ্যের কারণে তাঁর প্রতি উম্মুল মুমিনীনদের যে বিশেষ ঈর্ষা ছিল, আম্মাজান আয়িশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেই বয়ান করেছেন সে-কথা। *আল-ইসাবাহ* গ্রন্থে আমরাতা বিনতু আবদির রাহমানের সনদে তাঁর উক্তি বর্ণিত হয়েছে এভাবে—'কোনো নারীকেই আমি মারিয়ার চেয়ে বেশি ঈর্ষা করিনি। কারণ, সে ছিল ভারি সুন্দরী। কোঁকড়া চুলে তাকে ভীষণ সুন্দর লাগত। রাসূলও তাকে ভালোবাসতেন। সে মদীনায় আসার পরে রাসূল তাঁকে হারিসা ইবনু নুমানের ঘরে থাকতে দেন। ফলে, সে আমাদের প্রতিবেশী হয়ে যায়। রাসূল তখন তার কাছে বেশি বেশি যেতেন। এরপর তার পেট বড় হতে দেখে আমার আরও পেরেশানি হলো। পরে যা হলো, তা ছিল আমাদের জন্য বড় কষ্টের।' অন্য বর্ণনায় আরেকটু আছে, যে— 'এরপর আল্লাহ তাকে একটি সন্তান দান করেন; আর, আমরা তা থেকে বঞ্চিত থাকি।'

উম্মুল মুমিনীনগণের নারীসুলভ ঈর্ষা কখনোই মাত্রা ছাড়িয়ে যেত না, ফলে, তা সহ্য করে নিতে মারিয়ার কোনো কষ্ট হতো না। কিন্তু কিছু দুশ্চরিত্র লোক এক ভয়ানক গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল মারিয়ার নামে। পুরো মদীনায় ছড়িয়ে পড়েছিল সেই অপবাদের কালো ধোঁয়া। ঘটনা হলো—মিশর থেকে বাদশাহ

মুকাওকিসের হাদিয়ারূপে মারিয়াদের সঙ্গে একটি দাসও ছিল; যার নাম ছিল মাবূর। সে মারিয়ার সেবাকাজে নিয়োজিত ছিল। তাঁর প্রয়োজনীয় কাঠ, পানি সে এনে দিত। এতেই কিছু কুরুচির মানুষ তাঁদের উভয়কে নিয়ে গল্প ফাঁদে—ওরা একে অপরের সঙ্গে ব্যাভিচার করেছে! (নাউযুবিল্লাহ!)

এমন মহাবিপদে মারিয়াকে নিঃসঙ্গ, একলা করে দেননি আল্লাহ; বরং তাঁর স্বচ্ছ চরিত্রের পক্ষে এক অকাট্য প্রমাণ তিনি তাঁকে দান করেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণনায় এসেছে—'রাসূলের উম্মুল ওয়ালাদকে (মারিয়া) জড়িয়ে এক লোকের ওপর অন্যায় কাজের অপবাদ দেওয়া হয়। রাসূল ﷺ তখন আলীকে বললেন, "যাও, ওর গর্দান উড়িয়ে দিয়ে আসো।" আলী ওকে খুঁজতে বেরিয়ে এক কূপের কাছে পেয়ে গেলেন। গোসল করছিল সে। আলী তাকে বললেন, 'কূপ থেকে উঠে আসো!'। এরপর তিনি তাকে হাত ধরে সেখান থেকে তুলে আনলেন। দেখা গেল—তার গায়ে কাপড় নেই; আর, বিশেষ অঙ্গটি কর্তিত। সঙ্গে সঙ্গে আলী তাকে ছেড়ে দিয়ে রাসূলের কাছে চলে এলেন। বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে তো অঙ্গহীন...।"'[১]

অস্তমিত চাঁদ

সোয়া, বা, দেড় বছরের বেশি স্থায়ী হলো না মারিয়ার সুখ। এরপরেই হৃদয়-বিদারক সন্তানবিয়োগের বেদনায় শোকের পাথর হয়ে গেলেন তিনি।

তখনও বয়স দুই বছরও পূর্ণ হয়নি শিশু ইবরাহীমের। একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। মারিয়া পেরেশান হয়ে বোন সীরীনকে ডেকে আনলেন। তাঁর শিয়রে বুক-ধুকপুক নিয়ে উভয়ে তাঁরা সারারাত কাটিয়ে দিলেন। চোখের সামনেই নবীজির শিশুপুত্র ধীরে ধীরে নীরব হয়ে যেতে লাগল।

রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এলেন আবদুর রহমান ইবনু আউফের হাতে ভর দিয়ে। নিজের অসুস্থতার ফলে ঠিকমতো হাঁটতে পারছিলেন না তিনি। শিশুপুত্রকে তাঁর মায়ের কাছ থেকে কোলে নিলেন। চোখ তাঁর টলমল করছিল জলে। নিষ্প্রভ হয়ে আসা চাঁদমুখটির দিকে তাকিয়ে হৃদয় যেন আরও দুঃখের আঁধারে ছেয়ে গেল।

---

[১] সাবিত আল-বুনানী এটি বর্ণনা করেছেন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে। *সহীহ মুসলিমে* (অধ্যায় 'বারাআতু হারামিন নাবী মিনার-রীবাহ') হাদীসটি এসেছে যুহাইর ইবনুল হারবের সূত্রে। এ ছাড়াও যুহাইর ইবনুল হারবের সূত্রে *আল-ইসতীআবে*ও আছে।

তিনি ওকে আবার রেখে দিলেন। বেদনার্ত, কিন্তু রবের দুয়ারে সমর্পিত স্বরে তিনি বললেন, 'ইবরাহীম, তোমার জন্য আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছু করার ক্ষমতা তো আমাদের নেই!' অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তাঁর। একমাত্র শিশুপুত্রটি তাঁর চোখের সামনে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো পার করছে; পাশে আহাজারি করছে সন্তান হারাতে-বসা মা, আর, বেদনাদগ্ধ খালা।

নিচে রাখা ইবরাহীমের লাশকে একটু ঝুঁকে চুমু খেলেন রাসূল। তখনও তাঁর দুচোখ থেকে অশ্রুধারা বইছে। এরপর, নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'ইবরাহীম, যদি মৃত্যুর বিষয়টি বাস্তব ও সত্য ওয়াদা না-হতো, যদি আমাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটিও সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করা ব্যক্তিটির সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফায়সালা না-থাকত, তাহলে, তোমার মৃত্যুতে আমরা আরও অনেক অনেক বেশি ব্যথিত, চিন্তিত হতাম। ইবরাহীম, আমরা তবু তোমাকে নিয়ে ব্যথিত। আমাদের চোখ কাঁদছে, হৃদয় বেদনার্ত হয়ে আছে, কিন্তু রবের অপছন্দের কোনো কিছুই আমরা বলতে পারব না।' [১]

মারিয়ার দিকে মায়া ও সহানুভূতির চোখে তাকালেন তিনি। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ইবরাহীম তো আমার পুত্র। দুধপানকালেই সে ইন্তিকাল করেছে। তার দুজন ধাই মা আছে, জান্নাতে তারা তার দুধপান পূর্ণ করবে।' [২]

রাসূলের চাচাতো ভাই ফযল ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা গিয়ে শিশু ইবরাহীমকে গোসল করালেন। পাশে বসে কলিজার টুকরোকে অশ্রুভরা আপ্লুত চোখে দেখতে লাগলেন রাসূল। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আরেকটি বর্ণনায় আছে—বনু মাযিনের উম্মু বারদাহ খাওলা বিনতুল মুনযির ইবনি যাইদ ছিলেন ইবরাহীমের ধাই মা। তাঁর কাছে থাকাবস্থায়ই সে ইন্তিকাল করে। উম্মু বারদাহ তাকে গোসল করান। এরপর সেখান থেকে তাকে ছোট একটি খাটে শুইয়ে নিয়ে আসা হয়। জানাযার সালাত পড়ান তাঁর বাবা—পুত্রশোকে স্তব্ধ মুহাম্মাদ ﷺ। জানাযার পর তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে নিয়ে যাওয়া হয়। বাবার হাতেই শায়িত হয় অনেক স্বপ্ন, আশা ও ভালোবাসার প্রতীক

---

[১] *আল-ইসতীআব* : ০১/৫৬; *আল-ইসাবাহ* : 'ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ' অধ্যায়; *আস-সিমতুস সামীন* : ১৪৩।

[২] সহীহ মুসলিম : 'কিতাবুল ফাযাইল'।

হয়ে জন্মলাভ করা ইবরাহীম। বাবাই তাঁর কবরে মাটি ঢালেন। এরপর মাটির ওপর দিয়ে পানি ছিটিয়ে দেন।[১] যেন পানি নয়—হৃদয়ের অশ্রুধারা জমা করে বিদায়ী পুত্রকে শেষ উপহার দিচ্ছিলেন তামাম জগতের সব শিশুর আধ্যাত্মিক পিতা রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ।

শোকার্ত মানুষ গোরস্তান থেকে ফিরে আসতেই দেখল—আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সূর্যগ্রহণ শুরু হয়েছে। কেউ কেউ বলল, 'এই গ্রহণ নিশ্চয় ইবরাহীমের মৃত্যুশোকে হয়েছে।' কথাটা রাসূলের কানে গেল। তিনি বললেন, 'শোনো, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর দুটি নিদর্শন। এগুলোর গ্রহণ লাগাটা কারও জীবন-মরণের কারণে হয় না।'[২]

পুত্রশোকের বিরাট পাথর বুকে চেপে রবের ফায়সালার প্রতি নিজেকে সমর্পণ করলেন রাসূল। ওদিকে, মারিয়াও ব্যথার পাহাড় লুকিয়ে রাখার অসম্ভব যুদ্ধে নিজেকে মগ্ন রাখলেন। যেন তাঁর কারণে রাসূলের বেদনা আরও তাজা না-হয়ে যায়! কিন্তু যখন বেদনা-যন্ত্রণার তীরগুলো তীব্রভাবে আঘাত করতে শুরু করল, উপায় না-পেয়ে তিনি চলে গেলেন ছেলের কবরের কাছে। সেখানেই তিনি খুঁজতে লাগলেন মনের এক চিলতে শান্তি। পুত্রের কাছে বসে কেঁদে কেঁদে সত্যিই হয়তো অপার্থিব কোনো শান্তি ও সান্ত্বনার ভাগী হতে চাইছিলেন মারিয়া।

পুত্র ইবরাহীমের বিয়োগের পর রাসূলের জীবনতরীও যেন আর চলল না বেশি দিন। পুত্র তো চলে গেল হিজরী দশম বছরে, পরের বছরের রবীউল আউয়ালের শুরুতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন; এবং রবের দেওয়া সময় পূর্ণ করে অল্প কদিনের মধ্যেই রওনা হয়ে গেলেন তাঁর সান্নিধ্যের উদ্দেশ্যে।

পুত্র ইবরাহীম ও প্রিয়তম রাসূল মুহাম্মাদকে হারিয়ে মারিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যান। মানুষের কোলাহল থেকে নিজেকে তিনি একেবারেই দূরে সরিয়ে নেন। বোন সীরীন ব্যতীত আর কারো সঙ্গেই তেমন একটা দেখা-সাক্ষাত করতেন না; এবং প্রিয়তমের কবর যিয়ারত, বা, কলিজার টুকরো ইবরাহীমের ছায়া-সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত আর কোনো কিছুর জন্যই ঘর থেকে বের হতে চাইতেন না তিনি।

---

[১] *উয়ূনুল আসার* : ০২/২৯১; *আল-ইসতীআব* : ০১/৫৬।

[২] *বুখারী* : ১০৪৩; *মুসলিম* : ১৯৮৭।

অবশেষে দুঃখী এই নারীর দুঃখমোছনের উত্তম ব্যবস্থা করলেন রব। নারীটির দুই প্রিয়তমের মতো তাঁকেও নিজের কাছে ডেকে নিলেন। হিজরী ১৬ সনের একদিন কাউকে কিচ্ছু না বলে চুপচাপ স্বভাবের মতো নীরবেই মরণের ডাকে সাড়া দেন মারিয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানধারিণী আরেকজন নারীর বিয়োগে মুসলিমেরা বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বেদনার্ত মনে তারা আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাবের ইমামতিতে জানাযায় অংশ নেয়। এরপর, চলে যাওয়া অন্য উম্মুল মুমিনীনদের সঙ্গে উম্মু ইবরাহীম মারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকেও তাঁরা শেষ শয়নে রেখে আসেন জান্নাতুল বাকীতে;[১] যেখানে শুয়ে আছে তাঁর কলিজার টুকরো শিশু ইবরাহীমও।

মৃত্যু তো সব নারী-পুরুষকেই ছুঁবে, কিন্তু কজন নারী আছেন এমন খোশনসীব, রাসূলের জীবনে যে শুধু অংশই নেয়নি, বরং তাঁর সন্তানও গর্ভে ধারণের মহাসৌভাগ্য লাভ করেছে? মারিয়ার তো আর কিচ্ছুর প্রয়োজন নেই! রাসূলের মায়া, ভালোবাসা যাঁর অস্তিত্বের প্রতিটি কণায় মিশে ছিল, সেই ইবরাহীমের মা ছিলেন তিনি। আল্লাহ তাঁকে অনেক উম্মুল মুমিনীনের মধ্য থেকে এই রত্নের জন্য নির্বাচন করেছিলেন! রাদিয়াল্লাহু আনহা।

রাসূলের ওসীয়ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে তাঁর ভালোবাসা ও সান্নিধ্যপ্রাপ্তই শুধু নয়, বরং মারিয়া ছিলেন মিশর ও আরব উপদ্বীপের সুপ্রাচীন সম্পর্কের ধারক; যেই সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল আরেক মিশরী নারী হাজেরার মাধ্যমে। তাই, রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময়ে সাহাবীদেরকে মারিয়ার সম্প্রদায় ও দেশীয় লোকদের বিষয়ে ওসীয়ত করতেন। বলতেন—'কালো কোঁকড়া চুল বিশিষ্ট, কালো কালো ঘরের বাসিন্দা যিম্মীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কোরো। কারণ, বংশীয় ও বৈবাহিক সূত্রে তোমাদের ওপর তাঁদের হক রয়েছে।'

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর গ্রন্থে 'মিশরবাসীর সম্পর্কে রাসূলের ওসীয়ত' অধ্যায়ে আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র হাদীস এনেছেন। তিনি বলেছেন, 'শিগগির তোমরা মিশর জয় করবে। তখন তোমরা সেখানকার বাসিন্দাদের

[১] আল-ইসতীআব ও আল-ইসাবাহ : 'মারিয়া' অধ্যায়।

সঙ্গে সদাচার বজায় রাখবে। কারণ, তোমাদের ওপর থাকবে তাঁদের নিরাপত্তা ও বংশীয় (বা, বলেছেন, তাঁদের নিরাপত্তা ও বৈবাহিক) সম্পর্ক ঠিক রাখার দায়িত্ব।'[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ওসীয়ত পরবর্তীদের কাছে বড় গুরুত্ব পেয়েছিল। বলা হয়—এর ফলেই হাসান ইবনু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যখন মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক সন্ধিচুক্তির আলাপ করেন, তখন সেখানে তিনি দাবি করেন, যে, মিশরের হিফন গ্রামের বার্ষিক ট্যাক্স মওকুফ করে দিতে হবে; কারণ, সেখানেই তো রাসূলপুত্র ইবরাহীমের মাতুলালয়।[২]

এমনই আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে, যে, মিশর জয়ের পর উবাদা ইবনুস সামিত ﷺ এসে হযরত মারিয়ার গ্রামটি খুঁজে বের করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

মিশর থেকে এসে আরব উপদ্বীপে মারিয়া কদম রেখেছিলেন মূল্যবান এক উপহার হিসেবে। তিনি ভেবেছিলেন—এক সম্ভ্রান্ত ঘরের সুখী দাসী হওয়ার চেয়ে বড় কিছু আশা করাই যায় না। কিন্তু তাঁর জন্য রবের লেখা তাকদীরে ছিল ভিন্ন কিছু। একের পর এক সন্তান হারানো রাসূল মুহাম্মাদের জন্য তাঁকে সত্যিই মহাউপহাররূপে আবির্ভূত করেছিলেন আকাশের মালিক। প্রিয়তম মুহাম্মাদের জীবনসন্ধ্যায় তাঁর পবিত্র চেহারায় আরও কটা দিন এক অলৌকিক চাঁদের আভা যেন দেখতে চেয়েছিলেন রব। আর, সেই আভা ছড়িয়ে দিতে বেছে নিয়েছিলেন মারিয়াকে। মিশরী বাদশার তরফ থেকে আসা হাদিয়াকে রব যেন আরও সহস্রগুণ সৌন্দর্যশোভা বাড়িয়ে পেশ করেছিলেন হাবীবের সামনে। ফলে, হাবীবের মুখে হাসি ফুটেছে, তাঁর হৃদয় শোকরে আপ্লুত হয়েছে, চোখ থেকে নেমেছে সুখের স্বচ্ছ ধারা।

---

[১] *সহীহ মুসলিম* 'কিতাবুল ফাযাইল'; *আল-ইসতীআব* : ০১/৫৯।

[২] *আল-বুলদান*—ইয়াকুত আল-হামাভী, 'হিফন' অধ্যায় : ০৩/৩০২।

নবীগৃহে প্রস্ফুটিত সর্বশেষ গোলাপ

মাইমূনা বিনতুল হারিস

‘মাইমুনা তো চলে গেলেন। আল্লাহর শপথ! আমাদের মধ্যে তিনি তাকওয়া ও আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর রাখায় সবচেয়ে বেশি এগিয়ে ছিলেন।’

—আয়িশা বিনতু আবী বকর ﵂।

[আল-ইসাবাহ]

পুষে রাখা স্বপ্ন

খাইবার বিজয় ও হাবশা থেকে মুহাজিরদের ফিরে আসার পর অধিকাংশ মুসলিমের মনে কেবল একটি কথাই মিটিমিটি তারার মতো জ্বলতে লাগল—কবে যাব মক্কায়? কবে দেখব ছেড়ে আসা প্রিয় ভূমি—শত-সহস্র স্বপ্ন, আশা, স্মৃতিকে যেখানকার বালুকণায় মিশিয়ে দিয়ে চলে আসতে হয়েছে দূর মদীনায়? কিবা, এক বছর আগে ষষ্ঠ হিজরী সনে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তিতে যেই কথা বলা হয়েছিল, যে, ‘পরবর্তী বছর মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীগণ উমরার জন্য মক্কায় আসবেন; তিন দিন অবস্থান করবেন; তাঁদের সঙ্গে থাকা তরবারিগুলো খাপবদ্ধ থাকতে হবে; এবং এ ছাড়া আর কিচ্ছু থাকতে পারবে না’—এর বাস্তবায়ন কবে হবে? কত কত দিন-রাত ধরে হৃদয়-গহনে মক্কাসফরের স্বপ্ন পুষছি! কবে সেই স্বপ্নগোলাপ বিকশিত হবে পূর্ণরূপে?

মক্কার কথা মনে পড়তেই মুহাজিরদের হৃদয় যেন উড়ে চলে যেত কাবাপ্রাঙ্গণে। রবের ঘরের চারপাশে প্রেমের তাওয়াফে মগ্ন হয়ে যেত মন। ভাবনার জগত থেকে

চেতনে এলে তাঁদের নয়নগুলো অশ্রুপূর্ণ হয়ে যেত। বাপ-দাদার স্মৃতিবিজড়িত ভূমির ধূসর ছবি করুণ হয়ে ভেসে উঠত মনের আয়নায়।

দেশ ছেড়ে এসেছেন তাঁরা কয়েক বছর হয়ে গেছে। যেই ঘরকে মানুষের আশ্রয় ও নিরাপত্তার কেন্দ্র বলা হয়েছে, সেই ঘর ও তাঁদের মাঝে যেন পড়ে গেছে দীর্ঘ বিচ্ছেদের আস্তরণ। ষষ্ঠ হিজরী সনে যখন আবেগ-উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়ে তাঁরা মক্কার দোরগোড়ায় গিয়ে পৌঁছুলেন, তখন বিকৃত মস্তিষ্কের মুশরিকেরা তাঁদের স্বপ্নের পথে বাধার দেয়াল হয়ে দাঁড়াল; এবং পরবর্তী বছর আসতে পারার কথা দিয়ে তাঁদেরকে ফিরিয়ে দিল।

সময় যেন যাচ্ছিল না। দিন-রাতের প্রহরগুলোর গতি যেন অতি মন্থর হয়ে গিয়েছিল। প্রতীক্ষা যেন সত্যিই মৃত্যুর চেয়েও কষ্টেররূপে দেখা দিয়েছিল তাঁদের জন্য। অবশেষে বছর পেরিয়ে নতুন বছর শুরু হলো। রাসূলের তরফ থেকে ঘোষণা এল মক্কাসফরের প্রস্তুতি নেওয়ার।

সফর শুরু হলো। রাসূল ﷺ তাঁর কসওয়া উটনীটিতে আরোহণ করলেন। তাঁর পেছনে তখন মুহাজির ও আনসারদের এক হাজার আরোহী। ইসলামের আঁতুড়ঘর ও সর্বপ্রাচীন ভূমির উদ্দেশ্যে রওয়ানার আনন্দে তাঁরা তাকবীর দিতে লাগলেন।[১] তাঁদের সবার সামনে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু রওয়াহা। কসওয়ার লাগাম ধরে হাঁটছিলেন তিনি। হাঁটছিলেন, আর, আবৃত্তি করছিলেন—

'কাফির-সন্তানেরা, তাঁর পথ ছেড়ে দাও

সরো, সর্বকল্যাণ তো রবের রাসূলের সঙ্গেই।

রব, আমি তাঁর প্রতিটি শব্দ-বাক্যের বিশ্বাসী

সেই বিশ্বাস তোমার দুয়ারে কবুলের প্রত্যাশা রাখি।'

এভাবেই একসময় তাঁরা মক্কায় প্রবেশ করলেন। তাঁদের কারও মাথার চুল মুণ্ডিত, কারও আবার ছাঁটা, নির্ভয়ে মুশরিকমুক্ত মক্কার মাটিতে তাঁরা পা রাখলেন। সেদিন সব মুশরিক মক্কার নির্দিষ্ট সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল।

এভাবেই আল্লাহর দেওয়া সেই শাশ্বত ওয়াদা পূর্ণ হলো। যা বিবৃত করে তিনি

[১] *সীরাতু ইবনি ইসহাক* : ০৪/১৩; *তাবাকাতু ইবনি সাদ* : ০২/৮৮।

ইরশাদ করেছিলেন—

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ۗ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ۝

> *'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে—নিরাপদে, মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়; তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন, যা তোমরা জানো না। এ ছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়।'[১]*

প্রেমের কাবার চারপাশে তাঁরা তাওয়াফ শুরু করলেন। একস্বরে বলতে লাগলেন—'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক! লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক!—ও মালিক, ভিখারি বান্দা তোমার দুয়ারে হাজির! হাজির—তোমার তো কোনো অংশীদার নেই—বান্দা তোমার হাজির...।'

মক্কার প্রতিটি ধূলিকণাও যেন তাঁদের সঙ্গে আবদিয়্যাতের এই মহাঘোষণা দিতে লাগল। সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হতে লাগল লাব্বাইকের দৃপ্ত স্বর। শহরের বাইরে তাঁবুতে বসে থাকা মুশরিকদের পায়ের নিচের মাটিতেও কম্পন শুরু হলো। মুসলিমদের তাকবীর-ধ্বনিতে তাদের মনে হতে লাগল—সদর্পে দাঁড়িয়ে থাকা মক্কার সুউচ্চ বিরাটাকার পাহাড়গুলোও হয়তো তুলোর মতো উড়তে শুরু করবে!

মসজিদে হারামের প্রাঙ্গণ থেকে ভেসে আসতে লাগল দুআর শব্দ—'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তাঁর বান্দা মুহাম্মাদকে সাহায্য করেছেন। তাঁর সেনাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং একাই শত্রুজোটকে পরাজিত করেছেন।'

সেদিন মক্কার প্রতিটি প্রাণী যেন বুঝতে পেরে গেল, যে, মুসলিমদের মহাবিজয় অতি নিকটে। মুসলিমদের ওইসব তাকবীর, তাহলীল ও দুআ যেন মক্কাবাসীর

---

[১] সূরা ফাতহ : ২৭।

মনে জাদুর মতো ভয় ছড়িয়ে দিল।

এর মধ্যেই হঠাৎ মক্কার এক অভিজাত মুসলিম নারীর খবর শোনা গেল—রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি সমর্পিত হৃদয় নিয়ে তাঁর জন্য যিনি ব্যাকুল-বেকারার হয়ে আছেন!

এই নারীর নাম বাররাহ বিনতুল হারিস আল-হিলালিয়্যাহ। তাঁকে আরো ভালোভাবে চেনার উপায় হলো—তাঁর সহোদরা বোন, তাঁর বোন ছিলেন আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিবের স্ত্রী উম্মুল ফযল লুবাবা বিনতুল হারিস (বড় লুবাবা); যিনি ছিলেন হযরত খাদীজার পরে নারীদের মধ্যে প্রথম ঈমান গ্রহণকারিণী। আবু লাহাব যখন আব্বাসের ঘরে তাঁর গোলাম আবু রাফেকে ঈমান গ্রহণের কারণে মারতে এসেছিল, তখন এই উম্মুল ফযলই আবু লাহাবের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে এই বলে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, যে, 'ওর মনিব ঘরে নাই বলে ওকে দুর্বল পেয়ে গেছ, না?' এবং সেখান থেকে লাঞ্ছিত হয়ে ফেরার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আবু লাহাব মরণরোগে আক্রান্ত হয়।[১]

তো, এই বাররাহ বিনতুল হারিসের বৈপিত্রেয় বোনদের দিকে তাকালে দেখা যাবে—আছেন উম্মুল মুমিনীন যাইনাব বিনতু খুযাইমা আল-হিলালিয়্যাহর মতো মহীয়সী নারী; আসমা বিনতু উমাইসের মতো খোশনসীব মহিলা, যিনি প্রথমে জাফর ইবনু আবী তালিবের স্ত্রী ছিলেন, সেই ঘরে তাঁর সন্তানও হয়েছে, এরপর তিনি আবু বকর সিদ্দীকের ঘর করেছেন, সেখানে তাঁর গর্ভে জন্ম নিয়েছে মুহাম্মাদ ইবনু আবী বকর, এরপর আলী ইবনু আবী তালিবের ঘরও তিনি করেছেন, সেই ঘরে তিনি মা হয়েছেন ইয়াহইয়া ইবনু আলীর। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

এই তালিকায় আরও আছেন সালমা বিনতু উমাইসের মতো ত্যাগী নারী। যিনি ছিলেন আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিবের স্ত্রী এবং তাঁর কন্যা উমামার মা; যেই উমামার প্রতি রাসূলের ভালোবাসা ছিল অন্যরকম।

তো, এই বাররাহ বিনতুল হারিস, উম্মুল ফযল বিনতুল হারিস, যাইনাব বিনতু খুযাইমা, আসমা বিনতু উমাইস ও সালমা বিনতু উমাইস—এঁদের সবার মা

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০২/৩০১।

ছিলেন হিন্দ বিনতু আউফ ইবনি যুহাইর ইবনিল হারিস। যেই নারীর প্রশংসায় বলা হতো—জগতে বৈবাহিক সম্পর্কের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারিণী নারী হচ্ছেন হিন্দ বিনতু আউফ। বৈবাহিক দিক থেকে তাঁর বিশিষ্ট আত্মীয়দের কয়েকজন হচ্ছেন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর আস-সিদ্দীক, হামযা ও আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব, জাফর ও আলী ইবনু আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

এ ছাড়াও বৈবাহিক সূত্রে হিন্দের আরও কজন বিশিষ্ট আত্মীয় হলেন—ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা আল-মাখযূমী, যিনি ছিলেন খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মা (ছোট) লুবাবা বিনতুল হারিসের স্বামী; উবাই ইবনু খালাফ আল-জুমাহী, যিনি ছিলেন হিন্দের কন্যা ও আবান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মা আসমা বিনতুল হারিসের স্বামী; যিয়াদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু মালিক আল-হিলালী, যিনি ছিলেন আযযা বিনতুল হারিসের স্বামী।

হারিসের এই তিন কন্যা লুবাবা, আসমা, আযযা—এঁরা সবাই ছিলেন বাররাহর আপন বোন।[১]

সেসময়ে বাররাহ ছিলেন ২৬ বছর বয়সী বিধবা। তাঁর স্বামী আবু রহম ইবনু আবদিল উযযা আল-আমিরী মারা গিয়েছিল।[২] তো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিজের মনের সেই ব্যাকুলতার কথা বোন উম্মুল ফযলের কাছে ব্যক্ত করেন বাররাহ। বোন তাঁর স্বামী আব্বাসের সঙ্গে আলাপ করেন এবং তাঁকে এই বিষয়টির সমাধানের জন্য দায়িত্ব দেন।

আকস্মিক এমন সংবাদ নিয়ে রাসূলের নিকটে যেতে একটু দ্বিধা হয়নি আব্বাসের; বরং তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ভাতিজা রাসূলের কাছে ছুটে যান। তাঁর কাছে পুরো অবস্থা বর্ণনা করে বাররাহর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেন এমন অমূল্য প্রেমগোলাপ।

---

[১] *তাবাকাতু ইবনি সাদ, আল-ইসতীআব* ও *আল-ইসাবাহ* : 'মাইমুনা বিনতুল হারিস' অধ্যায়। *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/১৯৬; *আল-মুহাব্বার* : ১০৭; *জামহারাতুল আনসার* : ২৬২; *উয়ূনুল আসার* : ০২/৩০৮; *আস-সিমতুস সামীন* : ১১৩।

[২] এটি *আল-ইসতীআব* ও *সীরাতু ইবনি ইসহাকের* (০৪/১৯৬) বর্ণনা; তবে, বাররাহর এই স্বামীর নাম নিয়ে মতপার্থক্য আছে; দেখুন—*তারীখু তাবারী* : ০৩/১৭৮; *আল-ইসতীআব* ও *আল-ইসাবাহ*, আর, *আস-সিমতুস সামীন* : ১১৫।

রাসূল তাঁকে চারশ' দিরহাম মহর দেন; এবং চাচাতো ভাই জাফরকে (যিনি আবার ছিলেন বাররাহর বোন আসমার স্বামী) পাঠিয়ে বিয়ের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করেন। শেষে, বাররাহর অভিভাবক হিসেবে তাঁকে রাসূলের সঙ্গে বিয়ে পড়িয়ে দেন রাসূলের চাচা আব্বাস ﷺ।

আরেক বর্ণনায় এসেছে—বাররাহই সেই নারী, যিনি নিজেকে রাসূলের জন্য তোহফারূপে পেশ করেছিলেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা আয়াত নাযিল করেন—

وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

> *'কোনো মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল; এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য—অন্য মুমিনদের জন্য নয়।'*[১]

সুহাইলী বলেন, 'বাররাহর কাছে যখন বিয়ের খোশখবর নিয়ে প্রস্তাবকারী আগমন করেন, তখন তিনি একটি উটে আরোহী ছিলেন; খবর শোনামাত্রই তিনি উট থেকে থেকে নেমে পড়েন। বলেন, "এই উট ও এর সঙ্গে যা আছে, সবই রাসূলের তরে তোহফা!"'

হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুসারে মক্কায় মুসলিমদের অবস্থানের সময় (তিন দিন) প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল।[২] কিন্তু রাসূল ﷺ চাইছিলেন—মক্কার লোকেরা যদি তাঁকে বিয়েটা সারা পর্যন্ত একটু সুযোগ দিত, তাহলে সেই সময়টুকুর মধ্যেই তিনি তাদের কাছ থেকে আরও সময় আদায় করে নিতে পারতেন; যারা এখনও হিংসা ও বিদ্বেষ বশত কুফরে লিপ্ত আছে, তাদের হৃদয়ও ইসলামের স্বচ্ছ জলে ধুয়ে

---

[১] সূরা আহযাব : ৫০। *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/২৯৬; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৯১৬; *আল-ইসাবাহ* : ০৮/১৯২; *উয়ূনুল আসার* : ০২/৩০৯।

[২] ষষ্ঠ হিজরীর হুদাইবিয়া-সন্ধিতে এই কথা ছিল, যে, রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীগণ এ-বছর মক্কা থেকে উমরা-বিহীন ফিরে যাবেন। পরের বছর তাঁরা এসে তিন দিন থাকতে পারবেন। পুরো সন্ধিচুক্তির আলোচনা দেখুন—*তারীখু তাবারী* : ০৩/৭৯ ও *তাবাকাতু ইবনি সাদ* : ০২/৭০।

দিতে পারতেন তিনি।

তাই, কুরাইশের দুজন দূত এসে যখন তাঁকে সন্ধির শর্তানুসারে শহর ছাড়তে বলল, তিনি কোমলভাবে বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা যদি আমাকে বিয়েটা সারার সুযোগ দিতে, আমি তোমাদের এখানেই বাসর সম্পন্ন করে ফেলতাম, এরপর তোমাদের জন্য ভোজ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করতাম, তোমরা সেখানে যোগদান করতে; তাহলে সেটা ভালো হতো না?' কিন্তু কুরাইশী দূতদ্বয়ের মনে হলো—মুহাম্মাদ আর কদিন এখানে থাকলেই মক্কার প্রতিটি প্রবেশপথে তাঁর আনুগত্য প্রদর্শিত হবে। মক্কা হয়ে যাবে তাঁর করতলগত। তাই, তারা জবাব দিল, 'আপনার দাওয়াত খাওয়ার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। আপনি চলে যান।'[১] তাদের এই কথা শুনে সন্ধি অনুসারে রাসূল ﷺ তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। মুসলিমদের মধ্যে ফিরতি সফরের ঘোষণা দেন। এরপর, গোলাম আবু রাফেকে মক্কায় রেখে যান নববধূ বাররাহকে নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছুনোর জন্য।

যে মাটিতে মিশে আছে বারাকাহর সৌরভ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলামের সঙ্গে তানঈম এলাকার কাছে, 'সারফ' নামক জায়গায় তাঁর সান্নিধ্যে এসে পৌঁছান বাররাহ।

হিজরী সপ্তম সনের শাওয়াল মাস তখন। রাসূল ﷺ বাসর করেন বাররাহর সঙ্গে। এরপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হন মদীনার পথে।[২] রাসূল তাঁর নাম পরিবর্তন করে 'মাইমুনা' রাখেন; কারণ, তাঁর সঙ্গে রাসূলের বিয়ে হয়েছে এক চমৎকার সৌভাগ্যপূর্ণ সময়ে; যখন সাতটি বছর পরে রাসূল প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রবেশ করেছেন এমনভাবে, যে, তাঁর সঙ্গীরা আর কারও ভয়ে ভীত নয়; মহান রব ছাড়া আর কাউকে তাঁরা সমীহ করে না।

শান্তি ও সুখানুভূতি নিয়েই নবীগৃহে কদম রাখলেন মাইমুনা ﵂। এই জীবনে আর কী চাই তাঁর? আল্লাহ তো তাঁকে ইসলামের মহাদৌলত দান করেছেন; আবার, এক অপ্রত্যাশিত তোহফারূপে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ রাসূলের একান্ত

[১] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/১৪; *তাবাকাতু ইবনি সাদ* : ০২/৮৮; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১০০; *আল-ইসতীআব ও আল-ইসাবাহ; উয়ূনুল আসার* : ০২/১৪৮।

[২] *সীরাতু ইবনি হিশাম* : ০৪/১৪; *তারীখু তাবারী* : ০৩/১০১; *আল-ইসতীআব* : ০৪/১৯১৮; *ওয়াফাউল ওয়াফা* : ০১/৩১৬।

সান্নিধ্য—মর্যাদাপূর্ণ বিবাহ-বন্ধন।

রাসূলের ঘরে অন্য উম্মুল মুমিনীনদের স্বাভাবিক ঈর্ষার পাত্রী তো হয়েছেন মাইমুনা, কিন্তু সাধারণত তাঁদের সম্মিলিত কোনো মতের বিরুদ্ধেও দেখা যায়নি তাঁকে। ফলে, উম্মু ইবরাহীম মারিয়ার প্রতি ঈর্ষাবশত সব নবীপত্নী যখন একপক্ষ নিয়েছিলেন, তিনিও তখন তাঁদের সঙ্গ দিয়েছেন; পরিণামে, রাসূল ﷺ তাঁদের প্রতি মনক্ষুণ্ণ হয়ে এক মাসের জন্য সবার কাছ থেকে দূরে সরে ছিলেন! তবে, ইসলামের ইতিহাস ও সীরাত লেখকগণ ওই ঘটনাটি ব্যতীত মাইমুনার অন্য কোনো ক্ষোভ, ক্রোধ, বা, মনোমলিন্যের কথা উল্লেখ করতে পারেননি।

আর, সহীহ হাদীসে এসেছে—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ অসুস্থতায় যখন ব্যথা-বেদনা বেড়ে গেল, তখন অন্য স্ত্রীদের মতো মাইমুনাও নিজের পাওনা রাতের পালা ছেড়ে দিয়েছেন এবং রাসূল যাঁর ঘরে থাকতে চেয়েছেন, তাঁর ঘরেই থাকার ব্যাপারে রাজি হয়েছেন। রাসূল তখন আয়িশার ঘরে অবস্থান করতে শুরু করেন।

রাসূলের ইন্তিকালের পরে মাইমুনা ﷺ সবসময়ে সেই বরকতময় দিনটিকে স্মরণ করতেন, যেদিন তিনি শ্রেষ্ঠ মানবের একান্ত সান্নিধ্যের হকদার হয়েছেন। সারফ নামক যে-জায়গাটিতে রাসূল ﷺ তাঁর সঙ্গে বাসর করেছিলেন, সেই জায়গাটির প্রতি তাঁর মনের কোণে কেমন এক মায়া ও আকর্ষণ অনভূত হতো; তাই, ইন্তিকালের পর সে-জায়গাতেই দাফনের ওসীয়ত করে রেখেছিলেন তিনি।[১]

হিজরী ৫১ সনে যখন তাঁর ইন্তিকাল হয়, ভাগ্নে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। এবং লোকদেরকে বলেন, খুব সাবধানে যেন তাঁকে তাঁর প্রিয় জায়গা সারফে নিয়ে দাফন করা হয়।

সুরভিত স্মৃতির এক মনোহারী আতরদানি রেখে মাইমুনা বিদায় নেন প্রিয়তমশূন্য জগত থেকে। ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম বলেন, 'আমি একবার আয়িশা রাদিয়াল্লাহু

[১] তাঁর সমাধিস্থল নিয়ে কারো মতভেদ না-থাকলেও মৃত্যু-তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। ইবনু সাদের বর্ণনামতে, মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকাল হয়েছে ৬১ হিজরীতে। ইবনু আবদিল বার বলেছেন, ৫১ হিজরীতে হয়েছে। ইবনু হাজার বলেছেন, ইবনু আবদিল বারের কথাই ঠিক; তার আগের বর্ণনাটিকে তিনি হযরত আয়িশার হাদীসের দলীল দিয়ে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। হযরত আয়িশা তো মাইমুনার পরে ইন্তিকাল করেছেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। ইবনু সায়্যিদিন নাস শুধু একটি বর্ণনাই উল্লেখ করেছেন যে, ৫১ হিজরী এবং তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ (*উয়ূনুল আসার* : ০২/৩০৯)।

আনহার সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। আমার সঙ্গে তাঁর এক ভাগ্নেও ছিল, যার বাবা ছিলেন তালহা ﷺ। তো, হযরত আয়িশা আমাকে বেশ কিছু নসীহত করলেন। এরপর বললেন, "আরে, তুমি কি জানো না, যে, আল্লাহই তোমাকে তাঁর নবীর একটি ঘরে নিয়ে এসেছেন?...মাইমুনা তো চলে গেলেন; আল্লাহর শপথ, আমাদের মধ্যে তিনি তাকওয়া ও আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর রাখায় সবচেয়ে বেশি এগিয়ে ছিলেন।"'[১]

উম্মুল মুমিনীন মাইমুনা ﷺ আক্ষরিক অর্থেই নিজেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, তাঁর সান্নিধ্যলাভের জন্য উৎকুল হয়ে পড়েছিলেন এবং যখন অপ্রত্যাশিতভাবে সেই মহাসৌভাগ্য লাভ করেছেন, তখন এর প্রতি তাঁর খুশি, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার কোনো শেষ ছিল না।

হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণনারও অনেক মণিমুক্তা ছড়িয়ে আছে। যে কুড়াতে চায়, তার জন্য তো সেসবের প্রতিটি শব্দ-বাক্য হবে অমূল্য রতন।

উম্মুল মুমিনীন মাইমুনার প্রতি সালাম। সালাম সব নবীপত্নীর প্রতি। মুমিন-হৃদয়সমূহে তাঁদের প্রতি ভালোবাসার যেই আর্দ্রতা জমা হয়, পরম করুণাময় সেগুলো তাঁদের কবরে পৌঁছে দিন শত-কোটি শিশিরকণারূপে...

[১] ইয়াযীদের সূত্রে তাবাকাতু ইবনি সাদ ও ইবনু হাজার।

বাঙালি পাঠকমহলের সীরাত চর্চায়, বিশেষত আযওয়াজে মুতাহহারাত তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রতমা স্ত্রীদের জীবনী পাঠে এ গ্রন্থ নতুন ও অভিনব একটি সংযোজন। ইতিহাস পাঠের গতানুগতিক অভিজ্ঞতার বাইরে পাঠক এখানে পাবেন সুপাঠ্য গল্পের স্বাদ। মানবিক বৈশিষ্ট্য ও দুর্বলতা সমেত প্রেম-প্রণয় ও সংসারযাপনে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও কীভাবে ইনসাফপূর্ণ সহাবস্থান রক্ষা করা যায়—গল্পে গল্পে অভাবনীয় এ সবকও হাসিল করা যাবে বইটি থেকে।

মিশরের খ্যাতিমান সাহিত্যিক ড. আয়িশা আবদুর রাহমান একই সঙ্গে হাদীস তাফসীর ও সীরাত বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য রাখতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রতমা প্রেয়সীদের জীবন ও জীবনিকাকে তিনি ইতিহাসের আকরগ্রন্থসমূহ থেকে তুলে এনেছেন অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে, স্বতন্ত্র ও সুপাঠ্য বর্ণনায়। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি খুবই চমৎকার এবং হৃদয়গ্রাহী। অনুবাদক ইসমাঈল যাবিহুল্লাহ অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে মূল লেখিকার ভাব ভাষা ও বর্ণনাশৈলির যথার্থ অনুবাদ করার ফলে বক্ষ্যমাণ অনূদিত রূপটিও হয়ে উঠেছে মূল বইটির মতো সুপাঠ্য সাবলীল। আমাদের সকলের ঘর-সংসার আযওয়াজে মুতাহহারাতের পবিত্রতা ও বারাকায় মণ্ডিত হোক, এই দুআ আল্লাহ তাআলার দরবারে।